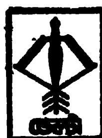
প্রেমচন্দ্র
জীবন ও সাহিত্য

সুশীল কুমার ধর



ডেল্টা ফার্মা

কলকাতা

ডেল্টা ফার্মার পক্ষে এস, সাহা কর্ত্তৃক ৬নং, বঙ্কিম
চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত
শ্রীমান গোবিন্দ চরণ ঘোষ কর্তৃক ডায়মণ্ড
প্রিন্টিং হাউস ১৯এ/এইচ/২ গোয়াবাগান
ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

বড়দা

শ্রীসুকুমার চন্দ্র ধরের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

মুন্সী প্রেমচন্দ হিন্দী সাহিত্যের একটি কালজয়ী নাম। হিন্দী সাহিত্যাকাশে তিনি মধ্যাহ্নগগনে প্রদীপ্ত সূর্যের মতো ভাস্বর। হিন্দী সাহিত্যের আঙ্গিনায় তাঁর প্রবেশ সরবে, সতেজে, নবজীবনের বার্তাবহ হয়ে। তাঁর চেতনায় ছিলো সাম্যবাদের ছোঁয়া, চোখে ছিল মানুষের শোষণ মুক্তির স্বপ্ন, কণ্ঠে ছিল নতুন প্রভাতের জয়গান আর হাতে ছিল অগ্নিবীণা—একটি জোরালো ক্ষুরধার লেখনী। মানুষে বিশ্বাসী প্রেমচন্দ উদ্দীপিত হয়েছেন টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও গান্ধিজীর দ্বারা। তাই তিনি হিন্দী সাহিত্যকে কল্পলোকের মায়াকুমারীদের জগৎ থেকে মুক্ত করে সেখানে নিয়ে এলেন কালান্তরের হাওয়া। ফুলের সৌরভ মাখা স্বপ্নচারিতার জগৎ থেকে হিন্দী সাহিত্যকে তিনি নামিয়ে আনলেন মাটির পৃথিবীতে। যারা চিরকাল অনাদৃত, অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত, যারা অন্ত্যজ, যারা ব্রাত্য অথচ যাদের ওপর "ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার", সাহিত্যে তিনি তাদের কথাই লিখলেন।

হিন্দী সাহিত্যাকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পূত ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য কর্মের পরিচয় বাংলা ভাষার পাঠকদের জানানোর একটি বাসনা দীর্ঘদিন মনে সুপ্ত ছিল। ইতিমধ্যে প্রেমচন্দের বহু গল্প—উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হয়েছে, চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে। স্বভাবতই বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের মনে ব্যক্তি প্রেমচন্দ ও তাঁর সাহিত্যকে জানার আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ সেই জানবার আগ্রহকে প্রশমিত করার একটি প্রয়াস মাত্র। এই গ্রন্থে আমি ব্যক্তি প্রেমচন্দের একটি ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে তাঁর সমগ্র সাহিত্যের একটি অতি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ করারও চেষ্টা করেছি। আশা করি বাংলা ভাষার অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের আকাঙ্ক্ষা এতে

কিছুটা প্রশমিত হবে ও তাঁর সাহিত্যকে জানার আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে।

এই গ্রন্থ রচনায় সর্বদা উৎসাহিত করেছেন অধ্যাপক বন্ধু শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী ও ডঃ শ্রীমতী ইরা ধর। তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আর ধন্যবাদ জানাই "যুব প্রকাশনী"র শ্রীরাখাল চৌধুরীকে যাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যতীত এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব ছিল না।

১৯৫৯।

ইতি—
শ্রীসুশীল কুমার ধর

সূচীপত্র

প্রেমচন্দ—জীবন ও সাহিত্য

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বেনারস, যার প্রাচীন নামের পুনরুদ্ধার করে তাকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্তে নতুন করে নাম দেওয়া হয়েছে বারাণসী; তারই মাইল পাঁচেক দূরে অবস্থিত ছোট একটি গ্রাম "লহমী"। সেই গ্রামে বসবাসকারী ডাকঘরের এক অতি সাধারণ করণিক ছিলেন শ্রী অজায়বলাল শ্রীবাস্তব। পৈতৃক সম্পত্তি বলতে ছিল দু-চার বিঘে জমি আর ভিটে বাড়ীটা। জমির আয় বলতে বিশেষ কিছু ছিল না তাই অভাব পূরণের জন্য করতেন চাকরী। তাতে যা গোটা কুড়ি টাকা পেতেন তাতেই টেনেটুনে চলে যেত সংসারটা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মত অভাব অনটন লেগেই থাকতো। স্ত্রী আনন্দদেবী ছিলেন চির রুগ্ন; ডাক্তার বদ্যি আর ওষুধের একটা বাড়তি খরচের ধাক্কাও সামাল দিতে হতো।

এমন এক অভাবগ্রস্ত পরিবারে ৩০শে জুলাই ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করে একটি পুত্র সন্তান। নির্ধন মা-বাবা আদর করে নাম দিলেন ধনপত রায়। আশা, যদি নামের মহিমায় অভাব অনটন কিছুটা লাঘব হয়। সেই আশা কতটা পূরণ হয়েছিল জানিনা তবে ধনপত সোনা রূপোর ধনে ধনী না হলেও যশ ও খ্যাতির ধনে ধনী হয়ে মা-বাবার অপূর্ণ আকাঙ্খা নিশ্চয় পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও তা তাঁদের জীবিত কালে সম্ভব হয় নি। কারণ তিনি অতি শৈশবেই মাতৃহারা হন, তারপর কয়েক বছর যেতে না যেতেই হলেন পিতৃহারা।

মাতৃ বিয়োগ—এই ধনপত রায় শ্রীবাস্তবই হিন্দী সাহিত্যে পরবর্তীকালে উপন্যাস সম্রাট নামে খ্যাত হন। অতি শৈশবেই তিনি মা আনন্দদেবীর পাশে শুয়ে গল্প শুনতেন আর গল্পের নায়ক রূপে নিজেকে কল্পনা করে কল্পলোকের আকাশে ভেসে বেড়াতেন। সেই রাক্ষস রাজার দেশে বন্দী সুন্দরী রাজকুমারীকে উদ্ধার করবার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু বেশীদিন মাতৃস্নেহ সায়রে তিনি অবগাহন করতে সক্ষম হ'ন নি। বয়স যখন মাত্র আট বছর তাঁর

স্নেহময়ী মা ছ'মাস রোগ ভোগের পর ছেলেকে অকুলে ভাসিয়ে এ সংসার ছেড়ে চলে যান। মাতৃ-বিয়োগের এ ধাক্কা তাঁর মর্মে কতটা আঘাত করেছিল তা আমরা তাঁর বহু গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে পাই। 'প্রেরণা' গল্পে মাত্র সাত বসন্তের শিশু মাতৃহারা হয়। শিশু মনের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি বলছেন— "শিশুমনে স্নেহের যে ক্ষুধা থাকে—যা দুধ, মিঠাই মণ্ডা এবং খেলনা অপেক্ষাও অধিক নেশা ধরায় তা মাতৃক্রোড়ের সামনে বিশ্বসংসারের কোন তোয়াক্কা করে না। মোহনের সে ক্ষুধা কখনও কোনো অবস্থাতেই তৃপ্ত হতো না।" কাহিনীর এই মাতৃহারা শিশু মোহনের মাধ্যমে তিনি নিজের মনেরই ছবি এঁকেছেন এতে সন্দেহ নেই। মাতৃহারা শিশুর জীবন সম্পর্কে তিনি ঘরজামাই গল্পে বলেছেন "যদি সে (মা) না থাকে তবে বালকের জীবন স্রোত শুকিয়ে যায়, সে তখন শিবের নন্দি যার উপর ফুল বা জল ঢালা আবশ্যক নয়।"

মাতৃহারা শিশু সন্তানের মর্মবেদনা দূর হওয়ার পূর্বেই পিতা অজায়ব রায় ঘর সামলাবার জন্যে দ্বিতীয় বিবাহ করলেন। ধনপতের তখন মাত্র পনেরো বছর বয়স। বিমাতা গৃহে প্রবেশ করতেই আরম্ভ হল সংসারে অশান্তি। কোপ দৃষ্টি পড়ল বালক ধনপতের ওপর। বিমাতার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বালক একান্তে অশ্রু বিসর্জন করতো আর নিজের স্নেহময়ী মা'র স্মৃতিচারণ করে দিন যাপন করতো। যত দিন যায় অত্যাচার যেন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ছেলের মন টেঁকেনা ঘরে। যতটা সম্ভব সময় কাটাতে লাগলো সে ঘরের বাইরে। এই সময়কার মনের ব্যথা তিনি পরবর্তী কালে তার "সওতেলী মা" বিমাতা গল্পে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন। পিতা দ্বিতীয় বিবাহের পর পুত্র মুন্নুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে বন্ধু জ্বালা সিং এর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। জ্বালা সিং শিশু মুন্নুকে জিজ্ঞেস করে—তোমার নতুন মা তোমাকে খুব ভালবাসেন, তাই না? মুন্নু অশ্রুসজল দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন কর্তার পানে তাকিয়ে থাকে। "সেই দৃষ্টিতে ছিল সজল ঘন মেঘ থেকে বর্ষণের পূর্বাভাস"। জ্বালা সিং অপ্রস্তুত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করে তুমি কাঁদছ কেন মুন্নু; তখন শিশু মুন্নু বলে—"কই কাঁদিনি তো! চোখে ধোঁয়া লেগে গেল যে"। মাতৃ বিয়োগ যে কি মর্মান্তিক আঘাত হানে শিশুর মনে তা তিনি আরো কয়েকটি গল্পে দেখিয়েছেন।

ধনপতের আরো তিনটি ভগিনী ছিল কিন্তু দুটি শিশুকালেই অপুষ্টি জনিত রুগ্ন স্বাস্থ্য এবং অচিকিৎসায় মারা যায় এবং একজন বহুদিন জীবিত থাকেন।

হাতে খড়ি—এভাবেই দিন কাটছিল ধনপত রায় নামের সেই ছোট ছেলেটার। মনে কত না আশা আকাঙ্খা জাগতো, কিন্তু সবই বুদবুদের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যেত বিমাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে। সংসারে নিদারুণ অর্থাভাব। তাই বাইরে কিছু খাবার কথা সে ভাবতেই পারত না। যদি কখনও পিতা আদর করে দু-এক পয়সা হাতে দিতেন পুত্র তা সযত্নে জমা করে রাখত। দারিদ্রের কষাঘাতে, বিমাতার অমানুষিক ব্যবহারে এবং পিতার ঔদাসীন্যে ব্যতিব্যস্ত বালক ধনপতের জীবন ক্রমেই দুবিষহ হয়ে উঠতে লাগল। এমনি সময় ধনপতের ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী বালকের হাতে খড়ি হলো তখ্‌তীর (কালো রং করা কাঠের টুকরো) ওপর লিখে; তবে অ, আ, ক, খ, নয় আলিফ, বে, পে দিয়ে, মানে উর্দু অক্ষর দিয়ে। পিতা পুত্রকে ভর্তি করে দিলেন এক মাদ্রাসায়। রাত্রের বাসী রুটী খেয়ে আর কিছু ছোলামটর বেঁধে নিয়ে গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তো সেই সাত আট বছরের বালক। প্রেমচন্দের পত্নী শিবরাণী দেবী নিজে "প্রেমচন্দ ঘর মেঁ" নামক বইতে এই সময়কার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে ধনপত মাঝে মাঝেই মাদ্রাসা না গিয়ে যত্র তত্র ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। এর একটা কারণ ছিল ভাল শিক্ষকের অভাব। যে সব মোল্লা মৌলবীরা এই সব মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন তাঁদের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না তাই শিক্ষা দানের প্রতি তাঁদের মধ্যে কোন রুচি বা আগ্রহ দেখা যেত না। তারপর পড়া না পারলে ছাত্রদেরকে নিষ্ঠুর ভাবে বেত্রাঘাত করার প্রথা ছিল, যার জন্যে তাদের মনে পড়াশুনার প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিরাগই জন্মাত। না ছিল তাদের কোন শিক্ষাদানের রীতি-নীতি, না পরীক্ষা নেওয়ার সুব্যবস্থা। ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধির সঞ্চার ও তার বিকাশ করার কোন চেষ্টাই এই মৌলবীরা করতেন না। তাই ধনপত প্রায়ই ক্ষেতে খামারে ঘুরে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করার জন্যেই বিশেষ আগ্রহী ছিল। তার সঙ্গে থাকতো তারই এক খুড়তুতো দাদা। এমনি ভবঘুরের জীবনে যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ধনপত রায় তখনই পিতা অজায়ব রায়ের পদোন্নতি হয় এবং তাঁকে গোরখপুরে বদলী করা হয়। ধনপতকেও পিতার সঙ্গে নতুন শহরে যেতে হয়। এখানে পিতা একটি অতি নোংরা পরিবেশযুক্ত বাড়ি ভাড়া নেন, যার মাসিক ভাড়া ছিল দেড় টাকা মাত্র। বাড়িটি এতই কদর্য ও অস্বাস্থ্যকর ছিল যে ধনপত নিজেই পাশের এক তামাকওলার বাড়িতে চলে

যেত। শিবরাণী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে সেখানে ওকে একটি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ধনপত যেন নতুন প্রেরণা পায় এবং মন দিয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করে। গল্প উপন্যাস পড়ার এমন এক নেশা তাকে পেয়ে বসে যে এই শহরেরই এক বইয়ের দোকানে বসে বালক ধনপত একে একে উর্দু'র নামী ও দামী সব লেখকের বই পড়ে শেষ করে ফেলে। এখানেই এক তামাকের দোকান ওয়ালার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সে "তিলস্মে হোশরুবা" নামক বৃহত্তম পুস্তকের সব কটি ভাগ শেষ করে ফেলে। সে সময় উর্দু'তে রেনল্ডের বইয়ের অনুবাদ পরপর প্রকাশিত হচ্ছিল, সে সব বইও সে পড়ে শেষ করে। এভাবে উপন্যাস সাহিত্য শেষ করে ধনপত ঝোঁকে পুরাণের দিকে যা উর্দু'তে অনুবাদ হয়েছিল। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে উর্দু'র এই সব উপন্যাসগুলির অধিকাংশই ছিল রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের। কিছু গল্প কাহিনী ছিল আজগুবি কল্পনার ওপর ভিত্তি করে লেখা যার সঙ্গে সমাজের বা বাস্তব জগতের ছিল না কোন সম্পর্ক। চমকপ্রদ ঘটনা ও কল্পলোকের রাজকুমার বা শাহজাদা ও রাজকুমারী বা শাহজাদীকে নিয়ে লেখা এই বইয়ে কাঁচা বয়সের ছেলে মেয়েদের মনে শিহরণ জাগাবার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। ধনপত হয়তো তাই সে সব রসে মগ্ন হয়ে ভুলে যেত ক্ষুধা তৃষ্ণা।

বিবাহ—কিন্তু ধনপতের দুর্ভাগ্য যে তার পনেরো বছর বয়সে বাবা তার বিবাহ দেন এমন একটি মেয়ের সঙ্গে যে তার মনের সুখ-শান্তি সব নষ্ট করে দেয়। বিপদ আরো ঘনিয়ে আসে যখন এর ঠিক এক বছর পরই তার বাবা সংসারটাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে পাড়ি দেন পরলোকে। স্বাভাবিক ভাবেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সেই যুবকের স্কন্ধে চাপে। প্রেমচন্দ নিজেই আত্ম-জীবনীমূলক প্রবন্ধে স্ত্রী সম্পর্কে লিখছেন—"বয়সে ও আমার চেয়ে বড় ছিল। যখন আমি ওর মুখ দেখলাম আমার সমস্ত রক্ত যেন জমে হিম হয়ে গেল। ···ও কুৎসিততো ছিলই স্বভাবেও মিষ্টি ছিল না।···আমার এই বিবাহ ঠিক করেছিলেন বিমাতার পিতৃদেব। বাবা মাকে বললেন—লালাজী আমার পুত্রকে জলে ফেলে দিলেন। দুঃখের কথা, আমার এই গোপালের মত সুন্দর ছেলে আর তার এই বৌ!···বিমাতা ও আমার স্ত্রীর মধ্যে মিল ছিল না। প্রতিদিন ঝগড়া হতো। বিমাতা আমার স্ত্রীর ওপর শাসন করতো। বিমাতা আমার কাছে একান্তে নালিশ করতো। মাঝে পড়ে আমার হতো বিপদ। বিমাতা না থাকলে হয়তো বা আমাদের দু'জনের জীবন কোন প্রকারে কেটে যেত।"

যুবক ধনপত চতুর্দিক থেকে এভাবে শৃঙ্খলিত থাকলেও কখনও ভেঙ্গে পড়ে নি। বিপদ যতই ঘনীভূত হয়েছে তার সংগ্রামের মনোবৃত্তি যেন ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেমচন্দ লিখছেন—"পায়ে লোহার নয় অষ্টধাতুর শৃঙ্খল ছিল আর আমি তাই নিয়ে পর্বত চূড়ায় আরোহণ করতে চাইতাম।" তাঁর অপরাজেয় মনোবৃত্তির স্বরূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর 'রঙ্গভূমি' উপন্যাসে। সুরদাস শত বিপদেও কখনও রণে ভঙ্গ দেয় নি। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় সে আগামী জন্মে আবার শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ধনপতের তখনকার নিদারুণ অর্থাভাব যে কোন মানুষকে নিরাশার অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিতে পারত কিন্তু যুবক ধনপত ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। নিরাশার অন্ধকার যখনই তাকে চারপাশে ঘিরে ধরেছে তখনই সে, "আমার কিছু হতেই হবে"র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেই ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে এবং নতুন উদ্যমে নিজ উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

'জীবন সার' নামক আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধে প্রেমচন্দ লিখেছেন যে পিতৃদেব শেষ জীবনে একটি বড় ধাক্কা খেয়েছেন। "এমনিতে তিনি অত্যন্ত বিবেচনাশীল ও জীবন পথে চোখ খুলে এগোবার লোক ছিলেন কিন্তু শেষ কালে একটি ঠোকর খেয়ে গেলেন"। এই ঠোকরটির দুটি অর্থ সম্ভব। প্রথমটা তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ এবং দ্বিতীয়টা পুত্রের এমন একটি অসম বিবাহ যার জন্যে তাঁকে পরে আপশোষ করতে হয়েছে। যাই হোক বিয়ের এক বছর পরই পিতা স্বর্গে যান। তখন ধনপত নবম শ্রেণীর ছাত্র।

পিতৃবিয়োগের পর—পিতার মৃত্যুর পর বিমাতা, তাঁর দুটি সন্তান, নিজে এবং স্ত্রী এতগুলি পেটের ক্ষুধার অন্ন জোগাবার ভার স্কন্ধে চাপার দরুণ ধনপত যেন মুহূর্তের জন্যে চোখে অন্ধকার দেখল। তখন তার কাছে একটি কানাকড়িও ছিল না। পিতার সঞ্চিত সব অর্থ তাঁরই চিকিৎসায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি লিখেছেন—"ঘরে যা সঞ্চয় ছিল তা পিতার ছ'মাসের অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসায় এবং শেষকৃত্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল উকিল হওয়ার আর এম. এ. পাশ করার।"

কপর্দক শূন্য অবস্থায় ছিন্ন বস্ত্রে নগ্ন পদে গ্রাম থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে বেনারসে গিয়ে স্কুল করে আবার রাত্রে ফিরে আসত ধনপত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে। এক-মুঠো ছোলা পুঁটলি করে বেঁধে নিয়ে যেত ক্ষুধার তাড়না থেকে মুক্তির জন্যে। তাই খেয়ে পেট ভরে জলপান করে রাত অবধি কাটত।

প্রতিদিন দশ-বার মাইলের এই হাঁটা সেই যুবকের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—"পায়ে ছিল না জুতো, গায়ে ছিল ছেঁড়া জামা। দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া, জব টাকায় বিশ সের। স্কুল থেকে সাড়ে তিনটেয় ছুটি পেতাম। কাশীর কিংস কলেজে পড়তাম। হেডমাষ্টার মাইনে মকুব করে দিয়েছিলেন। পরীক্ষা মাথার ওপর ঝুলছিল আর আমি 'বাঁশফাটকে' একটি ছাত্রকে পড়াতে যেতাম। শীতের দিন। চারটের সময় পৌঁছতাম। পড়িয়ে ছটায় মুক্তি পেতাম। সেখান থেকে আমার বাড়ি ছিল পাঁচ মাইল দূরে। দ্রুত হাঁটলেও আটটার পূর্বে ঘরে পৌঁছতে পারতাম না। পরের দিন ভোরে আটটায় আবার বাড়ি থেকে রওনা হতে হতো, কখনো ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছতে পারতাম না। রাত্রে খেয়ে দেয়ে কুপি জ্বালিয়ে পড়তে বসতাম আর না জানি কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়তাম। তবু সাহস সঞ্চয় করেছিলাম।" অবশেষে ভগবানেরও বোধ হয় বালকের কষ্ট ও অধ্যবসায় দেখে দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি এক উকিলের বাড়িতে একটি ছেলেকে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিলেন। মাইনে মাত্র পাঁচ টাকা। উকিল বাবু ছিলেন সহৃদয় ব্যক্তি, তাই তাঁর আস্তাবলের ওপর একটি কাঁচা খুপরিতে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সময়কার ধনপতের জীবন কাহিনী তাঁরই লেখায় শোনা যাক: "সৌভাগ্যবশত একজন উকিলের ছেলেদের পড়াবার কাজ পেয়ে গেলাম। বেতন মাসে পাঁচ টাকা। দু'টাকায় নিজের খরচ চালিয়ে তিন টাকা বাড়িতে পাঠাতে মনস্থ করলাম। উকিল সাহেবের আস্তাবলের ওপরে একটি মাটির ঘর ছিল। তার মধ্যে থাকবার অনুমতি নিয়ে নিলাম। একটি চটের টুকরো পেতে নিলাম। বাজার থেকে একটা ছোট বাতি কিনে আনলাম এবং শহরে বাস করতে লাগলাম। বাড়ি থেকে কয়েকটি বাসনপত্রও নিয়ে এলাম। একবার খিচুড়ি বানিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে লাইব্রেরী চলে যেতাম। গণিত তো ছিল একটি অজুহাত, পড়তাম উপন্যাস ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবুর উর্দু উপন্যাস যা পুস্তকালয়ে ছিল সব পড়ে ফেললাম। যে উকিল সাহেবের ছেলেকে পড়াতাম তার শ্যালক আমার সঙ্গে ম্যাট্রিক পড়তো। তারই সুপারিশে আমি এই কাজটি পেয়েছিলাম। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তাই যখন দরকার পড়তো তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে নিতাম। মাইনে পেলে হিসেব হয়ে যেত। কখনও দু'টাকা বাঁচতো কখনও তিন। যেদিন মাইনের দু'তিন টাকা হাতে পেতাম সেদিন আমার সমস্ত

সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যেত। বুভুক্ষা মিষ্টির দোকানের দিকে টেনে নিয়ে যেত। দু'তিন আনার খেয়ে তবেই উঠতাম। সেদিনই বাড়ি যেতাম আর দু-আড়াই টাকা দিয়ে আসতাম। দ্বিতীয় দিন থেকে আবার ধার নিয়ে আরম্ভ করতাম; কিন্তু কখনো কখনো ধার চাইতেও সঙ্কোচ বোধ করতাম আর দিন ভোর উপবাসে কেটে যেত।

"এভাবেই চার পাঁচ মাস কাটলো। এরই মধ্যে এক কাপড়ের দোকান থেকে দু-আড়াই টাকার কাপড় কিনেছিলাম। প্রতিদিন ওদিক দিয়েই যেতাম। আমার উপর তার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। মাস দুমাস হয়ে গেলেও আমি তার টাকা দিতে না পারায় সেদিক দিয়ে যাতায়াতই বন্ধ করে দিলাম। ঘুরতি পথে চলে যেতাম। তিন বছর পর তার টাকা শোধ করতে সক্ষম হলাম। সেই সময়ে শহরের এক কোদাল চালক (মজুর) আমার নিকট হিন্দী পড়তে আসতো। উকিল সাহেবের পিছন দিকেই তার বাড়ি।··· আমরা তাকে "জান লো ভাইয়া" বলে ডাকতাম। একবার আমি তার কাছ থেকেও আট আনা ধার করেছিলাম। সেই পয়সা সে পাঁচ বছর পর আমার বাড়ি গিয়ে আদায় করেছিল। পড়ার ইচ্ছে আমার তখনও ছিল, তবে দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। ইচ্ছে হতো কোথাও চাকুরী জুটিয়ে নি। কিন্তু চাকরি কেমন করে পাওয়া যায় আর কোথায় পাওয়া যায় তাই জানতাম না।"

কন্‌কনে শীতের দিন। ধনপত তখন কপর্দকশূন্য। এক পয়সা করে ছোলা কিনে তাই খেয়ে আর আকণ্ঠ জলপান করে দু'তিনটে দিন কোন রকমে কাটলো। ধার দেওয়ার লোকেরা সবাই তাকে আর ধার দিতে অস্বীকার করলো। আগের ধার শোধ না করতে পারলে আর কেই বা নতুন করে ধার দেয়। তাই ধনপতের যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। হঠাৎ রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে তার মনে একটা কথার উদয় হলো। বাড়ি ফিরে সে বছর দুই পূর্বে কেনা একটা নতুন বই খুঁজে বের করলো। বইটি হলো যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর অঙ্কের বই। অতি যত্নে কিনে রেখেছিল অঙ্ক শেখার বাসনায়। একবার বইটি হাতে নিয়ে মনে হলো, বইটি বিক্রী করে দেব! সযত্নে বইটা জায়গায় রেখে দিয়ে আবার চিন্তা ভাবনায় ডুব দিল। কিন্তু না আশার আলো কোথাও এক বিন্দুও দেখা যায় না। এবার মনে দৃঢ়তা এনে ভাবনা চিন্তাকে দূরে ফেলে দিয়ে বইটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বারংবার বিবেক বাধা দিচ্ছিল, বলছিল ধনপত তুমি না এম, এ, পড়ার স্বপ্ন দেখ, তুমি শেষ কালে বই বিক্রী করতে যাচ্ছ ? কিন্তু না সঙ্কল্প অটল রইলো। দোকানে বইটি দিল। দোকানী বিক্রেতার অবস্থা বুঝতে পারলো। একটা টাকা বার করে এগিয়ে দিল। বললো—এর বেশী দিতে পারবো না। বেচারা ধনপত সেই একটা টাকা হাতে নিয়ে দোকান থেকে নেমে আসে, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ এক শ্মশ্রুধারী সৌম্য ভদ্রলোক তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি চাকরী করতে চাও" ? বেচারা ধনপত সম্প্রতি ম্যাট্রিক পাশ করেছে, এমন আজগুবি কথা শুনে চমকে ওঠে। ভদ্রলোক পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করেন "ম্যাট্রিক পাশ করেছো তো ; চাকরী করবে ?"

আচমকা এক অপরিচিতের মুখে এমন কথা শুনে ধনপত নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বললো—"কোথায় পাবো চাকরী ? কে দেবে আমায় চাকরী ? তবে হ্যাঁ ম্যাট্রিকটা পাশ করেছি।"

এই ভদ্রলোক ছিলেন একটি ছোট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি কিছুদিন ধরে একজন নির্ভরযোগ্য সহকারী শিক্ষকের খোঁজে ছিলেন। মুখোমুখি কথাবার্তা হয়ে গেল। মাইনে আঠারো টাকা। কিন্তু বিপদাপন্ন ধনপতের জন্যে এ যেন অভাবনীয় সুযোগ। পরের দিন সাক্ষাতের সময় জেনে নিয়ে ধনপত বাড়িমুখো হলো। আনন্দে সে আজ আত্মহারা। মাটিতে যেন পা পড়ছিল না। হাওয়ায় ভেসে মুহূর্তে যেন বাড়ি পৌঁছে গেল। মনে হলো যেন জীবন শুধু অন্ধকারময় নয়, দুঃখ কষ্টই এর সার নয় ; এতেও আছে আলো, আছে সুখ ও আনন্দ।

শিক্ষকরূপে—তারপর দিন থেকেই প্রেমচন্দের শিক্ষকতার জীবন আরম্ভ হলো। সেটা ছিল ১৮৯৯ সাল। উনবিংশ শতাব্দির শেষ বছর। এবার ধনপত অনুভব করলো তাকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতেই হবে। যে ভাবেই হোক এম. এ.-টা তাকে পাশ করতেই হবে। এই অভাবিত ভগবানের আশীর্বাদকে সে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলো। বাড়িতে থাকতে বাসন মাজা, বিমাতার দুই সন্তানদের সেবা শুশ্রূষা করা, তাদের খাওয়ানো দাওয়ানো, কাপড় কাচা ইত্যাদি সব কাজ করতে হতো। অপরদিকে চটুল ও কুটিল স্বভাবের স্ত্রীর সঙ্গেও তার বনিবনা হচ্ছিল না। ক্রমেই অবস্থা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিল। আরো কয়েক বছর পর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কটুভাষিণী স্ত্রী ঝগড়া বিবাদ করে বাপের বাড়ি চলে যায়। আর সেই যাওয়াই তার

শেষ যাওয়া ; কারণ সে আর শ্বশুরবাড়ি মুখোই হয় নি। ধনপতও সে চেষ্টা করলো না। এ সময়টা ধনপত বিধবা বিমাতার অসহায় অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে মনে মনে বিধবা সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছিল। অপরদিকে স্ত্রীর দিক থেকেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না তাই ধনপত কিছুটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করছিল। বিধবা সমস্যা সমাধানের একটা পথ তার মনে উদয় হলো। ধনপতের বিচারে এবং আচারে কোন প্রভেদ ছিল না তাই আর কিছু না হোক ধনপত ভাবলো আমি অন্তত একজন দুঃখী বালবিধবাকে বধূরূপে গ্রহণ করে সমাজের সামনে উদাহরণ প্রস্তুত করতে পারি। যেমন ভাবা তেমন কাজ। মনে রাখতে হবে এটি তার তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম সক্রিয় অভিব্যক্তি মাত্র। যদিও এর আরো কয়েক বৎসর পূর্বে ধনপত যখন কেবলমাত্র বারো তেরো বছরের, তখন আরেকটি ঘটনা তার জীবনে ঘটে যেটাকে সে খুব ভালভাবে উপভোগ করে। পরবর্তীকালে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই বালক ধনপত একটি ছোট নাটিকা রচনা করে। তখন তার বয়স তেরো পেরিয়েছে মাত্র। এটাই প্রেমচন্দের জীবনের সর্ব-প্রথম রচনা। দুঃখের বিষয় এই নাটকটি ঐ ঘটনার নায়ক মামুর হাতে পড়ে এবং তিনি তা যে ভাবেই হোক ধ্বংস করেন। যতটুকু আত্মজীবনী এবং শিবরানীদেবীর লেখা থেকে জানা যায় তাতে মনে হয় এই নাটিকাটিতেই প্রেমচন্দের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া গিয়েছিল। এটা ব্যঙ্গাত্মক শৈলীতে লেখা হয়েছিল। সেই রোমাঞ্চ রহস্য কথা সাহিত্যের যুগেই নিজেকে বাস্তববাদী লেখকরূপে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন প্রেমচন্দ।

বাল্যকালের এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"আমার এক দূর সম্পর্কের মামা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। বয়স পেরিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিয়ে করেন নি।...তিনি একটি চামার কন্যার নয়ন-বাণে বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।...ক্রমে তাঁদের এ সম্পর্কটা এত ঘনিষ্ট হয়ে উঠলো যে একদিন সেই মেয়েই তাঁর গৃহিণী হয়ে উঠলো।...একদিন সন্ধ্যেবেলা চামারদের একটি বৈঠক বসলো। হতে পারেন পয়সাওয়ালা, তাতে কি এসে যায়। মান হরণের বদলা রক্ত দিয়েই শুধতে হবে। তবে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়েও কিছুটা শোধ নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় দিন বিকেল বেলা যখন চম্পা (মেয়েটির নাম) মামার ঘরে এলো তখন তিনি ভিতর দিয়ে কপাট বন্ধ করে দিলেন।...এদিকে চামাররা সুযোগের সন্ধানে ছিলই।...ছুতোর

মিস্ত্রী ডাকা হ'ল, কপাট ভাঙা হল এবং মামাকে পাওয়া গেল ভূষীর কুঠিতে। মামার ভাল করে ধোলাই হল।...আমি এই ঘটনাটি বেশ পরিতৃপ্তি সহকারে উপভোগ করলাম।"

এত কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পর মামার সেখানে একা বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়লো তাই তিনি ভগ্নীপতি অর্থাৎ অজায়ব রায়ের বাড়িতে এসে আড্ডা জমালেন। বালক ধনপত তাঁকে সহ্য করতে পারতো না। মামা ভাগ্নেকে ধমকাতেন, গালিগালাজ করতেন, তার ওপর অভিভাবকত্ব ফলাতেন। উক্ত ঘটনার পরেও যখন তিনি তাঁর এই প্রবৃত্তিটা ত্যাগ করতে পারলেন না তখন ধনপত রায় মনে মনে একটি ফন্দি এঁটে ফেললো। চুপিচুপি একান্তে মামুর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ও একটি নাটিকা লিখে ফেললো। সেই প্রহসনটি বালক ধনপত রায় স্কুল যাওয়ার সময় ঘুমন্ত মামুর শিয়রে রেখে চলে যায়। প্রতিক্রিয়া জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্কুল থেকে ফিরেই সে মামুর ঘরে প্রবেশ করে এবং দেখে যে পাখী খাঁচা ছাড়া হয়ে উড়ে গেছে। মামুও নেই আর তার লেখা সেই ক্ষুদ্র নাটকটিও নেই। হয়তো বা প্রেমচন্দের প্রথম লেখার সেই পাতাগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে অথবা কুচিকুচি করে ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং গ্রামের মাটির সঙ্গেই তা মিশে গেছে। মামুকে নিয়ে লেখার এই ঘটনাটি সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সালের।

ধনপতের কাকা তার নামকরণ করেছিলেন—নবাব রায়। হয়তো বা ধনপতেরও এ নামটাই বেশী প্রিয় ছিল। তাই প্রথম দিকে উর্দুতে যখন তিনি লিখতে আরম্ভ করেন তখন লেখকের নামের জায়গায় থাকতো—"নবাব রায়"। ১৯০১ সালেই তিনি উর্দুতে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, অর্থাৎ শিক্ষকতা আরম্ভ করার দু' বছর পর। ১৮ টাকা মাইনের শিক্ষকতার চাকরী তাঁর জীবনের আর্থিক অনটনটা কিছুটা লাঘব করেছিল। কাজেই নতুন উদ্যম নিয়ে তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। অঙ্কটা তাঁর পক্ষে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তিনি দু'-দু'বার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে অঙ্কের জন্যে অকৃতকার্য হন। ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার আশা তাঁর তখনই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা তিনি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারেও তাঁকে কি কষ্ট করতে হয়েছিল তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন। তাঁরই লেখা থেকে সেই সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ নীচে তুলে ধরছি—

কলেজে প্রবেশের চেষ্টা—"যেন তেন প্রকারে ম্যাট্রিকুলেশনটা তো পাশ করলাম, কিন্তু এলো সেকেণ্ড ডিভিসন ; কুইন্স কলেজে ভর্তির আশা রইলো না। কেবল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদেরই মাইনের ছাড় দেওয়া হত। সৌভাগ্যবশতঃ সেই বছরেই হিন্দু কলেজ খুলে গিয়েছিল। আমি ঠিক করলাম যে নতুন কলেজে পড়বো। প্রিন্সিপাল ছিলেন মিঃ রিচর্ডসন। তাঁর বাড়ি গেলাম। তিনি বিশুদ্ধ ভারতীয় পোষাকে ছিলেন। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে মাটিতে বসে কিছু লিখছিলেন। কিন্তু মেজাজটা পাল্টানো এত সহজ ছিল না। আমার প্রার্থনা শুনে—অর্দ্ধেকটাই বলতে পেরেছিলাম—বললেন যে, ঘরে আমি কলেজের কোন কথা বলি না, কলেজে এসো। যাক্, গেলাম কলেজে। সাক্ষাৎ তো হ'লো, কিন্তু হতাশ হ'তে হলো। মাইনে থেকে মুক্তি সম্ভব ছিল না। আর কি করতাম ? যদি কোন প্রসিদ্ধ লোকের প্রশংসাপত্র আনতে পারতাম তাহলে হয়তো বা আমার আবেদনের ওপর চিন্তা ভাবনা করা হতো। কিন্তু গ্রাম্য যুবককে শহরে কেই বা চিনতো !

"প্রত্যহ বাড়ি থেকে বের হতাম কারো সুপারিশ-পত্র জোগাড় করতে। কিন্তু বারো মাইল পথ হেঁটে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতাম।" কাকে বলি ?

"কয়েক দিন পর একটা সুপারিশপত্র পেয়ে গেলাম। ইন্দ্রনারায়ণ সিং নামে এক ঠাকুর হিন্দু কলেজের ব্যবস্থা-সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম। আমার প্রতি তাঁর মনে করুণার উদ্রেক হলো। তিনি সুপারিশ করে একটা পত্র দিলেন। সে সময় আমার আনন্দের সীমা ছিল না। সানন্দে গৃহে ফিরলাম। পরের দিনই অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বাসনা ছিল। কিন্তু বাড়ি পৌঁছেই এলো প্রচণ্ড জ্বর এবং দু'সপ্তাহ পর্যন্ত নড়তেও পারলাম না। নিমের রস পান করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। এক দিন দরজায় বসেছিলাম, এমন সময় পুরোহিত এসে উপস্থিত। আমার অবস্থা দেখে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তক্ষুণি মাঠে গিয়ে একটি শেকড় নিয়ে এসে সেটাকে ধুয়ে সাতটি গোলমরিচ চূর্ণ করে ওটার সঙ্গে মিশ্রিত করে আমাকে খাইয়ে দিলেন। ম্যাজিকের মত কাজ করলো। জ্বর আসতে ঘণ্টা-খানেক বিলম্ব ছিল ! এই ওষুধটা যেন জ্বরের কণ্ঠরোধ করে ফেললো ; আমি বারংবার পণ্ডিতজীকে সেই শেকড়ের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তিনি নাম না বলে বললেন—নাম বলে দিলে ওষুধের কাজ হবে না।

এক মাস পর আমি পুনর্বার রিচার্ডসনের সঙ্গে দেখা করলাম এবং

সুপারিশপত্রটি দেখালাম। অধ্যক্ষ মহাশয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—এত দিন কোথায় ছিলে?

"অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।"

"কি অসুখ?"

"আমি এই প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। যদি জ্বর বলি তবে সাহেব হয়তো আমাকে মিথ্যেবাদী ভাববেন। আমার মতে জ্বর অতি সাধারণ জিনিস তার জন্যে এত দীর্ঘমেয়াদী অনুপস্থিতি অনাবশ্যক ছিল। এমন কোন রোগের নাম বলতে হবে যা কষ্টকর আবার করুণার উদ্রেক করবে। তখন আমার এমন কোনো রোগের নামও মনে পড়লো না। আমি যখন ঠাকুর ইন্দ্রনারায়ণ সিংএর সঙ্গে সুপারিশের জন্যে সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন তাঁকে হৃদয় সংক্রান্ত রোগের কথা বলেছিলাম। সেই কথাই আমার মনে এলো। বললাম—

"**Palpitation of heart,**" **sir.**

"সাহেব বিস্মিত হয়ে আমার পানে তাকালেন এবং বললেন—এখন তুমি পুরো সুস্থ হয়েছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা **Admission form** ভরে আন।"

"আমি ভাবলাম উদ্ধার পেলাম। ফর্ম নিলাম, ভরলাম এবং দিলাম। সাহেব তখন কোন ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনটের সময় আমি ফর্ম ফিরে পেলাম। তাতে লেখাছিল—"এর যোগ্যতার পরিমাপ করা হোক।"

"এ আবার এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। আমার মন উদাস হয়ে গেল। ইংরাজি ব্যতীত আর কোন বিষয়ে পাশ করার আশা আমার ছিল না। বীজগণিত এবং রেখাগণিতের নামেও আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠতো। যেটুকু মনে ছিল তাও ভুলেটুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিই বা আর আমার করার ছিল। ভাগ্যের ওপর ভরসা করে ক্লাসে গেলাম। প্রোফেসর সাহেব বাঙ্গালী ছিলেন। ইংরাজি পড়াচ্ছিলেন।

"ওয়াশিংটন ইরবিং এর" রিপভ্যান ভিঙ্কিল ছিল। আমি পিছনের পংক্তিতে গিয়ে বসে পড়লাম এবং দু'চার মিনিটের মধ্যেই বুঝে ফেললাম যে অধ্যাপক মহাশয় নিজের বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তি। ঘণ্টা পড়লে পর তিনি আমাকে আজকের পড়া সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন এবং আমার ফর্মের ওপর লিখে-দিলেন—"সন্তোষজনক।"

"দ্বিতীয় ঘণ্টাটি ছিল বীজগণিতের। এর প্রফেসরও ছিলেন বাঙ্গালী। আমি ফর্মটা দেখালাম। নতুন সংস্থাতে সাধারণতঃ এমন ছাত্ররাই আসে যারা আর কোথাও জায়গা পায় না। এখানেও সেই অবস্থাই ছিল। ক্লাসে অযোগ্য ছাত্র ভরা ছিল। যারা আগে এসেছে তারাই ভর্তি হয়ে গেছে। পেটে ক্ষিধে থাকতে ঘাসপাতা সবই রুচিকর মনে হয়। এখন পেট ভরে গেছে। বেছে বেছে ছাত্র নেওয়া হচ্ছিল। প্রোফেসর সাহেব আমার পরীক্ষা নিলেন এবং আমি ফেল করলাম। ফর্মে গণিতের স্থানে লিখে দিলেন "অসন্তোষজনক।"

আবার নিরাশার অন্ধকার ঘিরে ফেললো তাঁকে। তিনি ফর্মটা নিয়ে আর অধ্যক্ষের নিকট গেলেনই না। সোজা বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। তিনি গণিতকে তাঁর পক্ষে অলঙ্ঘনীয় গৌরীশঙ্কর চূড়া বলে অভিহিত করতেন। ইণ্টারমিডিয়েটে দু'দুবার গণিতে ফেল করার পর যখন গণিত ঐচ্ছিক বিষয় হয়ে গেল তখন তিনি ইণ্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। তাঁর আকাঙ্খা ছিল কোন প্রকারে অঙ্ক শিখে কলেজে ভর্তি হয়ে অন্যান্য ছাত্রদের মতন কলেজ-জীবনের আনন্দ উপভোগ করেন; যার জন্যে শহরে বাস করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

প্রাথমিক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা কালেই কিন্তু দু'দুবার অসফল হয়ে তিনি প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলেন! এমনি সময় তাঁর একটি সুযোগ আসে। দু-তিন বছর শিক্ষকতার দৌলতে তিনি সরকারী ট্রেনিং কলেজে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেন। এই ট্রেনিং এর জন্যে তাঁকে এলাহাবাদ চলে যেতে হয়। এখানে প্রথম বছর তাঁকে প্রিপেরেটরী ক্লাসে শিক্ষালাভ করতে হয়। তারপর তিনি জুনিয়র ক্লাসে উন্নীত হন। এলাহাবাদে এই একমাত্র ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ছাত্রদরদী উদার মতাবলম্বী ভদ্রলোক যাঁর নাম ছিল ক্যাম্পবেষ্টর। এখান থেকেই তিনি ১৯০৪ সালে "জুনিয়র সার্টিফিকেটেড টিচর" পরীক্ষা পাশ করেন প্রথম বিভাগে। ধনপতের অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁকে ট্রেনিং কলেজের মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করে দেন। তিনি সেখানেই হোষ্টেলে থাকবার জায়গা পেয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে প্রেমচন্দ এই ইংরেজ অধ্যক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যে বছর তিনি ট্রেনিং কলেজ থেকে পাশ করেন সে বছরেই তিনি ওরিয়েণ্টাল এলাহাবাদ য়ুনিভর্সিটির স্পেশল ভার্ণাকুলার পরীক্ষায় হিন্দী এবং উর্দু পাশ করেন।

আগেই বলেছি ধনপতকে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার জন্য ততদিন অপেক্ষা

করতে হয়েছিল যতদিন অঙ্কশাস্ত্র ঐচ্ছিক না ঘোষিত হয়। ইংরাজি, দর্শনশাস্ত্র, ফারসী এবং আধুনিক ইতিহাস নিয়ে তিনি ১৯১০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করেন। যদিও তারপর তিনি অতি সহজেই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু ধনপতের লক্ষ্য তো পরীক্ষা পাশ ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে পুস্তক প্রেমিক বা বইয়ের পোকা। পড়া তাঁর ব্যসন, তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তাই ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার প্রায় দশ বৎসর পর ১৯১৯ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ, পাশ করেন ইংরাজি, ফারসী এবং ইতিহাস নিয়ে। এ সময় তিনি সরকারী বিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছিলেন।

প্রথম গল্প—পরীক্ষা পাশের এই দীর্ঘ অভিযানে এবং অধ্যাপনার এই কার্যে নিরত থেকেও ধনপত রায় কিন্তু হাতের কলম ছাড়েন নি। তাঁর প্রথম দিকের লেখার ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একটু বিব্রত বোধ করতে বাধ্য যে হেতু এ সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের মতামতে সমন্বয়ের অভাবও বিদ্যমান। তাই এ সম্পর্কে প্রেমচন্দের নিজের লেখা থেকে উদধৃতি দিয়ে সংশয়ের মীমাংসা করাই শ্রেয় বলে মনে করছি। তিনি লিখছেন—

"আমি ১৯০৭ সালে প্রথম গল্প লেখা শুরু করি। ডাঃ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পের ইংরাজি অনুবাদ আমি পড়েছিলাম; যেগুলির উর্দু অনুবাদ আমি কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত করি। উপন্যাস তো আমি ১৯০১ সালে লিখতে আরম্ভ করি। আমার একটি উপন্যাস ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয়টি ১৯০৪ সালে; কিন্তু গল্প আমি ১৯০৭ সালের পূর্বে একটিও লিখিনি। আমার প্রথম গল্পের নাম ছিল, "সংসার কা সবসে অনমোল রত্ন।" এ গল্পটি ১৯০৭ সালে উর্দু পত্রিকা "জমানা"য় প্রকাশিত হয়। এর পর 'জমানা"য় আমি আরো চার পাঁচটি গল্প লিখি।"

'জমানা'র সম্পাদকের লেখা থেকে বোঝা যায় যে ১৯০৪ সালেই ধনপতরায় 'জমানা"র স্তম্ভ লেখক হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯০৫ সালে জমানায় প্রকাশনার জন্যে ধনপতরায় একটি সমালোচনামূলক লেখা পাঠিয়ে ছিলেন। তারই সঙ্গে একটি উপন্যাসের কাঠামোও তিনি সম্পাদকের নিকট পাঠিয়ে' ছিলেন তাঁর পরামর্শ নেওয়ার জন্যে।

১৯০১ এবং ১৯০২ সালে যে দুটি উপন্যাসের কথা প্রেমচন্দ নিজে লিখেছেন স দুটির নাম সম্ভবতঃ ছিল 'কৃষ্ণা' এবং "হম খুরমা ঔর হম সবাব।" মুনশী

জ্ঞাগেশ্বর প্রসাদ বর্ম্মা 'বেতাব' লিখেছেন যে প্রেমচন্দের প্রথম উপন্যাস ছিল "প্রেমা" যা হিন্দীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মতে এটার উর্দু নাম ছিল প্রতাপচন্দ্র। পুস্তকটির লেখকের স্থানে নাম ছিল ধনপত রায়। বর্ম্মাজী যাই বলুন তাঁর কথার সমর্থন কিন্তু আর কোথাও পাওয়া যায় না।

১৮৯৫ সালে মামুকে নিয়ে লেখা নাটকটি অপ্রকাশিতই রয়ে গেলো। কিন্তু ১৮৯৪ সালে ১৪ বৎসর বয়সে তিনি আরেকটি নাটক লেখেন "হোনহার বীরবানকে চিকনে চিকনে পাত" নাম দিয়ে। এরপর ১৮৯৮ সাল থেকে তিনি উর্দুতে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। সে বছরেই "ইসরারে মোহব্বত" নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় "আওয়াজে খল্ক" পত্রিকায়। একই সময়ে তিনি দ্বিতীয় উর্দু উপন্যাস লেখেন 'রুঠী রাণী' নামে। এটা ছিল ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উপন্যাস। এর বছর দুই পরেই ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয় 'প্রেমা'। পুনরায় বছর দুই পরে প্রকাশিত হয় "হম খুরমা ও হম সবাব" নামক উপন্যাস ১৯০৪-৫ সালে। নারী জীবনে বৈধব্যের যে কি জ্বালা তারই স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন তিনি এই পুস্তক দু'টিতে। এ সব রচনা তাঁর প্রারম্ভিক রচনা হিসেবে স্বীকৃত, এগুলোর সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই। তবে এগুলোই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ভিত্তি-প্রস্তর। এর ভাষা তৎকালীন উর্দু লেখকদের মতই কঠিন ও কৃত্রিমতায় ভরা। স্বাভাবিক সাবলীল ভাষায় লেখার অভাব ছিল তখনকার উর্দু সাহিত্যে; প্রাথমিক এই রচনাগুলি সম্পর্কে নিজেই সম্পাদকের নিকট একটি পত্রে তিনি লিখেছেন—"এখন পর্যন্ত আমি এটাই ঠিক করতে পারলুম না যে কি রচনাশৈলী আমি অনুসরণ করবো। কখনও বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলী (style) নকল করি আবার কখনো আজাদের। ইদানিং টল্‌স্টয়ের রচনাগুলি পড়েছি তাই এখন তাঁরই পদ্ধতি অনুসরণ করার ইচ্ছে হচ্ছে; এটা তো আমার নিজের দুর্বলতা আবার কি?...এই লেখাটি যেটা সোজা সরলভাষায় লেখা।"

উর্দু পত্রিকা "জমানা'র সম্পাদকের সঙ্গে যে পত্রালাপ হয় তা প্রকাশিত হয়েছে যাতে বোঝা যায় যে ক্রমশঃ তিনি এ কথাটা উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে গল্প ও উপন্যাসের ভাষাকে করতে হবে সহজ সরল প্রাঞ্জল অথচ প্রাণবন্ত। প্রসাদগুণ থাকা একান্ত ভাবেই বাঞ্ছনীয়। প্রেমচন্দ যত বেশী পাঠকের সংস্পর্শে এসেছেন সাধারণ মানুষের নৈকট্য লাভ করেছেন তাঁর লেখন শৈলী ততই পরিষ্কৃত ও প্রবাহময় হয়ে উঠেছে।

প্রেমচন্দের প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯০৫ সালে যখন তিনি এলাহাবাদ থেকে বদলী হয়ে এলেন কানপুরে। প্রেমচন্দের প্রাথমিক লেখাগুলির অধিকাংশ মুদ্রিত হয় এই কানপুর থেকে প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা 'জমানায়।' এই পত্রিকার সম্পাদক মুন্সী দয়ানারায়ণ নিগমের সঙ্গে তাঁর পূর্বেই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল পত্রালাপের মাধ্যমে। তাই যখন তিনি কানপুরে বদলি হয়ে এলেন তখন উভয় পক্ষেরই সুবিধে হয়! যদিও নিগম সাহেব অপেক্ষা প্রেমচন্দ দু'তিন বছর বড়ই ছিলেন কিন্তু প্রেমচন্দ তাঁকে অগ্রজ রূপেই মান্য করতেন এবং তাঁর সব কাজে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। নিগম সাহেবের পরামর্শ তাঁর পক্ষে আদেশের সমতুল্য ছিল। প্রেমচন্দের মৃত্যুর পর নিগম সাহেব 'জমানা' পত্রিকার একটি স্মারক অঙ্ক প্রকাশিত করেন তাতে তিনি নিজেই লিখেছেন—"আশ্চর্যের বিষয় এই যে বয়সে আমার চেয়ে বড় হয়েও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে বড় ভাই বলে মনে করতেন। যখন আমরা ঠাট্টা-তামাসা করে দিন কাটাতাম তখনও তিনি আমার কথার মূল্য দিতেন এবং আমাকে বিশেষ সম্মান করতেন। আমার পরিচিতরা তাঁর পরিচিত এবং আমার বন্ধুরা তাঁর বন্ধু ছিল।"

কানপুরে এসে প্রেমচন্দ বহুদিন নিগম সাহেবের বাড়িতেই থাকেন। কাজেই তাঁর বন্ধুত্ব ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিগম সাহেবের বাড়িতে অথবা তাঁর পত্রিকা কার্যালয়ে অন্যান্য সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বসতো, হাসি ঠাট্টা হতো, আবার মাঝে মাঝে গূঢ় তাত্ত্বিক বিষয়েও তর্ক বিতর্ক চলতো। প্রেমচন্দের একটা গুণ ছিল, তিনি খুব হাসতেন। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অপরকেও হাসতে বাধ্য করতেন। কিছু দিন পর প্রেমচন্দ অন্য ভাড়া বাড়িতে উঠে যান তবে আড্ডাটার আকর্ষণ তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না।

প্রেমচন্দ ছিলেন অতি উদার প্রকৃতির। দরিদ্রের প্রতি তাঁর মনে স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল অপরিসীম যার জন্যে তাদের বহু অন্যায় আবদারকে তিনি নীরবে সহ্য করতেন। তাঁর পত্নী শিবরাণী রচিত "প্রেমচন্দ ঘর মে" গ্রন্থটিতে তিনি এমন বহু ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে তাঁর ঔদার্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রেমচন্দের একটা নতুন কোট তৈরী করা হলো, তিনি সেটা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বন্ধুকে অথবা কোন শ্রমিককে দিয়ে দিলেন। জুতো কিনলেন, বন্ধুবর সেটা ব্যবহার

করতে লাগলেন। তিনি পুরোনো ছেঁড়া চটি বা জুতোতেই সন্তুষ্ট। শিবরাণী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে একবার তিনি স্বামীকে একটা কোটের জন্যে টাকা জোগাড় করে দিলেন। কিন্তু তিনি তা তাঁর প্রেস-কর্মচারিদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। তাঁর এই সহজ সারল্যের জন্যে তিনি বহুবার প্রতারিতও হয়েছেন। বন্ধুবর নিগমের লেখা থেকেও এরকম কয়েকটি ঘটনার কথা জানা যায়।

এই কানপুরে এসেই নিত্যনৈমিত্তিক সাহিত্যিকদের আসরে বসে প্রেমচন্দের জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। এখানে তিনি শেখেনও অনেক কিছু। তৎকালীন উর্দু সাহিত্যিক শাকির সাহেব মেরঠী লিখছেন—"মুন্সী প্রেমচন্দের পড়বার প্রচণ্ড শখ ছিল। এমন কোনো বিষয় ছিল না যার ওপর তিনি একটাও বই পড়েন নি। তাঁর স্মৃতিশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রবল! গল্প উপন্যাস পড়া এবং তা মনে রাখা বিশেষ কোন কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রেমচন্দ পুস্তক ও পত্র পত্রিকার বিশেষ ব্যাপারগুলো এমন ভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন যেন সেই অংশগুলি তিনি পড়ে শোনাচ্ছেন। ·· 'জমানা' পত্রিকায় বিশেষ ঘটনাবলীর ওপর "রফতারে জমানা" স্তম্ভে একটা লেখা বেরোতো যা পাঠকরা খুব মনোযোগ সহকারে পড়তেন। ১৯০৭-৮ সালের অধিকাংশ লেখা প্রেমচন্দই লিখতেন। বইয়ের সমালোচনা রূপে তিনি যে লেখা লিখতেন সেগুলো 'জমানা' পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা বলে পরিগণিত হত।"

এটা ঠিক যে কানপুরে থাকতে তিনি নিগম সাহেবকে তাঁর পত্রিকা সম্পাদনায় যে সাহায্য করেছিলেন তা তাঁর সাহিত্য জীবনের পরিসীমায় পড়ে না কিন্তু এখানে তাঁর লেখায় অনেক ধার সংযোগ হয়, ভাষার জটিলতা দূর হয়, সহজ সরল ভাবে লেখার পদ্ধতিতে হাত পাকে এবং বৃহৎ সাহিত্য ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এখানে তিনি বৃহত্তর সমাজের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ লাভ করেন। রাজনীতির পাঠও তিনি এখানেই গ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্য সম্ভারে যে অসংখ্য প্রবাদ বাক্য ব্যবহার হয়েছে তার ব্যবহারিক শিক্ষাও তিনি এখানেই পেয়েছেন। প্রবাদ বাক্যের এমন সাবলীল ও চটুল ব্যবহার বোধ হয় হিন্দী সাহিত্যে আর কেউই করতে সক্ষম হন নি।

নাম পরিবর্তন—১৯০৮ সালের শেষের দিকেই প্রেমচন্দ নিজ কার্য-

প্রেমচন্দের প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯০৫ সালে যখন তিনি এলাহাবাদ থেকে বদলী হয়ে এলেন কানপুরে। প্রেমচন্দের প্রাথমিক লেখাগুলির অধিকাংশ মুদ্রিত হয় এই কানপুর থেকে প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা 'জমানায়।' এই পত্রিকার সম্পাদক মুন্শী দয়ানারায়ণ নিগমের সঙ্গে তাঁর পূর্বেই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল পত্রালাপের মাধ্যমে। তাই যখন তিনি কানপুরে বদলি হয়ে এলেন তখন উভয় পক্ষেরই সুবিধে হয়! যদিও নিগম সাহেব অপেক্ষা প্রেমচন্দ দু'তিন বছর বড়ই ছিলেন কিন্তু প্রেমচন্দ তাঁকে অগ্রজ রূপেই মান্য করতেন এবং তাঁর সব কাজে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। নিগম সাহেবের পরামর্শ তাঁর পক্ষে আদেশের সমতুল্য ছিল। প্রেমচন্দের মৃত্যুর পর নিগম সাহেব 'জমানা' পত্রিকার একটি স্মারক অঙ্ক প্রকাশিত করেন তাতে তিনি নিজেই লিখেছেন— "আশ্চর্যের বিষয় এই যে বয়সে আমার চেয়ে বড় হয়েও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে বড় ভাই বলে মনে করতেন। যখন আমরা ঠাট্টা-তামাসা করে দিন কাটাতাম তখনও তিনি আমার কথার মূল্য দিতেন এবং আমাকে বিশেষ সম্মান করতেন। আমার পরিচিতরা তাঁর পরিচিত এবং আমার বন্ধুরা তাঁর বন্ধু ছিল।"

কানপুরে এসে প্রেমচন্দ বহুদিন নিগম সাহেবের বাড়িতেই থাকেন। কাজেই তাঁর বন্ধুত্ব ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিগম সাহেবের বাড়িতে অথবা তাঁর পত্রিকা কার্যালয়ে অন্যান্য সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বসতো, হাসি ঠাট্টা হতো, আবার মাঝে মাঝে গূঢ় তাত্ত্বিক বিষয়েও তর্ক বিতর্ক চলতো। প্রেমচন্দের একটা গুণ ছিল, তিনি খুব হাসতেন। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অপরকেও হাসতে বাধ্য করতেন। কিছু দিন পর প্রেমচন্দ অন্য ভাড়া বাড়িতে উঠে যান তবে আড্ডাটার আকর্ষণ তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না।

প্রেমচন্দ ছিলেন অতি উদার প্রকৃতির। দরিদ্রের প্রতি তাঁর মনে স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল অপরিসীম যার জন্যে তাদের বহু অন্যায় আবদারকে তিনি নীরবে সহ্য করতেন। তাঁর পত্নী শিবরাণী রচিত "প্রেমচন্দ ঘর মে" গ্রন্থটিতে তিনি এমন বহু ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে তাঁর ঔদার্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রেমচন্দের একটা নতুন কোট তৈরী করা হলো, তিনি সেটা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বন্ধুকে অথবা কোন শ্রমিককে দিয়ে দিলেন। জুতো কিনলেন, বন্ধুবর সেটা ব্যবহার

করতে লাগলেন। তিনি পুরোনো ছেঁড়া চটি বা জুতোতেই সন্তুষ্ট। শিবরাণী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে একবার তিনি স্বামীকে একটা কোটের জন্যে টাকা জোগাড় করে দিলেন। কিন্তু তিনি তা তাঁর প্রেস-কর্মচারিদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। তাঁর এই সহজ সারল্যের জন্যে তিনি বহুবার প্রতারিতও হয়েছেন। বন্ধুবর নিগমের লেখা থেকেও এরকম কয়েকটি ঘটনার কথা জানা যায়।

এই কানপুরে এসেই নিত্যনৈমিত্তিক সাহিত্যিকদের আসরে বসে প্রেমচন্দের জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। এখানে তিনি শেখেনও অনেক কিছু। তৎকালীন উর্দু সাহিত্যিক শাকির সাহেব মেরঠী লিখছেন—"মুন্সী প্রেমচন্দের পড়বার প্রচণ্ড শখ ছিল। এমন কোনো বিষয় ছিল না যার ওপর তিনি একটাও বই পড়েন নি। তাঁর স্মৃতিশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রবল! গল্প উপন্যাস পড়া এবং তা মনে রাখা বিশেষ কোন কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রেমচন্দ পুস্তক ও পত্র পত্রিকার বিশেষ ব্যাপারগুলো এমন ভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন যেন সেই অংশগুলি তিনি পড়ে শোনাচ্ছেন। ·· 'জমানা' পত্রিকায় বিশেষ ঘটনাবলীর ওপর "রফতারে জমানা" স্তম্ভে একটা লেখা বেরোতো যা পাঠকরা খুব মনোযোগ সহকারে পড়তেন। ১৯০৭-৮ সালের অধিকাংশ লেখা প্রেমচন্দই লিখতেন। বইয়ের সমালোচনা রূপে তিনি যে লেখা লিখতেন সেগুলো 'জমানা' পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা বলে পরিগণিত হত।"

এটা ঠিক যে কানপুরে থাকতে তিনি নিগম সাহেবকে তাঁর পত্রিকা সম্পাদনায় যে সাহায্য করেছিলেন তা তাঁর সাহিত্য জীবনের পরিসীমায় পড়ে না কিন্তু এখানে তাঁর লেখায় অনেক ধার সংযোগ হয়, ভাষার জটিলতা দূর হয়, সহজ সরল ভাবে লেখার পদ্ধতিতে হাত পাকে এবং বৃহৎ সাহিত্য ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এখানে তিনি বৃহত্তর সমাজের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ লাভ করেন। রাজনীতির পাঠও তিনি এখানেই গ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্য সম্ভারে যে অসংখ্য প্রবাদ বাক্য ব্যবহার হয়েছে তার ব্যবহারিক শিক্ষাও তিনি এখানেই পেয়েছেন। প্রবাদ বাক্যের এমন সাবলীল ও চটুল ব্যবহার বোধ হয় হিন্দী সাহিত্যে আর কেউই করতে সক্ষম হন নি।

নাম পরিবর্তন—১৯০৮ সালের শেষের দিকেই প্রেমচন্দ নিজ কার্য-

ক্ষমতা ও দক্ষতাকে মূলধন করে জেলা বোর্ডের সাব ইন্‌সপেক্টর পদে উন্নীত হয়ে কানপুর ছেড়ে মহোবায় এসে বাস করতে থাকেন। এখানে তিনি এক নাগাড়ে প্রায় দু'বছর থাকেন। এখানে অবস্থান কালেই তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রুঠী রাণী' প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি রাজপুতদের অদম্য সাহস ও বীরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। এই সময় তাঁর কয়েকটি ঐতিহাসিক কাহিনীও প্রকাশিত হয় যার মধ্যে 'রাণী সারন্ধা', 'বিক্রমাদিত্য কা তেগা' 'রাজা হরদৌল' ইত্যাদি ছিল। এতে বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে তিতিক্ষারও অপূর্ব ছবি তিনি এঁকেছেন। এই গল্প উপন্যাসের দ্বারা তিনি ভারতীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। মুমূর্ষু জাতির মধ্যে অতীতের গৌরবময় উজ্জ্বল দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছিলেন। পূর্ব পুরুষের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে ঘুমন্ত নিষ্ক্রিয় ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। আসলে ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতে যে জাতীয় জাগরণ আসে তারই স্পর্শ লাগে প্রেমচন্দের সাহিত্যে। প্রেমচন্দ নিজে বলেছেন যে ১৯০৭ সালে লেখা "সংসার কা সবসে অনমোল রত্ন" তাঁর প্রথম গল্প। এ গল্পে পৃথিবীর সর্বাধিক অমূল্য রত্ন কি তারই উত্তর দিতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে দেশের জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দেয় তাদের রক্তই হ'ল সেই অমূল্য সম্পদ। দেশের গণজাগরণের যে নতুন অধ্যায় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ সময় আরও কয়েকটি সুন্দর গল্প লেখেন। পাঁচটি গল্পকে নিয়ে "সোজেওতন" নামক তাঁর প্রথম গল্প সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এই গল্প সঙ্কলনটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। প্রেমচন্দ আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধে এই ঘটনাটির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন আমি তাই পাঠকের সামনে তুলে ধরছি—

"সে সময় আমি শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর রূপে হমীরপুরে নিযুক্ত ছিলাম। বইটি প্রায় ছ মাস পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। একদিন রাত্রে আমি আমার শিবিরে বসেছিলাম এমন সময় জেলাধীশের পরোয়ানা এলো— এক্ষুণি আমার সঙ্গে দেখা কর। শীতের দিন, সাহেব ট্যুরে বেরিয়েছেন আমি গরুর গাড়ি ঠিক করে রাতে ৩০-৪০ মাইল অতিক্রম করে সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর সামনে "সোজেওতন" এর একটি কপি রক্ষিত ছিল। আমার মাথা যেন একটা ধাক্কা খেলো। সে সময় আমি "নবাব রায়

নামে লিখতাম। আমি এ ব্যাপারে কিছু শুনেছিলাম যে সী, আই, ডি, পুলিশ এ বইয়ের লেখকের খোঁজ করছে। বুঝে গেলাম, ওরা আমাকে খুঁজে পেয়েছে এবং তারই কৈফিয়ত তলব করার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—এ বইখানা তুমি লিখেছ?

আমি সম্মতি জানালাম।

সাহেব আমাকে প্রতিটি গল্পের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন, অবশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তোমার গল্পে "সিডিশন" (রাজদ্রোহ) ভরা আছে। তোমার ভাগ্য ভাল যে ইংরেজদের রাজত্বে বাস করছ। মোঘলদের শাসন হতো তো তোমার দুটি হাতই কেটে ফেলা হতো। তোমার গল্পগুলি একপেশে। তুমি ইংরেজ সরকারের বদনাম করেছ ইত্যাদি। ঠিক হলো যে আমি যেন "সোজেওতনের" সমস্ত কপি সরকারের হাতে তুলে দিই এবং সাহেবের অনুমতি ব্যতীত যেন কখনও কিছু না লিখি। আমি মনে মনে ভাবলাম, যাক কমের ওপর দিয়েই গেল। সহস্র কপি ছাপা হয়েছিল। মাত্র শ তিনেক কপি বিক্রী হয়েছিল, অবশিষ্ট ৬০০ কপি আমি 'জমানা'র কার্যালয় থেকে আনিয়ে সাহেবের হেফাজতে অর্পণ করলাম।

আমি ভেবেছিলাম বিপদ কাটল, কিন্তু কর্তা ব্যক্তিদের এতে তৃপ্তি হ'ল না। পরে আমি জানতে পারলাম যে সাহেব এই বিষয়টা নিয়ে জেলার অন্য কর্মচারিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দুজন ডেপুটী কালেক্টর এবং ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর—যাদের অধীনে আমি কাজ করতাম—আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে বসলেন। একজন ডেপুটি কালেক্টর গল্পের থেকে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করলেন যে ওর আদি থেকে অন্তিম পর্যন্ত সিডিশন ছাড়া কিছুই নয়। সিডিশনও সামান্য পর্যায়ের নয়। সংক্রামক পর্যায়ের। পুলিশ দেবতা বললেন—এমন ভয়ঙ্কর লোককে নিশ্চয়ই কঠিন সাজা দেওয়া উচিত। ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর সাহেব আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি এই প্রস্তাব দিলেন যে তিনি বন্ধু ভাবে আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার গভীরতা জানবার চেষ্টা করে সমিতির নিকট একটি রিপোর্ট দেবেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন এবং রিপোর্টে লিখে দেবেন যে লেখক কেবল লেখায় উগ্র, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সমিতি তাঁর প্রস্তাব স্বীকার করে নেয় যদিও পুলিশ দেবতা তখনও পাঁয়তারা কষতে থাকলেন।"

পুস্তকটিতে মুদ্রকের নাম না থাকায় মুন্সী দয়ানারায়ণ নিগমেরও ৫০টাকা জরিমানা দিতে হয়। তিনি এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকার দরুণ পরবর্তীকালে এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে "সোজে ওতন" এর যত কপি ছিল তা তিনি অফিসরকে দিয়ে দেন, কিন্তু তাঁর নিকট যে ষ্টক অবশিষ্ট ছিল তার খবর কেউ নিল না, তাই পুস্তকগুলি রক্ষা পেয়ে গেল এবং আস্তে আস্তে তা বিক্রী হতে লাগল। অফিসররা প্রেমচন্দের লেখার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তাকে তিনি উচিত বলে স্বীকার করবেন না। খোলাখুলি ভাবে বিরোধিতা করতে সক্ষম না হলেও 'প্রেমচন্দ' নাম নিয়ে তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সঙ্গে লিখতে লাগলেন।

প্রেমচন্দ অবশ্য নাম পরিবর্তনের জন্যে দুঃখিত ছিলেন। নিজের এই ক্ষোভের কথা তিনি 'জামানা'র সম্পাদক নিগম সাহেবের নিকট লেখা একটি পত্রে জানিয়ে ছিলেন। তিনি লিখেছেন—"প্রেমচন্দ নামটা ভালই, আমারও পছন্দ হয়েছে। আপশোষ এইটুকুই যে নবাবরায় নামটাকে প্রসিদ্ধ করবার জন্যে যে পাঁচ-ছটি বৎসর পরিশ্রম করলাম তা ব্যর্থ হলো। এই মহাশয় (প্রেমচন্দ) সদাই ভাগ্যের দিক দিয়ে লেজকাটা বাঁদর ছিলেন এবং থাকবেন।"

পারিবারিক অশান্তি—প্রেমচন্দের শেষের এই উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁর সমগ্র জীবনে দুঃখ দারিদ্র্য যেন সহচর হয়েই রইল। ভাগ্য তাঁকে বার বার প্রতারিত করেছে, বার বার অসাফল্যের বোঝা স্কন্ধে চাপিয়েছে; তাঁর মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে; কিন্তু তিনি কখনো ভাগ্যের নিকট মাথা নত করেন নি, নিজেকে ভাগ্যের হাতে বিকিয়ে দেন নি। অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ প্রেমচন্দের দ্বিতীয় বিবাহকে ভাল চোখে দেখেন নি। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে প্রেমচন্দ প্রথমা পত্নীকে সৎপথে আনবার কত চেষ্টা করেছেন। তিনি কখনও তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখেন নি যদিও তিনি তাঁর চেয়ে বয়সে বড়, কুরূপা এবং অতি কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে ছিলেন। তিনি জানতেন যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়েই মানুষের মনে কটু ভাবগুলির জন্ম হয়। জন্ম থেকে কেউ ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি কুভাবনাগুলি সঙ্গে নিয়ে আসে না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রতিকূল পরিস্থিতি অথবা অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষের মনে অসৎ ভাবের উদ্রেক করে। তাই তিনি প্রথমা পত্নীর শত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও তার সঙ্গে নিজে কখনো

দুর্ব্যবহার করেন নি। তিনি মনোমালিন্য এবং বিরোধকে দূর করবার জন্যে অকপটে নিরলস ভাবে চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু ফল হ'ল না তখন তিনি নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। সম্পর্ক মধুর করার সমস্ত অস্ত্র যখন অকেজো প্রতিপন্ন হ'ল তখন তাঁর পক্ষে বিচ্ছেদকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। নারীর প্রতি যার মনে অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সঞ্চিত ছিল, তাঁর পক্ষে এ কাজ করা কি করে সম্ভব হতে পারে? তাই তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়েছেন। নারীর প্রতি সমবেদনার যে ফল্গুধারা প্রেমচন্দের হৃদয়ে প্রবাহিত ছিল তা কি প্রচণ্ড ধাক্কা খেল এই ঘটনায় তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পত্নী বিচ্ছেদের মূল কারণ কি প্রেমচন্দের বিমাতা, যাকে তিনি 'চাচী' অর্থাৎ কাকিমা বা খুড়িমা বলে সম্বোধন করতেন? তিনি বহুবার কথা প্রসঙ্গে দ্বিতীয়া পত্নী শিবরাণী দেবীকে বলেছেন যে চাচী না থাকলে হয়তো বা আমাদের দুজনের এই বিচ্ছেদ হতো না। চাচী পরিবারে একচ্ছত্র সম্রা'ট হয়ে থাকতে চাইতেন। সংসারে আয়ের পথ বলতে ছিল একমাত্র প্রেমচন্দের চাকুরী। অথচ সংসারের সব ব্যাপারে হুকুম ও কর্তৃত্ব চলতো চাচীর। চাচীর মনে প্রেমচন্দের প্রতি ছিল না বিন্দুমাত্র অনুরাগ। তাঁর মমতা, স্নেহ, ভালবাসা সব তাঁর নিজস্ব সন্তানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। তাঁর পরিবারে প্রেমচন্দ ছিলেন আয়ের এক যন্ত্র বিশেষ। চাচীর এক মাত্র চেষ্টা ছিল কি করে পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করা যায়। একের বিরুদ্ধে অপরের নালিশ করে উভয়ের মনে কি ভাবে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ বাষ্প পুঞ্জীভূত করা যায় চাচী সেই চেষ্টাই করতেন অহরহ। হয়তো বা এই জন্যেই শিবরাণী দেবীকে বিবাহ করার পরও জীবনের প্রায় আটটি বৎসর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতার বা পরিচিতির সুযোগই ঘটতে পারে নি। শিবরানী দেবী চাইতেন আমার স্বামীর আয়েই যখন সংসার চলছে তখন খরচের চাবিকাঠি আমার হাতেই থাকবে না কেন? ওদিকে চাচী সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের মুঠোয় আবদ্ধ করে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর ব্যাপারেও এই একই ব্যবস্থার জন্যে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকতো। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে সংসারের সমস্ত চাবিকাঠি নিজের আঁচলে বেঁধে রাখার প্রবণতা বিমাতা তাঁর জীবিতকালে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন নি। প্রেমচন্দ সহজে

ঘরমুখো হতে চাইতেন না। যতটা পারতেন বন্ধু বান্ধবদের ওখানে আড্ডা দিয়ে বেড়াতেন। বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে যথাসম্ভব ঘরের বাইরে কাটাতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বিমাতার স্পর্শ বাঁচিয়ে যতটা সময় অন্যত্র কাটানো যায় ততই ভাল, তাই তিনি সেই চেষ্টাই করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর তো সে রকম কোন উপায় ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে শ্বশুরালয়ে শাশুড়ীর চোখের সামনে, তাঁর হুকুমের বাঁদি হয়ে থাকতে হতো। তাই বধূরাও পিত্রালয়ে কাটাতেন অধিকাংশ সময়। শিবরানী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে তিনি বছরের বারো মাসের দশ মাস কাটাতেন পিত্রালয়ে আর দুইমাস শ্বশুরালয়ে। শিবরানীও ছেলেবেলায় মাতৃহারা হয়েছিলেন তাই তিনি শাশুড়ীর নিকট চেয়েছিলেন মাতৃস্নেহের স্পর্শ। কিন্তু বাস্তবে পেলেন শুধুই ঘৃণা ও লাঞ্ছনা, অপমান ও কটূক্তি, অভিশাপ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। তাঁর পিত্রালয়ে থাকবার মধ্যে ছিলেন পিতা ও এক কনিষ্ট ভ্রাতা। এই ভ্রাতাটিকে অতি শৈশব থেকে মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন শিবরানী দেবী। তাই এখানে এসে তিনি শান্তিতে কাল কাটাতে পারতেন। বিবাদ-বিসম্বাদ, ঘৃণা-দ্বেষ আদি থেকে মুক্ত পিত্রালয় তাই তাঁর নিকট বেশী আকর্ষণীয় ছিল।

হ্যাঁ আরও একটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছি। বিমাতা নিজের গৃহে এনে রেখেছিলেন তাঁর এক ভাইকে। এই ভাই-ই ছিল তাঁর বেশী আপন। নিজের সন্তান ও সহোদর ছাড়া অন্যরা যেন ঘরে ছিল অবাঞ্ছিত। এমতাবস্থায় পাঠকবর্গের পক্ষে এটা অনুমান করে নেওয়া অতি সহজ যে কেন প্রেমচন্দকে বিচ্ছেদের জ্বালায় জর্জরিত হতে হতো অথবা কেনই বা বধূরা এ বাড়িকে নিজের বলে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। শিবরানী দেবী বহুবার এ কথাটা তাঁর স্বামীকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রেমচন্দ যেন বুঝেও বুঝতে চান নি। এতটা নিস্পৃহ ভাব পরের বাড়ির মেয়ের পক্ষে কতটা মর্মান্তিক তা বোধ হয় এমন মানব দরদী মানুষ হয়েও প্রেমচন্দ প্রথম জীবনে অনুভব করতে পারেন নি। অনুভব করতে পারেন নি তাই বা বলি কি করে? তিনি কি মানিয়ে চলার কম চেষ্টা করেছেন? শিবরানীর লেখা থেকেই এটা বোঝা যায় যে তিনি অন্তরে অন্তরে কি ভাবে গুমরে মরেছেন, কিন্তু মুখে বিমাতাকে কিছুই কখনও বলেন নি। বলেন নি তাঁর অপেক্ষা বড়, কটুভাষিণী প্রথমা স্ত্রীকেও। শ্রীদয়ানারায়ণ

নিগম জানিয়েছেন যে তাঁর কাছে লেখা প্রেমচন্দের একটি চিঠি আছে যাতে তিনি কোনো তারিখ দেন নি। তবে চিঠির বিষয়বস্তু থেকে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না যে চিঠিটা ১৯০৫ এর কাছাকাছি কোন সময়ে লেখা। এতে তিনি লিখেছেন—"ভাই সাহেব, আমার কথা আর কাকেই বা বলি? সহ্য করতে অসহ্য কষ্ট হচ্ছে। যেন তেন প্রকারে পঙ্ককাল কাটালাম, তারপরেই গৃহকলহের অবিশ্রান্ত প্রবাহ শুরু হয়ে গেল।...স্ত্রী জেদ ধরে বসলেন যে এখানে থাকবেন না, পিত্রালয়ে যাবেন। আমার কাছে টাকা ছিল না। বাধ্য হয়ে ক্ষেতের লভ্যাংশ আদায় করলাম। তাঁর বিদায়ের ব্যবস্থা করলাম; তিনি কান্নাকাটি করে চলে গেলেন। নিজে পৌঁছে দিয়ে আসতেও ভাল লাগলো না। তাঁর বিদায়ের পর আজ অষ্টম দিন গত হ'ল। কোনো চিঠি পত্র পাই নি। আমার মনে অসন্তোষ তো আগে থেকেই ছিল, এখন তো যেন মুখ দেখতেও ঘৃণা করে। মনে হয় তাঁর এই বিদায় স্থায়ী প্রমাণিত হবে। ভগবান করুন যেন তাই হয়। আমি স্ত্রী ছাড়াই থাকবো। এদিকে মামার বাড়ি ও বিমাতা জোর দিচ্ছেন আবার বিয়ে হোক, অবশ্যই হোক। যখন বলি আমি গরীব, তখন মা বলেন তুমি অনুমতি দাও, তোমার কাছ থেকে একটি কানা কড়িও চাওয়া হবে না। এখনতো যে করে হোক মুক্তি পেয়ে যাব কিন্তু ভবিষ্যতের কথা তো ভগবানের হাতে। যেমন আপনি বলবেন তেমনি করবো। এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে।"

এ চিঠিতে একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে এতে বিমাতার প্রতি যেন তাঁর মনে ক্ষোভ নেই। অথচ বিমাতা সম্পর্কে তিনি সর্বত্রই তাঁর কটু অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন। তাঁর জীবনের সুখ-শান্তি যেন তিনিই ছিনিয়ে নিয়েছেন। তিনি খোলাখুলি ভাবেই বলেছেন—"মা তো নিজের, ষোলো আনা নিজের। দ্বিতীয় কোন নারী তাঁর স্থান গ্রহণ করতে পারে না।" তাই উক্ত পত্রের এই নরম সুরটা যেন কানে বাজে। এর সঙ্গে যেন তাল মেলানো কঠিন হয়ে পড়ে। এতে সন্দেহ নেই যে অতি দুঃখের সঙ্গে তিনি তাঁর অগ্রজ প্রতিম দয়ানারায়ণের কাছে নিজের অন্তরের ব্যথাটি ব্যক্ত করে মনের ভার লাঘব করতে চেয়েছেন। তবে প্রেমচন্দের অপর বন্ধু এবং হিন্দী সমালোচক শ্রীহংসরাজ রহবরের অনুমান এই যে হয়তো পরবর্তীকালে প্রেমচন্দ এবং বিমাতার সম্পর্ক ততটা কটু ছিল না যতটা প্রথম দিকে ছিল।

পুনর্বিবাহ—অনুমান করা যেতে পারে যে স্ত্রীর পিত্রালয়ে গমনের পর বাড়িতে কেবল চাচী থাকাতে কর্তৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না এবং তাই গৃহে কিছুটা শান্তি ফিরে এসেছিল। তবে সে শান্তি দীর্ঘ স্থায়ী হয় নি। কেন না 'নিগম' সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে এই শর্তে তিনি পুনর্বিবাহের পক্ষে মত দেন যে মেয়েটিকে বালবিধবা হতে হবে। আত্মীয় স্বজনেরা স্বাভাবিক কারণেই বেঁকে বসেন—এ কেমন কথা। দেখতে সুপুরুষ, সদাহাস্যময় একটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুবক কিনা শেষকালে বিধবা বিবাহ করবে? হাজার অনুরোধ উপরোধেও প্রেমচন্দের মন গললো না। তিনি দৃঢ় ভাবেই তাঁর মতামত জানিয়ে দিলেন। অনন্যোপায় হয়ে এমন মেয়েরই খোঁজ করা হতে লাগলো। সহজেই পাওয়া গেল জেলা ফতহপুরের সলীমপুর নামক গ্রামের একটি মেয়েকে অতি শৈশবেই যার বিবাহ হয়েছিল এবং শৈশব উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যে বৈধব্যের অভিশাপ স্কন্ধে নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিল। মেয়েটি বিশেষ লেখাপড়াও জানতো না। এহেন সরলা বালিকাকে বধূ রূপে বরণ করে নিয়ে এলো উর্দু লেখক নবাবরায়।

প্রেমচন্দ সাহিত্যে বিবাহকে আত্ম বিকাশের একটি মাধ্যম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মতে বিবাহের উদ্দেশ্য হ'ল নারী এবং পুরুষ একে অপরের উন্নতিতে সাহায্য করবে। বোধ হয় তাই প্রেমচন্দ দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এমতাবস্থায় শিবরানীদেবীর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত লেগে থাকবারই কথা। কিন্তু নববধূ নীরবে সব রকম অত্যাচার সহ্য করে যেতেন। যখন অসহ্য বোধ হতো তখন পিত্রালয়ে চলে যেতেন; তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় যে তিনি বছরের বার মাসের দশমাস কাটাতেন পিত্রালয়ে এবং দু'মাস শ্বশুরালয়ে। তিনি দেখতেন যে লোকটা কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা রোজগার করে সংসারের এতগুলো লোকের পেট চালাচ্ছে তারই নিজের ঘরে কোন স্থান নেই। বাইরে থেকে আসা একটা মেয়ে কিই বা করতে পারে? তাই তিনি ডাক এলেই পিত্রালয়ে চলে যেতেন এবং প্রেমচন্দ বিবাহ করেও সেই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রথম আটটি বছর এভাবেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই কেটেছে কিন্তু একদিন একটি ছোট ঘটনা গৃহের পরিবেশ পাল্টে দেয়। শিবরানী পিত্রালয় থেকে আহ্বান পেয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় প্রেমচন্দ বাধা দেন। তর্কযুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রেমচন্দ পত্নীর গালে এক চপেটাঘাত করে বসেন। পত্নী অপমানে, দুঃখে, বেদনায়

মর্মাহত হয়ে অন্ধকার ঘরে বসে থাকেন। প্রেমচন্দও মনে মনে স্বীয় কর্মের জন্য অপ্রস্তুত ও অনুতপ্ত হলেন। সন্ধ্যে বেলা বাইরে থেকে এসে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। তারপর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঠিক হয় যে পারিবারিক কর্তৃত্বের চাবি কাঠিটি ভবিষ্যতে শিবরানীর হাতেই থাকবে। বিমাতার এই অন্যায় অত্যাচার আর সহ্য করা হবে না। স্বামীর নির্লিপ্ততায় যে স্ত্রী অভিমান বশে এতদিন নিশ্চুপ হয়ে শত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে নিজেকে গুটিয়ে ছিলেন এবার সেই স্বামীর অনুমতি পেয়ে তিনি গৃহের সব চাবিকাঠি নিজের আঁচলে বাঁধলেন। প্রথমটা শাশুড়ি প্রতিবাদে মুখর হওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন যে স্বামী স্ত্রীতে বিরোধ বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করে আর কলকাঠি নিজের হাতে রাখা সম্ভব হচ্ছে না তখন তিনিও নীরবে হাত গুটিয়ে নিলেন। এখন থেকেই শিবরানী দেবীর সতেজ রূপ যা শাসনের চাপে চাপা পড়ে গিয়েছিল, উদ্ঘাটিত হল। এবার সর্বার্থে শিবরানী দেবী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হলেন। তাঁর বিপদে আপদে, ভাবনা চিন্তায় সমব্যথী হয়ে উঠলেন। চাকরী থেকে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে যখন প্রেমচন্দ চিন্তিত তখন শিবরানী দেবী তাঁকে সাহস যুগিয়ে আশ্বাস দিলেন—আপনি সংসার চালাবার কথা চিন্তা করবেন না। সে যে করে হোক চলবেই। যদি দেশ চায় বলিদান তবে তাতে বিলম্ব করা উচিত নয়।

এমনি আরো বহু ঘটনায় প্রেমচন্দকে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন শিবরাণী দেবী। যে শিবরাণী দেবী সামান্য হিন্দীর জ্ঞান নিয়ে নববধূ রূপে প্রেমচন্দের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন সেই শিবরাণী স্বামীর সংস্পর্শে গল্প লেখিকা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থ "প্রেমচন্দ ঘর মে" আজও প্রেমচন্দের সর্বাধিক প্রামাণিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ বলে ধরা হয়। এটি না পড়লে পরিবারের এক সদস্য রূপে মানুষ প্রেমচন্দের চরিত্রটা আমাদের নিকট অপ্রকাশিতই থেকে যেত।

প্রেমচন্দের তিন সন্তান, তার মধ্যে দুটি পুত্র ও একটি কন্যা। একটি পুত্র সন্তান অতি শৈশবেই মারা যায়। মেয়ে বড় নাম কমলা। পুত্র শ্রীপতরায় জন্ম গ্রহণ করেন ১৯১৮ সালে। তিনি আজও পারিবারিক ট্রাডিশন ধরে রেখে প্রকাশক ও লেখক রূপে হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তৃতীয় সন্তান অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅমৃত রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে। যদি বলি প্রেমচন্দ নিজের সন্তানদের খুব ভালবাসতেন তবে নিশ্চয়ই পাঠকরা

এই বলে হাসবেন যে পিতা নিজের ছেলে-মেয়েদের ভালবাসবেন এতে আর নতুন কি আছে? নতুনত্ব কিছু আছে বই কি! প্রেমচন্দ নিজের হাতে রাত্রে শিশুদের ভেজা জামা-কাপড় ও কাঁথা পাল্টাতেন, সে কাপড়-চোপড় সকালে নিজের হাতে ধুয়ে শুকিয়ে ঘরে তুলতেন, বাচ্চাদের কান্নাকাটির সময় তাদের কাঁধে ফেলে পায়চারি করতে-করতে ঘুম পাড়াতেন, জ্বর জারিতে রাত জেগে সকলের সেবা করতেন, তারপর দরকার হলে রান্নাঘরের কাজ-কর্ম সারতেন। পরিশ্রান্ত হয়ে কাজের পর ঘরে এলে ঘণ্টাখানেক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলায় মশগুল থাকতেন। বলতেন এই খেলাই আমায় ভবিষ্যতের কাজের প্রেরণা যোগায়। আজকের সমাজে আর ক'জন পিতা রাত জেগে এসব ঝক্কি পোয়াতে সক্ষম বা সম্মত হবেন। এক কথায় বলতে গেলে তিনি পরিবারের সকলের সুখ-সুবিধের জন্তে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ অবধি সবই করতেন।

* * *

বদলী হয়ে প্রেমচন্দ যখন হমীরপুরে এলেন তখন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগল। সেখানকার জল হাওয়া যেন তাঁর পক্ষে আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। তার ওপর খাওয়া দাওয়ার কোনো সুব্যবস্থা না থাকায় শরীরে যেন ভাঙন ধরল। প্রায়ই তিনি পেটে ব্যথা অনুভব করতেন। মাঝে-মাঝে এই ব্যথা এমন কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত যে তিনি মাটিতে পড়ে কাটা ছাগলের মত ছটফট্ করতেন। আগেই বলেছি যে প্রেমচন্দ ভোজন বিলাসী ছিলেন। রকমারী রান্না দেখলে তিনি নিজের রসনাকে সংযত করতে পারতেন না। খাওয়ার সময় তিনি পেটের অসুখের কথা ভুলে যেতেন। পেটপুরে খেয়ে ফেলতেন। ফলে তার পরের দিন খেসারত দিতে হতো উপবাস করে। পেটের এ রোগ যাকে একবার ধরে, সময়ে সাবধান না হ'লে তার আর রক্ষে থাকে না। বাজারে কোনো দোকানে গরম পাকৌড়ী বা দই বড়া বা অন্য কিছু মুখরোচক ব্যঞ্জন দেখলেই পকেটে পয়সা থাকলে তাঁর পক্ষে সামলে চলা কঠিন হয়ে পড়তো। এ সব অত্যাচারের পরিণাম স্বরূপ আমাশা ও গ্যাষ্ট্রিক পাকা পোক্ত ভাবে তাঁর উদরে আস্তানা গাড়লো। এ রোগই শেষ পর্যন্ত তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যখন প্রেমচন্দ বুঝতে পারলেন যে বাঁচতে হলে হমীরপুর তাঁকে ত্যাগ করতেই হবে তখন তিনি '৯১৪ সালে এই আশা নিয়ে বদলীর জন্য দরখাস্ত

করলেন যে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী হলে হয়তো বা এই রোগ থেকে মুক্তি পেতেন। কিন্তু তাঁর আশা নিরাশায় পর্যবসিত হলো। কারণ তাঁকে বদলী ঠিকই করা হলো, কিন্তু তা এমন একটি গণ্ড গ্রামে যেখানে তাঁর স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়ে গেল। এ জায়গাটি হলো নেপালের তরাই অঞ্চলে বস্তী জেলায়। এখানে না ছিল তাঁর মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় না ছিল স্বাস্থ্যোদ্ধারের কোন উপকরণ। তাই দিন-দিন তাঁর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এমন একটি পর্যায় আসে যখন তিনি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। তিনি চিকিৎসার জন্য ছয়মাসের ছুটির আবেদন করেন এবং তা স্বীকৃত হয়। ছুটির পরেই তিনি লখনউ চলে যান এবং মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পরও যখন তিনি রোগমুক্তির কোনো লক্ষণ দেখতে পেলেন না তখন আবার বেনারসে চলে আসেন। এখানে বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে তিনি কবিরাজী চিকিৎসা করান। কয়েক মাসের নিয়মিত চিকিৎসায় রোগ কিছুটা প্রশমিত হয়। সম্পূর্ণ রোগমুক্তি হওয়ার পূর্বেই ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আবার কার্যস্থলে যেতে হয়। কিন্তু এখানে এসেই পুনরায় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ক্রমশঃ এমন অবস্থা হলো যে তাঁর পক্ষে পরিদর্শনের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করার উপায় রইলো না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি অধ্যাপনার জন্যে দরখাস্ত করেন। দরখাস্ত মঞ্জুর হয় এবং ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে বস্তীর সরকারী স্কুলের তিনি সহায়ক শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে এবার প্রেমচন্দ সাহিত্য কর্মে মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে লেখা তাঁর গল্পের মধ্যে কয়েকটি অতি খ্যাতি লাভ করে। পঞ্চপরমেশ্বর, শঙ্খনাদ, জুগনূ কী চমক, ধোখা, বেটি কা ধন ইত্যাদি গল্প তারই মধ্যে পড়ে। এর কিছুদিন পূর্বেই যে গল্পগুলি তিনি লেখেন সেগুলি অপেক্ষা এই গল্পগুলি অনেক উঁচু দরের। "গয়রত কি কটার, শিকারী আওর রাজকুমার, খুন সফেদ আদি ঐতিহাসিক ধাঁচে লেখা গল্প।

শিবরাণী দেবী "প্রেমচন্দ ঘর মে" বইতে বস্তী থাকাকালীন এক ঘটনার কথা লিখেছেন যাতে তাঁর নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে কিছু আভাস পাওয়া যায়। এখানে আমি তাঁরই লেখা ঘটনার ভাষান্তর করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তিনি লিখছেন—

এক দিনের ঘটনা। আমি বস্তী যাচ্ছিলাম। উনি অসুস্থ ছিলেন।

রাত্রি বেলা। পেট ভার ছিল। আমরা তিন জন ছিলাম। গাড়িতে প্রচণ্ড ভীড় ছিল। আমি তাঁর জন্যে বিছানা পেতে দিয়েছিলাম। তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। মেয়েও ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুজন যাত্রী এলো। বললো— অন্যদের বসবার জায়গা নেই আর ইনি ঘুমোচ্ছেন।

শিবরাণী—তোমরাও কোথাও বসে পড়।

"ওঁকে উঠিয়ে দাও।"

"উনি অসুস্থ।"

যাত্রী—শরীর অসুস্থ তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কেন?

শিবরাণী—বক্ বক্ করো না।

গাড়ীর ভাড়া কি শুধু তোমরাই দিয়েছ?

শিব—আচ্ছা, যেখানে জায়গা পাও সেখানে বসে পড়।

যাত্রী—ওঁকে উঠিয়ে বসবো।

শিব—ওঠাও! দেখি আমি!

ও এগিয়ে এলো। আমি রেগে গেলাম। ক্রুদ্ধ হয়ে আমি বললাম— খবরদার যদি সামনে হাত বাড়িয়েছ তো গাড়ি থেকে নীচে ফেলে দেব। আমাদের দুজনের কথায় ওঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। উনি তড়ি-ঘড়ি উঠতে চাইলেন। আমি বললাম আপনি কেন উঠছেন?

প্রেমচন্দ—উঠতে দাও, কেন ঝগড়া করছো?

শিবরাণী—এই গাধাগুলোর সঙ্গে সোজা ভাবে কাজ হবে না। এরা মানুষ নয় পশু। আমি অবস্থার কথা বললাম, তবু এদের বুদ্ধি খোলে না। এরা জোর দেখাতে এসেছে। আমি এদের ফেলে দেবো। ওরা যখন আমার রাগ দেখলো তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কয়েকটি স্টেশন অবধি ওরা দাঁড়িয়েই রইলো। যখন ওরা নেবে গেল তখন বললেন—তুমি খুব সাহসী তো! এমন ধমক দেওয়ার সাহস আমার হতো না। (পৃঃ ৪৩-৪৪)

এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় প্রেমচন্দের পত্নী শিবরাণী দেবী অসীম সাহসী মহিলা ছিলেন। তিনিই স্বামী-পুত্র-কন্যার সত্যিকারের রক্ষক। বিপদে-আপদে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং তা প্রেমচন্দ নিজেও জানতেন, তাই তিনি বলেছেন—আমাকে 'প্রেমচন্দ' হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন শিবরাণী দেবী।

তিন বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি পুনরায় গোরখপুরে ফিরে আসেন।

স্তীতে থাকাকালীন তিনি উর্দুর সঙ্গে হিন্দীতে কলম ধরতে আরম্ভ করেছিলেন। ১৯১৪ সালের লেখা উপন্যাস "সেবাসদন" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে যা পাঠক সমাজে বিপুল সমাদর লাভ করে। এই বস্তীতেই থাকাকালীন তাঁর পরিচয় হয়েছিল ডোমরিয়াগঞ্জের তহশীলদার শ্রীমন্নন দ্বিবেদী গজপুরীর সঙ্গে। তাঁরই প্রেরণায় ও উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে প্রেমচন্দ নিজের উর্দু গল্প ও উপন্যাসগুলির হিন্দী অনুবাদ করে প্রকাশিত করতে আরম্ভ করেছিলেন। "সেবাসদন" প্রেমচন্দের হিন্দীতে লিখিত তৃতীয় উপন্যাস। প্রাচীনকালে প্রকাশিত এক সংস্করণের সময়কাল হ'ল ১৯১৮ সাল। সেবাসদনের সাফল্যই প্রেমচন্দকে হিন্দীতে লেখার উৎসাহ যোগায় এবং তিনি তাঁর বৃহৎ উপন্যাস প্রেমাশ্রম লিখতে আরম্ভ করেন। "প্রেমাশ্রমের" বিষয়বস্তু ভারতীয় গ্রাম্য দুর্দশার কাহিনী। কৃষক ও শ্রমিকের মর্মান্তিক দৈন্য দশা ও তার প্রতি প্রেমচন্দের অসীম দরদের যে ছবি এতে অঙ্কিত হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি একথাটা ভাল করে বুঝেছিলেন যে রেললাইন ডাকব্যবস্থা এবং যাতায়াতের উন্নতি সাধন করার মূল উদ্দেশ্য হলো শোষণ-করা। এগুলিকে ভাল করে শোষণের কাজে লাগানো। শহর উন্নয়নের মনভোলানো পরিকল্পনার অন্তরালে গ্রামে শোষণের সেই প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাণবন্ত করে তোলাই ব্রিটিশ শাসকের লক্ষ্য ছিল। গ্রামের কৃষক শ্রমিক শ্রেণীকে একদল বুভুক্ষু নেকড়ের হাতে সঁপে দিয়ে শহরগুলিকে আধুনিক চাকচিক্যপূর্ণ পোষাকে সুসজ্জিত করে বিশ্বের সামনে নিজেদের প্রগতিশীলতার ঢাক পেটানোই এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। গ্রাম্য অর্থ ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে নিষ্পেষিত করে এখানকার কাঁচা মাল সস্তায় বিদেশে রপ্তানি করে তারই দ্বারা প্রস্তুত আসবাব পত্র ও যন্ত্রাদি আমদানি করে মুনাফা লোটার ব্রিটিশ চক্রান্তের ছবিটা প্রেমচন্দের নিকট এতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তাঁর সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যে তিনি সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। প্রাচীন অর্থ ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্যে জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপসাধন এবং সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের মুক্ত করা এই দুটো উপায়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এটাই সব নয়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, পর্দাপ্রথা এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে মুক্ত না করতে পারলে ভারতের গ্রামীন অর্থব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নয়; এই মূল সত্যটা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুধাবন

করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর সমগ্র সাহিত্য সেই সব সমস্যা বিজড়িত।

চাকুরী ত্যাগ—প্রেমচন্দ ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। চাকরী করা তাঁর মূল-প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবিকার জন্যে তাঁকে চাকুরীর এই পেশা গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি বহুবার বন্ধুবান্ধবদের নিকট চাকুরীর ব্যাপারে নিজের অনিচ্ছা ব্যক্ত ক'রছেন। তৎকালীন সরকারী চাকুরীর মানেই হলো ওপরওয়ালার তোষামোদ, পায়ে তেল দেওয়া, জী হুজুরী করা। তিনি নিগমসাহেবকেও একটি পত্র লিখে চাকুরীর প্রতি তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে "আমি তো তোয়াজ করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছি। আমি চাই এমন কিছু করতে যাতে নিজের মনের আবেগের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হতে পারি।"

দেশের তৎকালীন রাজনীতির জোয়ারে তিনি গা ভাসিয়ে দেন নি ঠিকই কিন্তু দেশ ও দশের ডাকে সাড়া দিয়েই তিনি শেষ কালে তাঁর চাকুরীতে ইস্তফা দেন। শিক্ষকতায় তাঁর নাম ডাক ছিল তাই ছাত্রবন্ধুরা তাদের সর্বাধিক প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরুর এই বিচ্ছেদে অশ্রুসিক্ত হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে বিদায় জানালেন।

শ্রীমতী শিবরানী দেবী এ সম্পর্কে লিখেছেন—"পদত্যাগ পত্র দাখিল করবার পূর্বে প্রেমচন্দ দুটি বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। তিনি নিজেও ঘুমোতে পারেন নি। ভাবতে লাগলাম তাঁকে একটা বিরাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পুরাতন জীবনের সংস্পর্শ ত্যাগ করে নতুন পথ গ্রহণ করতে হবে।" তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে শিবরানী দেবী বললেন—"যখন সিদ্ধান্ত ভাল তখন তাকে অনুসরণ করতে সঙ্কোচ কেন? যা ভেবেছ তাই করে ফেলো।"

নতুন জীবন আরম্ভ হল। সাহিত্যিকের জীবন। এত দিন সাহিত্যকর্ম করেও তিনি সাহিত্যিকের জীবন যাপন করার সুযোগ পান নি। এবার পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে সাহিত্য রস সাগরে নিমজ্জিত করার সুযোগ পেয়ে যেন তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করার অনাস্বাদিত সুযোগ পেলেন।

আসলে প্রেমচন্দ বেশ কিছু কাল থেকেই সত্যাগ্রহীদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলছিল, তার জন্যে নিজের সরকারী চাকুরীর কথা ভেবে ভেবে হীনমন্যতায় ভুগছিলেন। তাঁর বারবার সেই প্রথম রচনা 'সোজে-ওতন' এর ওপর অন্যায় খড়্গাঘাতের কথা মনে হতো। মনে হতো তাঁর লেখার

ওপর অন্যায় অঙ্কুশের কথা। ক্রমশঃ ইংরেজদের প্রতি তাঁর মনে ঘৃণা সঞ্চিত হচ্ছিল। তিনি নিজে অগ্রজ প্রতিম নিগম সাহেবকে তাঁর পুত্রের বিয়ের নিমন্ত্রণের উত্তরে লিখে জানালেন—"আপনি ইংরেজদের অযথা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ওঁরা এটাকে বন্ধুত্ব বলে ভাবে না, চাটুকারিতা ভাবে।"

সরকারী চাকুরী থেকে মুক্তি তো পেলেন কিন্তু স্থায়ী কিছু না করলে তো পেট চালানো দায়। তাই তিনি কানপুরের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদের জন্য আবেদন করেন এবং তা পেয়েও যান। কিছুদিন পর তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। চাকুরীরত অবস্থাতেই তাঁর মনে-মনে ইচ্ছে ছিল প্রেস খুলে নিজের একটি স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করার। প্রেসের জন্যে যে পরিমাণ টাকা দরকার তা তাঁর কাছে ছিল না। এদিক ওদিক থেকে টাকার জোগাড় করে কয়েকজন সঙ্গী জুটিয়ে, শেষ পর্যন্ত তিনি একটি প্রেস খুললেন। নাম দিলেন "সরস্বতী"। উদ্দেশ্য সরস্বতীর সেবা করা। প্রেমচন্দের জীবনে এই প্রেস কিন্তু অনেকটা কুগ্রহের মত কাজ করেছে। তাঁর সাহিত্য জীবনের অনেকটা সময় এই প্রেস ছিনিয়ে নেয়। লেখার সময় অনেকটা কমে আসে। সারা দিন প্রেসের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত দেহে যখন দিনান্তে বাড়ি ফিরতেন তখন আর যেন শরীর বইতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সেই ক্লান্তি দূর হয়ে যেত ঘণ্টাখানেক নিজ সন্তানদের সঙ্গে খেলা ধূলা করার পর। তিনি এবং শিবরাণী দেবীও এটা স্বীকার করেছেন যে নিজের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলাধূলা করার পর তিনি যেন নূতন উৎসাহ ও উদ্যম ফিরে পেতেন। ঘণ্টাখানেকের এই মনোরঞ্জন তাঁর শরীরে যেন সঞ্জীবনী সুধার কাজ করতো। তারপর ছেলেমেয়েরা ঘুমোলে তিনি রাত জেগে লিখতে বসতেন।

প্রেস কর্মচারীগণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অতি সৌহার্দ্র্যপূর্ণ। তাদের অভাব অভিযোগ ও সুখ দুঃখের প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি থাকতো। কিন্তু এত সহানুভূতিশীল এবং পরদুঃখকাতর পরিচালক পেয়েও কর্মচারীরা বিশেষ সুখী ছিল না, তার কারণ প্রেস ম্যানেজার। এই প্রেস ম্যানেজারের অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিবাদে একবার কর্মচারীরা ধর্মঘট করে বসে। শিবরাণী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে প্রেমচন্দ এতে বেশ ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি শিবরাণী দেবীকে বলেন যে কর্মচারীরা যদি পাঁচ মিনিট দেরী করে আসে তবে ম্যানেজার তাদের প্রচণ্ড ভাবে ধমকান, মাইনে কাটেন, বরখাস্ত

করার কথা বলেন। তাদের কাজে বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি হলেই কৈফিয়ৎ তলব করেন; এসব প্রেমচন্দের ভালো লাগতো না। কিন্তু আসলে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলতেন না বলে ম্যানেজার ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁর এই কাজে মালিকের সমর্থন আছে। এ সময় তাঁকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

এই প্রেস থেকেই প্রেমচন্দ 'হংস' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। তাঁরই সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকাটি হিন্দী সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই পত্রিকাটির একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। এটির নামকরণ করা হয়েছিল—"বাণী বিশেষাঙ্ক।" এই সংখ্যাটি চোখে না দেখলে অনুমান করা কঠিন যে সম্পাদক কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন এটার জন্যে। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন এবং তারপর তাঁর বন্ধু "জৈনেন্দ্র" এই দায়িত্বভার সাফল্যের সঙ্গে বহন করেন। শেষের দিকে শিবরাণী দেবী স্বয়ং "হংস"র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাটির আরো কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা আজও সাহিত্য জগতে সমাদৃত যার মধ্যে আছে "প্রেমচন্দ স্মৃতি অঙ্ক", "একাঙ্কী নাটক অঙ্ক", "রেখাচিত্র অঙ্ক", "প্রগতি অঙ্ক" এবং "কহানী অঙ্ক।"

প্রেমচন্দ যখন প্রেস চালাচ্ছেন, 'হংস' পত্রিকা প্রকাশিত ও সম্পাদিত করছেন তখন হঠাৎ ১৯২৪ সালে 'আলবর' রাজ্য থেকে রাজাসাহেবের একটি চিঠি তিনি পান যাতে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে প্রেমচন্দ যদি দয়া করে তাঁর কাছে থাকেন তবে তিনি তাঁকে গাড়ি, বাড়ি এবং ৪০০ টাকা মাসোহারা দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রেমচন্দ চিঠিটি শিবরাণী দেবীকে পড়ে শোনালেন এবং তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। আসলে তিনি তার পূর্বেই তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করে একটি পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শিবরাণী দেবীর উত্তর শুনে তিনি সুখীই হয়েছিলেন। আসলে প্রেমচন্দ ছিলেন স্বাধীনচেতা। চাকরী করা তাঁর পোষাত না। স্বাভিমানী এই মানুষটির মনে লোভ বলে বিশেষ কিছু ছিল না। এরই জন্যে পরবর্তীকালে তিনি কোথাও চাকুরীতে টিঁকে থাকতে পারেন নি।

ব্যক্তি প্রেমচন্দের পরিচয় পাওয়া যায় শিবরাণী দেবীর লেখা "প্রেমচন্দ ঘর মে" গ্রন্থে। ১৯২৯ সালের ঘটনা। একবার প্রেমচন্দ শিবরাণী দেবীকে নিয়ে রেলের "ইণ্টার ক্লাসে" করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি স্টেশনে গাড়ি

থামতেই বহু কৃষক এক সঙ্গে সেই কামরায় উঠে পড়লো। প্রচণ্ড ভীড় হয়ে গেল। একটু নিশ্চিন্তে যাওয়ার আশা ঘুচে গেল। প্রেমচন্দ ওদের জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কোথা থেকে আসছেন আর যাবেনই বা কোথায় ? তারা জানাল যে তারা শীতলা দেবীর দর্শনপ্রার্থী। গ্রাম থেকে এক সাথে বেরিয়েছিলেন। জন প্রতি খরচ পড়েছে পনেরো ষোল টাকা।

প্রেমচন্দ যেন আঁতকে উঠলেন। তখনকার দিনে একটা কৃষকের পক্ষে পনেরো ষোল টাকা খরচ করে শীতলা মাতার দর্শনের জন্যে ট্রেনে যাতায়াত করা একটু অস্বাভাবিক ছিল। তাই তাদের বোঝাতে থাকেন এর ব্যর্থতা। এই টাকা দিয়ে তোমরা চার মাসের অন্নের জোগাড় করতে পারতে। বাইরে দেবীর দর্শনের জন্যে না বেরিয়ে তোমরা বাড়িতেই পূজো করে টাকা বাঁচাতে পারতে। তোমরা সুখে থাকলে, আনন্দে থাকলে ভগবানও সুখী হন।

ভীড় এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে শিবানী দেবীর দারুণ অসুবিধা হচ্ছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে না চড়ে চড়লেন ইণ্টার ক্লাসে। তাতেও এই অশিক্ষিত লোকগুলির এত ভীড়! শিবরাণী দেবী চাইছিলেন যে এরা তৃতীয় শ্রেণীতে চলে যাক। তিনি প্রেমচন্দকে বললেন—পরে বোঝাবেন, আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসছে।

প্রেমচন্দ বললেন—এদের জন্যে জেলে যাও, লড়াই করো, আর এদেরকেই তাড়াতে চাইছো ? এই গরীব লোকগুলোর প্রতি আমার করুণা জাগছে। বেচারারা ক্ষুধার্থ। ধর্মের পেছনে দৌড়োচ্ছে।

শিবরাণী দেবী বললেন—গাড়ীতে বসে সব শিখিয়ে ফেলবেন না!

প্রেমচন্দ—তাহ'লে বলো কখন বোঝাই এদের ?

শিবরাণী—এদেরকে নিয়েই তো আপনি পুঁথির পর পুঁথি লিখছেন।

প্রেমচন্দ—এরা তো আমার বই পড়ে না। তবে হ্যাঁ, যদি আমার উপন্যাস-গুলির ওপর ফিল্ম তৈরী করে গ্রামে গ্রামে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো তবে এরা দেখতো।

এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে প্রেমচন্দ কি রকম দরদী মানুষ ছিলেন। তাঁর মনে গরীব কৃষকদের প্রতি কত সহানুভূতি ও করুণা জমা ছিল। তিনি তাদের সমস্যা সম্পর্কে কতটা চিন্তা ভাবনা করতেন। তিনি এ কথাটা বুঝতে পেরে ছিলেন যে এই অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রাম্য ধর্মভীরু মানুষগুলিকে

জাগাতে হলে অথবা ঠিক পথে আনতে গেলে আবশ্যক এমন একটা মাধ্যম যা তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবে। এরা পড়তে জানেনা। কিন্তু যদি এদের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসকে চলচিত্রে রূপায়িত করে এদের চোখের সামনে তুলে ধরা যায় তবে নিশ্চয়ই এরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

বিরক্তিকর বোম্বাইতে—(১৯৩৪-৩৫)

কথা সাহিত্যে তখন প্রেমচন্দের দেশজোড়া নাম। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের হলিউড বোম্বাইতে তখন গল্পের অভাব। দেশী বিদেশী গল্পের জগাখিচুড়ি করে কাহিনী খাড়া করা হতো এবং তারই চলচ্চিত্র রূপায়ণের কাজ চলতো। তাই ১৯৩৪ সালে যখন বোম্বাই চলচ্চিত্র জগত থেকে তাঁর ডাক এল তখন তিনি আনন্দের সঙ্গেই তা স্বীকার করে নিলেন। বোম্বাই-এর অজন্তা মুভিটোন ফিল্ম কোম্পানির থেকে তিনি একটা আমন্ত্রণ লিপি পান যাতে তাঁকে বাৎসরিক ১০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলে বোম্বাইতে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রেমচন্দ ভাবছিলেন প্রেস ও পত্রিকা যদি চালাতে হয় তবে এ সুযোগ আমার হাতছাড়া করা উচিত নয়। টাকার অভাবে দুটিরই দৈন্য দশা চলছে। মাসিক খরচ প্রায় হাজার ছয়েক টাকা। বোম্বাই যদি এইটাকা দেয় তবে আর্থিক অনটনের সুরাহা হবে। কিন্তু বাদ সাধলেন শিবরাণী দেবী। তিনি যখন জানলেন তখন ঘোরতর আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন—আপনার এই স্বাস্থ্য, তায় এত কাজের চাপ উপরন্তু বিদেশ বিভূঁই, এ আমন্ত্রণ আপনি প্রত্যাখ্যান করুন। প্রেমচন্দ বললেন—তুমিই ভেবে দেখ, না গিয়ে তো চলছে না। এখানে যা আয় হয় তা নিজেদের খরচে শেষ হয়ে যায়। এই 'হংস' আর জাগরণ কি করে চলবে ?

শিবরাণী দেবী বললেন—তবু, এর জন্যে আমি বোম্বাই যাওয়া উচিৎ মনে করিনা।

প্রেমচন্দ বললেন—এই হাতীগুলিকে যখন গলায় বেঁধেছো তখন তাদেরকে চারা দেবে না ? এগুলোকেও জীবিত রাখতে হবে।

শিবরাণী একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—আপনি যা করেন তাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়।

প্রেমচন্দ বললেন—আরে মহাশয়া ! এসব কথা তো সহস্রবার হয়েছে।

এখন যখন এগুলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে তখন এগুলোকে চালাতেই হবে। আর একটা কথা বলি। ওখানে গেলে যে বিশেষ লাভটা হবে তা হলো এই যে উপন্যাস এবং গল্প লেখায় যে লাভ হচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী লাভ হতে পারে এগুলোর চলচ্চিত্র দেখিয়ে। যারা গল্প উপন্যাস পড়বে তারা তার থেকে লাভবান হবেন কিন্তু চলচ্চিত্রের দ্বারা সব অঞ্চলের মানুষই লাভবান হতে পারবেন।

শিবরাণী দেবী ব্যক্তিগত লাভের প্রশ্ন উঠিয়ে বললেন—কিন্তু তাতে আমার কি লাভ ?

প্রেমচন্দ বললেন—এটা তো তোমার ভুল ধারণা, লোকেদের লাভের জন্যে কি আমি লিখি? নিজের আত্মার শান্তির জন্যে আমি যা কিছু লিখি, তা যত বেশী মানুষ বুঝতে পারবে, দেখতে পারবে, পড়তে পারবে আমার সন্তুষ্টি ততই বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয় লাভটা হবে এই যে 'হংস' এবং জাগরণের জন্যে বেশী টাকা দিতে সক্ষম হবো। ওঁরা ৯০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা ছাড়া এক বছর বোম্বাইতে থাকার পর ওরা ঘরে বসে আমাকে দশ হাজার টাকা দেবেন।

উপরোক্ত কথোপকথনের বিবরণ শিবরাণী দেবী নিজেই "প্রেমচন্দ ঘরমে" গ্রন্থে দিয়েছেন। যাই হোক শেষপর্যন্ত যাওয়াই ঠিক হলো। তবে কি প্রেমচন্দকে টাকার নেশা ধরলো! না, তা নয়। পাঠক যেন এ ভ্রান্ত ধারণাটা না করে বসেন তাই জৈনেন্দ্রকে লেখা তাঁরই চিঠি থেকে কয়েকটি অংশ তুলে ধরছি যাতে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে এ-সময়টা তিনি কি নিদারুণ অর্থাভাবে কাল কাটাচ্ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৩ সালে সরস্বতী প্রেস থেকে লেখা পত্রে তিনি লিখছেন—"তুমি সেবাসদন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছো। বোম্বাইর এক কোম্পানীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা চলছিল। ওরা আমাকে ৭৫০ টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল। আমি ৭৫০ টাকাই যথেষ্ট ভেবে স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু টাকা পাইনি।

"কর্মভূমির অনুবাদের জন্যে এক গুজরাতী প্রকাশক ৪০০ টাকা দেবে কথা দিয়েছিল। দেওয়ালীর পর টাকা পাঠাবার কথা ছিল। কিন্তু সেও চুপ করে আছে। দুটো চিঠি দিয়েছি কিন্তু উত্তর পাইনি।

"আরো কয়েক স্থান থেকে টাকা পাবার আশা ছিল কিন্তু কেউ কোন খবর দিল না।"

১৯৩৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর আরেকটি পত্রে তিনি লিখেছেন—"প্রথমটা ঠিক করেছিলাম যে 'হংস' তাঁকে (নৌভর প্রেসের মালিক) দিয়ে দিই, শুধু প্রেসটা চালাই। কিন্তু সমস্ত বিপদের মূলেই তো এই প্রেসটা। কি জানি কোন কুক্ষণে এটার জন্ম। দশ সহস্র টাকা এবং একাদশ বৎসরের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। এই প্রেসের জন্যে কত বন্ধুদের বিরাগভাজন হলাম, কত লোকের বিশ্বাস হারালাম, কত মহামূল্যবান সময় যা লেখা পড়ায় কাটতো, নিরর্থক প্রুফ দেখে কাটিয়েছি। আমার জীবনের এটা সর্বাধিক বড় ভুল।"

এই পত্রেই তিনি অন্যত্র লিখছেন—"লাহোরে আমার উর্দু গ্রন্থের জন্যে ১০০০ টাকা পাওনা ছিল। বছরের পর বছর তাগাদা দিয়ে দিয়ে এখন জানতে পারলাম যে ওদের কাছে টাকা পাওয়া যাবে না।"

১৯৩৩-৩৪ সালে লেখা এই পত্রগুলির বয়ান স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে এই সময় প্রেমচন্দ চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অনটনের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। তাই তিনি চলচ্চিত্র প্রজোযকদের এই লোভনীয় আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। বোম্বাইতে তিনি দাদরে একটি বাড়ি ভাড়া করেন এবং ১লা জুলাই (১৯৩৪ সালে) সেখানে কাজে যোগদান করেন। কিন্তু দূর থেকে যা তাঁর পক্ষে অতি সহজ মনে হয়েছিল তা কর্মক্ষেত্রে এসে তাঁর অতি কঠিন মনে হতে লাগলো। এর কারণগুলি তাঁর বন্ধুবান্ধবের লেখা পত্রগুলিতে বেশ ভাল ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। জৈনেন্দ্রকে ১৯৩৪ সালের ৩রা আগষ্ট লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"সিনেমার জন্যে গল্প লেখা বড়ই কঠিন মনে হচ্ছে। এমন গল্পের প্রয়োজন যা মঞ্চস্থও করা যায় আবার অভিনেতাদের জন্যেও সহজ হয়। গল্প যতই ভাল হোক, যদি যোগ্য পাত্র না পাওয়া যায় তবে তা চিত্রে রূপায়িত হবে কি করে? আমার মনে হয় বৈচিত্রের কোন দরকার নেই। আমার দুটো গল্পই সাধারণ।"

আরো কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রেমচন্দের কাছে ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। ২৮ নভেম্বরের চিঠিতে তাঁর এই মনোভাবটা আরো ভাল ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন—"আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তার একটারও পূর্তি সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। এই প্রযোজকরা যে ধরণের গল্প তৈরী করে এসেছেন তার থেকে কিছুমাত্রও এদিক ওদিক হবেন না। ভাল্গারিটিকে এঁরা এণ্টরটেনমেণ্ট ভ্যালু বলেন। এঁদের বিশ্বাস অদ্ভূত।

রাজা-রাণী, তাদের মন্ত্রিদের ষড়যন্ত্র, নকল লড়াই, চুম্বন ও পরিরঞ্জন-ই এদের মুখ্য সাধন। আমি সামাজিক গল্প লিখেছি যেগুলো শিক্ষিত সমাজও দেখতে চাইবে, কিন্তু ঐ গল্পগুলিকে নিয়ে ফিল্ম তৈরী করতে ওদের আপত্তি—কি জানি চলবে কি না! এই বছরটা তো কাটাতেই হবে। ঋণী হয়ে গিয়েছি তো……এখান থেকে মুক্তি পেলে নিজের পুরাতন আড্ডায় গিয়ে বসবো। সেখানে টাকা নেই কিন্তু আত্মসন্তুষ্টি তো আছে। এখানে তো মনে হচ্ছে যেন জীবনটা নষ্ট করছি।" (পত্র সংখ্যা ৪২, পৃষ্ঠা ১৪১-৪২)

উপরোক্ত চিঠির বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তাঁর বোম্বাই প্রবাসকাল সুখে কাটে নি। তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা ছিল এই আশা যে তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য অধিকতর লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। তাঁর সেই আশা পূরণ হয় নি। তাঁর লেখা গল্প অবলম্বনে "মজদুর" নামে যে চলচ্চিত্রটি রিলীজ হয় সেটা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"মজদুর" এ আমি এত কম এসেছি যে তা না'র নামান্তর। ফিল্মের নির্দেশক-ই সব। লেখক লেখনীর রাজা হলেও এখানে নির্দেশকেরই রাজত্ব এবং সে রাজ্যে তাঁর (লেখক) হুকুম চলতে পারে না। নির্দেশকের আদেশ মানলেই লেখক সেখানে থাকতে পারে। লেখকের এ কথা বলার সাহস নেই যে "আমি সাধারণের রুচি জানি।" নির্দেশক জোর দিয়ে বলে, "আপনি জানেন না, আমি জানি জনতা কি চায় এবং আমরা ত এখানে জনতাকে শোধরাতে আসিনি। আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছি, ধন উপার্জনই আমাদের উদ্দেশ্য। জনতা যা চাইবে আমরা তাই দেব।" এর উত্তর এই, "আচ্ছা বাবা। আপনাকে সেলাম জানাই। আমি বাড়ি চললাম।" আমি তাই করছি। মে মাসের শেষে কাশীতে বসে এই বান্দা উপন্যাস লিখছে।" (পত্র সংখ্যা—৪৩)

এই চিঠির আরেকটু অংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না যেখানে তৎকালীন বোম্বাইর চলচিত্র জগতের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি লিখছেন—"এমন লোকের পাল্লায় পড়েছি যারা না জানে হিন্দী, না জানে উর্দু। ইংরিজিতে অনুবাদ করে এদের গল্পের মর্ম বোঝাতে হয় অথচ কাজ কিছুই হয় না।"

"মিল মজদুর ফিল্ম কেমন করে তৈরী হল" এই নামের এক প্রবন্ধে ললিত

কুমার নামক এক অভিনেতা আমাদের জানিয়েছেন সে সময় প্রেমচন্দ তাঁর 'মিল মজদুর' গল্প শেষ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। গল্প শেষ হতেই তাঁকে তার উর্দু অনুবাদ করতে হলো কেননা কোম্পানীর প্রবন্ধ সম্পাদক, নির্দেশক মিঃ ভুটানী এবং তাঁর সঙ্গী মিঃ খলীল আফতাব হিন্দী জানতেন না। পুনরায় সিনেরিয়োর সুবিধের জন্যে এবং ভুটানী সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী গল্পে কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করতে হলো। কিছু নতুন কথা যোগ করা হলো আর কিছু কথা বাদ দিতে হলো। যে রূপ প্রথমে নির্ধারিত করা হয়েছিল তার সম্পূর্ণটা বাদ দেওয়া হলো এবং গল্পটিকে নতুন রূপ দেওয়া হলো। এতে শুধু প্লটেই পরিবর্তন হলো না বরং কয়েক স্থানে বাস্তব অর্থ এবং ভাষার মাধুর্য ও ক্ষুন্ন হলো। তারপর শুটিং আরম্ভ হলো এবং পুনরায় কয়েক স্থানে পরিবর্তন করা হলো। যাই হোক, দিন-রাত পরিশ্রম করার পর তিন মাসে ফিল্ম তৈরী সম্পন্ন হলো। এই ফিল্ম থেকে কোম্পানীর অনেক আশা ছিল কেননা এতে এমন একটি সাময়িক সমস্যা অঙ্কিত হয়েছিল যার মধ্যে ধনী অর্থাৎ মিল মালিক এবং মজদুরদের মধ্যে সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছিল। প্রেমচন্দের এই উদ্দীপনামূলক ছবিতে এই সমস্যাটি অতি সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। মালিকের আত্ম-কেন্দ্রিক যথেচ্ছ ব্যবহার, অত্যাচার, দমন-পীড়ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশা, তাদের বৌ ছেলেমেয়ের দৈন্য দশা আর তার দুষ্পরিণাম ইত্যাদি সমস্ত তথ্যগুলি অতি স্পষ্ট ও দক্ষতার সঙ্গে এতে বাস্তবায়িত করা হয়েছিল।

এই ফিল্মের ওপর সেন্সর বোর্ডের কুদৃষ্টি পড়ে এবং এর অনেকটা অংশ কেটে কুটে বাদ দেওয়া হয় এবং তারপর রিলীজ অর্ডার পাশ হয়। ছবিটির এমন দুর্দশা করে দেওয়া হয় যে কতিপয় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখতে গিয়ে প্রেমচন্দের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে এবং শোনা যায় যে তিনি তা পুরোটা না দেখে হল থেকে বেরিয়ে আসেন।

বোম্বাই সরকার এই ছবিটিকে নিষিদ্ধই করে দিয়েছিলেন। তবে পাঞ্জাব সরকার অনুমতি দিয়ে ছিলেন এবং কিছুদিন তার প্রদর্শনীও চলে কিন্তু তারপর ওরাও এটাকে নিষিদ্ধ করে দেয়। তারপর এই ঘটনার প্রায় দেড় বৎসর পর ভুটানী সাহেব এতে আরো কিছু কাঁট-ছাঁট করে "গরীব মজদুর" নাম দিয়ে প্রদর্শনীর অনুমতি পত্র বার করে আনেন। এ সব কারণেও প্রেমচন্দের আশা ভঙ্গ হয়েছিল।

চলচিত্রের জন্যে তিনি আরেকটি গল্প লেখেন 'নবজীবন' নামে যার বোম্বাই

মার্কা নাম ছিল "শেরদিল ঔরত"। এই গল্পের ছবিও তাঁর ইচ্ছানুসারে তৈরী হয় নি। কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তিদের ওপর তিনি এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি মনে-মনে ঠিক করে ফেলেন—যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁকে বোম্বাই ত্যাগ করতেই হবে। এমন কি বেনারস থাকাকালীন 'সেবাসদন' উপন্যাসের যে ফিল্মরাইট মহালক্ষ্মী মুভিটোনকে মাত্র ৭৫০ টাকার বিনিময়ে বিক্রী করেছিলেন তার ও ছবি যখন ইতিমধ্যে প্রদর্শিত হলো তখন প্রেমচন্দ তো তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

বোম্বাই থাকা কালীন তাঁর অমূল্য সময় কাটতো শুধু শুয়ে বসে। তিনি নিজের কথা বলতে গিয়ে লিখছেন—"সাতটার সময় উঠি। সাড়ে আটটায় প্রাতঃ ভ্রমণ থেকে ফিরি। জলখাবার খাই। নটায় খবরের কাগজ পড়ি। কখনও এক ঘণ্টা কখনও কিছু বেশী। কখন সখনও কেউ দেখা করতে এল। তাতেই এগারোটা বেজে যায়। স্নানাহারের পর ষ্টুডিও যাই। কিছু কাজ থাকলে করি, না হলে উপন্যাস পড়ি। পাঁচটায় বাড়ি ফিরি। হিন্দীর পত্র-পত্রিকাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখি। চিঠি পত্র লিখি, খাই, আর ঘুমোই। এই আমার দিনচর্যা। মাসে এক আধটা গল্প লিখি আর "হংসর জন্যে দু-এক পৃষ্ঠা নোট—ব্যস।"

বোম্বাই চলচিত্র জগতের যে দুঃসহ অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রেমচন্দ ফিরে এলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছিলেন। "ফিল্ম ঔর সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে বলেছেন—"চলচিত্র আমাদের কুৎসিত ভাবনা গুলিকে স্পর্শ করে আমাদেরকে নেশাগ্রস্থ করে দেয়। এবং এর কোনো ঔষধ প্রযোজকদের কাছে নেই। যতক্ষণ একটি জিনিসের চাহিদা আছে ততক্ষণ তা বাজারে আসবেই তাকে কেউ রোধ করতে পারে না। সে সময় বহু দূরে যখন চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য একই সূত্রে বাঁধা থাকবে। মানুষের রুচি যখন এমন পরিষ্কৃত হয়ে যাবে যে সে নিম্নগামী সব জিনিষকে ঘৃণা করবে তখনই সিনেমা সাহিত্যে সুরুচিবোধটা দেখা যাবে।"

বোম্বাই থেকে বেনারসে ফিরেই তিনি জৈনেন্দ্রের একটি পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে লিখছেন—"বোম্বাইতে কি লাভ হল? সর্বসাকুল্যে ৬৩০০ টাকা পেলাম। তার থেকে ছেলেরা ১৫০০ টাকা নিয়েছে, ৪০০ টাকা মেয়ে নিয়েছে। দশ মাসে বোম্বাই-এ খরচ হয়েছে প্রায় ২৫০০ টাকা। সেখান থেকে শুধু ১৪০০ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। এই টাকা এখানে প্রেসের জন্যে খরচ হবে।" (পত্র সংখ্যা ৪৮, পৃষ্ঠা ১৫১)

প্রগতিশীল লেখক সংঘ গঠন

প্রেমচন্দের জীবন প্রদীপ সকলের অজ্ঞাতেই নিভে এসেছিল। কে জানতো বিধাতা এমন অকালেই এমন একটি কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটাবেন। কিন্তু পরপারের ডাক আসবার আগেই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মত প্রগতিশীল লেখকদের নিয়ে একটা সংস্থা গড়ে তুলবেন। এ ইচ্ছেটা অনেক দিন ধরেই তিনি পোষণ করে রেখেছিলেন তাঁর মনে, কিন্তু কিছুতেই সেই সুযোগটা আসছিল না। অবশেষে সেই দিনটা এল—১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ সালে। সেদিন সুপ্রসিদ্ধ উর্দু লেখক সজ্জাদ জহীর সাহেবের বাটিতে একত্র হলেন হিন্দী উর্দুর কিছু স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিকরা যার মধ্যে ছিলেন মুন্সী প্রেমচন্দ, মুন্সী দয়ানারায়ণ নিগম, মৌলানা আব্দুল হক ইত্যাদি। এই সভায় আরো অনেক উঠতি সাহিত্যিকরাও যোগ দেন যাদের ওপর ভবিষ্যতের ভার বহন করবার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এই সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে প্রথম **Progressive Writers' Association** নামে একটি সাহিত্যিক সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যে কতিপয় সাহিত্যিক সংশয়ের দোলায় দুলছিলেন তাঁদেরকে প্রেমচন্দ দৃপ্ত কণ্ঠে এবং সাবলীল ভঙ্গীতে জানালেন যে দেশ আজ প্রগতিশীল লেখকদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। তাঁর আশ্বাসে সংশয়ের ঘোর কেটে গিয়ে তাঁদের মনেও এল নতুন জোয়ার। গঠিত হলো "প্রগতিশীল লেখক সংঘ" এবং এক বছরের মধ্যেই এই সংস্থা এবং এর সদস্যরা যে কাজ সম্পন্ন করলো তা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। প্রেমচন্দ কয়েকমাসের মধ্যেই চলে গেলেন কিন্তু যে পথের নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাই ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে রইলো।

এই সংস্থা গঠিত হওয়ার দু-তিন বছর পূর্বেই প্রেমচন্দের চিন্তালোকে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। দরিদ্র নিপীড়িতদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও করুণা যেন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছিল। 'কফন' এর মত গল্পের সৃষ্টি এই পরিবর্তনেরই ফল। তিনি যদি আর কিছু কাল বেঁচে থাকতেন তবে এ ধরণের আরো গল্প আমরা নিশ্চয়ই পেয়ে ধন্য হতাম।

শেষের সেই দিন

হিন্দীর, শুধু হিন্দীরই বা বলি কেন, ভারতের এই মহান সাহিত্যিকের অন্তিম কাল তখন ঘনিয়ে আসছিল। কত স্বপ্ন ছিল চোখে, কত আশা ছিল

মনে, সব অপূর্ণ রেখে, অতৃপ্ত আত্মা নিয়েই কি তাঁকে এ জগৎ থেকে চির বিদায় নিতে হবে? সেই বিদায় বেলার সন্ধিক্ষণ যখন মাস খানেকের ব্যবধানে তখনই যেন তিনি ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়ে পড়ছিলেন। চলৎশক্তি রহিত হয়ে সেই যে শয্যায় আশ্রয় নিলেন আর তা থেকে উঠতে পারলেন না। দিন দিন রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শরীর রক্তশূন্য, পেটে অসহ্য ব্যথা। ক্রমশঃ যেন পেটটা ফুলে উঠছিল। হাত-পা ঝিমিয়ে পড়ছিল। প্রেমচন্দের পরম বন্ধু অগ্রজ প্রতিম "জমানার" সম্পাদক শ্রীদয়ারাম নিগম লিখেছেন—"মৃত্যুর পনেরো দিন পূর্বে টেলিগ্রাম করে আমাকে বেনারসে ডেকে পাঠালেন। সমস্ত পথ কাটলো উৎকণ্ঠায়। সকালে তাঁর সঙ্গে সেই শেষ দেখার কথা জীবনে বিস্মৃত হব না। সেই প্রেমচন্দ যিনি তাঁর লাল ফর্সা মুখের জন্য হাজারে একজন ছিলেন এমন পিঙ্গল বর্ণ এবং দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে চেনা কঠিন মনে হয়েছিল। কোটরগত চোখ, ভাঙ্গা গাল আর কঞ্চির মত সরু-সরু হাত-পা দেখে আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এলো। তাঁর সেই হাস্য বিমণ্ডিত মুখ যা কথা বলারও অবকাশ দিত না এখন অশ্রুর বন্যায় ভাসছিল। তাঁর উঠে বসার শক্তিটুকুও ছিল না। শুয়ে শুয়েই হাত দুটি ধরে বুকে জাপটে ধরলেন যেমন ভয়ার্ত শিশু কাঁদতে-কাঁদতে বুকে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে। এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে হাঁপাচ্ছিলেন।"

তখন হিন্দীর উঠতি কথা শিল্পী জৈনেন্দ্র তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর মতে তাঁর শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা ছিল তথাপি তিনি নির্বিকার ছিলেন। এমন অবস্থায়ও তিনি জৈনেন্দ্রকে বলেন যে মানুষ এমন সময় ভগবানকে স্মরণ করেন। আমাকেও স্মরণ করানো হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন হয় নি। (এক কৃতি ব্যক্তিত্ব, পৃঃ ৫৬)

মৃত্যুর পূর্ব রজনী থেকে যিনি অহর্নিশি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন সেই জৈনেন্দ্রের ভাষায় তাঁর চিরবিদায়ের দৃশ্যটির বর্ণনা হল এই—"মৃত্যুর আগের দিন রাত্রে আমি তাঁর খাটের পাশে বসেছিলাম। সকাল সাতটায় তাঁর চিরনিদ্রার সময় নিশ্চিত ছিল। সেই প্রত্যুষে তিন ঘটিকায় আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। চারিদিকে নিঝুম নীরবতা বিরাজ করছিল। ঘরটি ছোট এবং অন্ধকার ছিল। সকলে ঘুমে অচৈতন্য। তাঁর মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে কথা বেরিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। মন দিয়ে কথা গুলো শুনতে হচ্ছিল।

"তখনই তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত আমার সম্মুখে প্রসারিত করলেন। বললেন —টিপে দাও।

"হাতটি পাংশুবর্ণ তো নয় একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল, আর কিছুটা ফোলাও ছিল। আমি টিপতে থাকলাম।

"তিনি কিছু বললেন না, দুচোখ বুজে পড়ে রইলেন। রাত ১২ টায় "হংস" সম্পর্কে কথাবার্তা সম্পন্ন হয়েছিল। নিজের আশা, আকাঙ্খা, কিছুটা শব্দে এবং সিংহ ভাগটা দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'হংস' এবং সাহিত্য চিন্তাই তাঁকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল। নিজের সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি চিন্তিত ছিলেন। আমার ওপর তাঁর কিছুটা আস্থা ছিল।"

"এখন রাত তিনটের সময় তাঁর ফোলা হাতটি স্বহস্তে ধারণ করে আমি ভাবছিলাম আমার ওপর তাঁর এই বিশ্বাস কি ঠিক! ঠিক মাঝ রাতে আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার কিছুটা ধৃষ্টতাও করি। সেই ব্যাপারটা আমায় কষ্ট দিচ্ছিল। আমি কি বলি, কি করি?"

"এমন সময় প্রেমচন্দ বললেন—জৈনেন্দ্র!"

"ডেকে নীরব হয়ে আমার পানে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাঁর হস্তটি নিজের দুহস্তে ধারণ করে টিপতে লাগলাম। তাঁর পানে দেখতে-দেখতে বললাম আপনি কোনো চিন্তা করবেন না বাবা। আপনি এবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর কাজের জন্যে তো আমরা সবাই আছি।"

"আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাকিয়েই রইলেন। তারপর বললেন—আদর্শে কাজ হবে না।

"আমি বলতে চাইলাম—আদর্শ!"

"বললেন, তর্ক করো না—বলে পাশ ফিরে চক্ষু মুদলেন।

"তখন যেন আমার মনে কষ্টের এক প্রস্তর খণ্ড চেপে বসেছিল। নানা চিন্তা ও দুশ্চিন্তার বোঝা যেন প্রেমচন্দের প্রাণের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। আমি অথবা অপর কারো পক্ষে তা লাঘব করা সম্ভব ছিল না। চিন্তার প্রধান কেন্দ্র ছিল 'হংস' কি করে চলবে? না চললে কি হবে? 'হংসের' জন্যে তাঁর মনে তখনও জীবিত থাকবার বাসনা ছিল। 'হংস' বাঁচবে না, এই চিন্তা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হিন্দী জগতের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে বিশ্বাস জাগাতে পারছিল না। 'হংসর' জন্যে তখন তিনি সর্বতোভাবে মাথা নত করতে প্রস্তুত ছিলেন।

"আমার মনে হয়েছিল যে বলি-হংস মরবে না। নত না হয়েও যদি তিনি

জীবিত থাকেন তবুও। ওটা আপনার পত্রিকা, মাথা নত না করেও বেঁচে থাকবে।

"কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না এবং কোনো আশ্বাসই সাহিত্য সম্রাটকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হলো না।

কিছুক্ষণ পরে বললেন—বড্ড গরম, হাওয়া করো।

আমি পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলাম। তাঁর ঘুম আসছিল না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু একটিবারের তরেও হা-হুতাশ করেন নি। নির্ণিমেষ চোখে চেয়ে নীরবে শুয়ে রইলেন।

দশ পনেরো মিনিট পরে বলেন-জৈনেন্দ্র যাও ঘুমোও। কে জানতো অন্তিম সময় এত সন্নিকট। আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভোর হতে না হতে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সেই চেতনা আর ফিরলো না।" (পৃঃ ৫৬ – ৫৮)

তারিখটা ছিল ১৯৩৬ সালের ৮ই অক্টোবর।

ব্যক্তি প্রেমচন্দ

দরদী কথাশিল্পী প্রেমচন্দ ব্যক্তিজীবনে ছিলেন একেবারেই সাদাসিধে। না পোষাকে আশাকে না চালচলনে না কথাবার্তায়—কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর জৌলুস ছিল না। হাঁটুর কিছু নীচে মিলের ধুতি, গায়ে মার্কিনের হাতে কাচা জামা এবং পায়ে পামসু—এই ছিল তাঁর চিরপরিচিত চেহারা। বাজে খরচ হবে ভেবে তিনি বাদামী রঙের কিরমিচের জুতো পরতেন যাতে রং না লাগালেও চলে। নিজের জন্য তিনি ন্যূনতম খরচ করতেন। রাজা-রাজড়াদের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে বড়লোকের মত জাঁকজমকের সঙ্গে থাকতে পারতেন। কিন্তু প্রেমচন্দ রাজকীয় সম্মান এই বলে উপেক্ষা করেছেন যে ওখানে খোলা হাওয়া নেই, নেই ঠাণ্ডা মিষ্টি কুয়োর জল, মাথার ওপর নেই উন্মুক্ত নীল আকাশ, পথে শোনা যাবে না মিষ্টি বাঁশিতে দেহাতী সুর অথবা পাখির কলকাকলি। ইচ্ছে করলেই যিনি দু-চার লাখ টাকায় সম্পত্তি রেখে যেতে পারতেন সেই মানুষটি বিনা চিকিৎসায় তিল তিল করে কষ্ট ভোগ করে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন।

প্রেমচন্দ তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের লেখা থেকে জানা যায় যে তাঁরাও পিতার সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার

করতেন। তিনি কখনও ছেলেমেয়েদের বকাবকি করতেন না বা মারধোরও করতেন না। ছেলেমেয়েরাও বাবাকে এতই ভালবাসতো যে বাবার সঙ্গে ছাড়া রাত্রে খেতে বসতো না। সংসারে অভাব অনটন ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল প্রেমময় পিতার স্নেহ-প্রীতি, দু-কূল ছাপানো ভালবাসা।

ব্যক্তি প্রেমচন্দ সম্পর্কে খুব কমই বলা বা লেখা হয়েছে। নতুন লেখকদের কাছে প্রেমচন্দ ছিলেন প্রেরণার কল্পবৃক্ষ। তিনি যে কত নতুন লেখকদের প্রেরণা জুগিয়েছেন তা গুণে বলা যাবে না। এমন বহু ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখককে তিনি প্রেরণা দিয়েছেন যাঁরা পরবর্তী যুগে ও বর্তমানে হিন্দী সাহিত্যের উচ্চাসনে বসে আছেন। এঁদের মধ্যে আছেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ অশ্ক, অজ্ঞেয় রাধাকৃষ্ণ, জৈনেন্দ্র, গঙ্গাপ্রসাদ, ধীরেশ্বর সিংহ, ধীরেনকুমার জৈন, সুভদ্রাকুমারী চৌহান। আজকের ছায়াবাদী যুগের শ্রীমতী মহাদেবী বর্মাও তাঁর কাছে প্রশংসাপত্র পেয়ে সাহিত্য কর্মে প্রেরণা পেয়েছিলেন। (প্রেমচন্দ স্মৃতি পৃঃ ১৪২) প্রেমচন্দ এঁদের পথ-প্রদর্শন করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন। বাইরের চাকচিক্য সম্বন্ধে উদাসী এই মানুষটির যে কত বড় মাপের হৃদয় ছিল তা অল্প কথায় বলা যাবে না। বস্তুতঃ মানুষ হিসেবে প্রেমচন্দের তুলনা মেলা ভার।

প্রেমচন্দের মতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র বাস সম্ভব নয়। তাঁর এক পত্রে তিনি লিখেছেন "যে লোক ধন সম্পদের নেশায় মত্ত থাকে তার মহাপুরুষ হওয়ার কল্পনা আমি করতেই পারি না। আমি যখন কোনো মানুষকে সম্পদশালী দেখি তখনি আমার মনে হয় তার মধ্যে শিল্পবোধ এবং বুদ্ধিমত্তার একান্ত অভাব আছে। আমার মনে হয় এই ব্যক্তিটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে —যে সমাজব্যবস্থা ধনীর দ্বারা দরিদ্রের শোষণের কাঠামোর উপর দণ্ডায়মান— স্বীকার করে নিয়েছেন। তেমনি কোনো বড়লোকের নাম—যে লক্ষ্মীর বরপুত্রও—আমাকে আকর্ষণ করে না। খুব সম্ভব এর জন্য দায়ী আমার ব্যক্তিগত জীবনের অসাফল্য, হয়তো মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দেখে আমিও অন্যদের মত হতাম। আমিও হয়তো লোভ সম্বরণ করতে অসমর্থ হতাম। কিন্তু আমি খুশী যে আমার স্বভাব এবং ভাগ্য আমাকে সাহায্য করেছে এবং আমার মন দরিদ্রের সঙ্গেই আবদ্ধ। এতে আমি আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা পাই।"

(প্রেমচন্দ স্মৃতি পৃঃ ১৩৬)

একবার দিল্লীতে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। প্রেমচন্দের তখন দেশ-জোড়া নাম। তিনিও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। বড় বড় সব সাহিত্যিকদের জমায়েত। প্রেমচন্দ অতি সাধারণ পোষাকে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশে গেলেন। কে কাকে চেনে, নারকেল দড়ির খাট পড়েছে লাইন দিয়ে। তারই একটায় তিনিও স্থান করে নিলেন। সকলের সঙ্গেই স্নান সেরে আহারের সন্ধানে এগোলেন। স্বেচ্ছাসেবক তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "টিকিট?"

প্রেমচন্দ জিজ্ঞেস করলেন—টিকিট? কোথায় পাওয়া যাবে?

স্বেচ্ছাসেবকের নির্দ্দেশিত স্থান থেকে টিকিট কিনে তিনি আহারের জন্য অপেক্ষমান লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ জৈনেন্দ্রের দৃষ্টি পড়ল কিউতে অপেক্ষমান শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রেমচন্দের প্রতি। তিনি বললেন—'আপনি এখানে লাইনে দাঁড়িয়ে?'

প্রেমচন্দ বললেন—কেন সবাইতো দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রেমচন্দ নিজেকে সকলের একজন বলেই মনে করতেন। অহঙ্কার কখনো স্পর্শ করতে পারে নি। সাহিত্যিকদের রাজনীতি বা দলাদলিরও তিনি ছিলেন উর্দ্ধে। তিনি বড় লেখক হতে পারেন কিন্তু মানুষ হিসেবে একেবারে জনতারই একজন ছিলেন। এই-ই তাঁর বিশ্বাস ছিল। উপন্যাস সম্রাট হয়েও তার মধ্যে কেউ কখনও খুঁজে পায় নি সাম্রাজ্যের গন্ধ। তিনি নিজেকে "কলমকা মজদুর" মনে করতেন। মজদুরের পুঁজি হল শ্রম। তাই 'কলমের মজদুর' প্রেমচন্দ আজীবন বাঁচার সংগ্রাম করে গেছেন। আজ তাঁর বংশধরদের টাকার অভাব নেই। পিতার গল্প উপন্যাস তাঁদের অর্থাভাবই কেবল দূর করে নি। দু-হাত ভরে দিয়েছে ও দিচ্ছে এবং সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতেও আরো বেশী করেই দেবে। অথচ এই দুর্ভাগা দেশে অহর্নিশি পরিশ্রম করেও লেখক প্রেমচন্দ ভাল করে খেয়ে পরে থাকবার মত সংস্থান করতে পারেন নি। অভাব অনটনই ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। আবার এও সত্য যে অর্থাভাবই তাঁকে সাহিত্য কর্মে প্রেরণা জোগাতো যাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন "ধনের শত্রুতা"। তাঁর বিশ্বাস ছিল—ধনসম্পদ মানুষকে স্বার্থান্ধ করে দেয়। দয়া, মায়া, মমতা, সহানুভূতির স্থান নেই সম্পদশালীর হৃদয়ে ধনাভাবের মধ্যেই তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন মানবতার এবং প্রাচুর্যের মধ্যে অমানবিকতার। তাঁর এই চিন্তাধারাই সম্ভবতঃ তাঁকে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

প্রেমচন্দ্র বাস্তব অর্থেই কর্মযোগী ছিলেন। ভাগ্যের ওপরও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রেমচন্দ্র তাঁর অনুজ প্রতিভ ঔপন্যাসিক জৈনেন্দ্রকে বলেন "আমি ভগবান পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম নই। আমি ততটা বিশ্বাস করতে পারি না। যখন দেখি শিশুরা কাঁদছে, রুগী ছট্‌ফট্‌ করছে তখন কি করে বিশ্বাস করি বল? এখানে ক্ষুধা আছে, কষ্ট আছে, তাপ আছে। এ তাপ এই দুনিয়ায় কম নয়। এমন অবস্থায় যদি এই দুনিয়ায় ভগবানের রাজ্য না দেখতে পাই তবে কি তা আমার অপরাধ? অবস্থাটা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখনি যখন ঈশ্বরকে স্বীকার করে তাঁকে আবার করুণাময় বলে ধরে নিতে হয়। আমার তাঁকে করুণাময় বলে মনে হয় না। এমন অবস্থায় সেই দয়ার সাগরের ওপর আস্থা কি করে স্থাপন করি?" (প্রে:—এক কৃতি ব্যক্তিত্ব পৃ: ২৩)

জৈনেন্দ্রকে অপর একটি পত্রে তিনি লিখেছেন—"তুমি আস্তিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছো। অগ্রসর বা বলি কেন, পুরোপুরি ভক্ত হয়ে উঠেছো। আমি সন্দেহের বশে পাকাপাকি নাস্তিক হয়ে যাচ্ছি।" (ঐ, পৃ: ৩৬)

প্রেমচন্দ্রের অকালমৃত্যু হিন্দী গল্প ও উপন্যাসের জগতকে যে কি চরম আঘাত হানলো তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। তাঁর মৃত্যু ছিল বজ্রপাতের সমতুল্য। তাঁর অভাব পূর্ণ হবার নয় কিন্তু হিন্দী কথা সাহিত্যকে তিনি যে ভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন এবং তাতে নবজীবন প্রবাহ সঞ্চার করেছেন তা পরবর্তী কথা-শিল্পীদের পথনির্দেশ করেছে। হয়তো বা তাঁর আত্মাও এই দেখে শান্তিলাভ করেছে। নিগম সাহেবের ভাষাতেই বলি—

রায় রহ নবর্দে আলমেবালা চিগুনই
মা বে তু খস্তায়েম তু বে মা চিগুনই

অর্থাৎ—

হে অপর লোকের যাত্রী, তুমি কেমন আছ?
তোমা বিনা আমরা ভগ্ন, আমা বিনা তুমি কেমন?

———

সাহিত্য

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

প্রেমচন্দের পূর্বে হিন্দী কথা-সাহিত্য

হিন্দী কথা সাহিত্যের বয়স প্রায় এক শতাব্দি। আজ থেকে প্রায় ১০৩ বৎসর পূর্বে লালা শ্রীনিবাস দাস লিখিত উপন্যাস "পরীক্ষা গুরু" কে হিন্দীর প্রথম উপন্যাস বলা হয়। কিন্তু রচনা কালের দৃষ্টিতে পণ্ডিত শ্রদ্ধারাম ফিল্লোরী রচিত "ভাগ্যবতী" হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম মৌলিক সৃষ্টি বলে স্বীকৃত। এটির রচনাকাল ছিল ১৮৭৭ খ্রীঃ যদিও দশ বৎসর পর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কালের নিরিখে প্রেমচন্দের আবির্ভাবের ২৫-৩০ বৎসর পূর্বেই হিন্দীতে উপন্যাস লেখা আরম্ভ হয় কালের এই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে হিন্দীতে বহু ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা বহু উপন্যাস রচনা করে গেছেন। মৌলিক উপন্যাস সৃষ্টির এই বন্যার পূর্বে ১৮০০ সালে যখন হিন্দী গদ্যের রূপ স্থির হতে আরম্ভ হয় তখনই সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী থেকে অনূদিত গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে আছে রাণী কেতকী কী কাহানী, সিংহাসন বত্তিসী, বৈতাল পচ্চীসী মাধবানল কামকন্দলা, শকুন্তলা, প্রেমসাগর, নাসিকেতোপাখ্যান, কিস্‌সা তোতা ময়না, কিস্‌সা সাড়ে তিন য়ার, বাগো বাহার, চহার দরবেশ ও কিস্‌সা হাতেমতাই ইত্যাদি। কিছুকাল এইসব গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমেই হিন্দী পাঠকেরা মনোরঞ্জন করতেন। হিন্দী গদ্যের তখনও শৈশব কাল যখন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র বিরাট বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন তখন তিনি গদ্যের রূপ স্থির করার জন্যে অসাধারণ পরিশ্রম করেন। তাঁর দৃষ্টি মূলত ছিল হিন্দী প্রবন্ধ ও নাটকের দিকে নিবদ্ধ। তাঁর দৃষ্টি যখন কথা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হল তখন তিনি বাংলা ও মারাঠি উপন্যাসগুলির অনুবাদের ওপর জোর দিতে থাকেন। তাঁরই অনুরোধে ও উৎসাহে কাদম্বরী ও দুর্গেশনন্দিনীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে রাধারাণী, বঙ্গবিজেতা, স্বর্ণলতা, বিরজা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাজ সিংহ, সাবিত্রী, ইন্দিরা ও মৃণ্ময়ী ইত্যাদি বহু উপন্যাস অনূদিত হয়। অপরদিকে ইংরেজী থেকে অনুবাদের ভার নেন রামকৃষ্ণ বর্মা এবং কার্তিক প্রসাদ খত্রী মহাশয়। মৌলিক উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশিত হয় নূতন চরিত্র (১৮৮৩ খ্রীঃ), নূতন ব্রহ্মচারী (১৮৮৬ খ্রীঃ), সও অজান এক সুজান (১৮৯০ খ্রীঃ), নিঃসহায় হিন্দু (১৮৯৩ খ্রীঃ), বিধবা বিপত্তি

(১৮৮৮ খ্রীঃ), জয়া (১৮৯৬ খ্রীঃ), কামিনী স্বপ্ন ইত্যাদি। উনিশ শতকের শেষ এক দশকের মধ্যে মৌলিক উপন্যাস লেখার কাজ সম্পন্ন করেন শ্রীদেবকীনন্দন খত্রী, গোপালরাম গহমরী ও কিশোরীলাল গোস্বামী। শ্রীঅযোধ্যা সিং উপাধ্যায় ও (যিনি হিন্দী কাব্য সাহিত্যে "হরিঔধ" নামে খ্যাত) দুটি উপন্যাস লেখেন "ঠেঠ হিন্দী কা ঠাট" ও "অধখিলা ফুল" নামে। দেবকীনন্দন খত্রী সাহেব "চন্দ্রকান্তা এবং "চন্দ্রকান্তা সন্ততি" নামে দুটি উপন্যাস লেখেন যা তৎকালীন পাঠক সমাজকে প্রায় মাতিয়ে তোলে, এবং কথিত আছে যে বহু অন্য ভাষা-ভাষী (বিশেষ করে বাঙ্গালী, গুজরাটি এবং মারাঠি) রসিক জনেরা এই বই পড়বার জন্যেই হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। "চন্দ্রকান্তা সন্ততি" ৬ খণ্ডে ও ২৪ ভাগে বিভক্ত। এই দুটি বইয়ের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক দুটির ঘটনা প্রবাহ অত্যন্ত চমকপ্রদ, এতে আছে রোমাঞ্চকর, লোমহর্ষক বিচিত্র অবাস্তব ও অসম্ভব ঘটনাবলীর অদ্ভুত সমন্বয়। এর সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। কিশোরীলাল গোস্বামী লেখেন প্রায় তিরিশটি উপন্যাস, তবে তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ সাহিত্যই রোমান্টিক এবং কয়েকটি উপন্যাস ইতিহাস ভিত্তিক। শ্রীগোপাল রাম গহমরী হিন্দীতে রোমাঞ্চ উপন্যাসের জনক। তিনি অসংখ্য উপন্যাস লেখেন। রহস্য রোমাঞ্চ ছাড়াও তিনি কিছু সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস ও লেখেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে "চতুর চঞ্চলা" নামে। পরের উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে "ভানুমতী", "নয়ে বাবু", "নেসা" প্রভৃতি। এগুলো বাস্তবে বাংলা উপন্যাসের ভাবানুবাদ ছাড়া কিছুই নয়। অমৃতলাল চক্রবর্তীর নামও প্রাথমিক উপন্যাস লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর লেখা "সতী সুখদেবী" প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে। উর্দু থেকে অনুবাদ করেন বাবু রামকৃষ্ণ বর্মা। তিনি অনুবাদ করেন "ঠগ বৃত্তান্ত মালা" (১৮৮৯ খ্রীঃ), "পুলিশ বৃত্তান্ত মালা" ১৮৯০ খ্রীঃ), "অমলা বৃত্তান্ত মালা" (১৮৯৪), "সংসার দর্পণ" (১৮৯৫) এবং "চিত্তোর চাতকী" (১৮৯৫)। এ সময় মারাঠি ভাষা থেকে অনুবাদ হয় দুটি গ্রন্থ—'চন্দ্রপ্রভা ও পূর্ব প্রকাশ' এবং 'রমা আওর মাধব'। গুজরাতী থেকে অনুবাদ করা হয় "কপটি মিত্র" নামক উপন্যাসটি। অনুবাদক শ্রীলজ্জারাম শর্মা। ১৯০০ খ্রীঃ শ্রীপুরুষোত্তম দাস টণ্ডন শেক্সপীয়রের "পেরিক্লীজ"-এর অনুবাদ করেন "ভাগ্য কা ফের" নাম দিয়ে। গদাধর সিং বাংলার 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে হিন্দীতে অনুবাদ করেন। এভাবে উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দির প্রথম দশকের

মধ্যে বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হারানচন্দ্র রক্ষিত, চণ্ডিচরণ সেন, চারুচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পগুলির অনুবাদ হিন্দীতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা সামগ্রীও বাদ যায় নি। "চোখের বালির" অনুবাদ এই সময় কালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলার এই সকল গল্প হিন্দী উপন্যাসের মানকে শীঘ্রই সমুন্নত করতে প্রভূত সাহায্য করে এবং তাকে বাস্তববাদী জীবনমুখী রচনার পথ দেখায়।

হিন্দী উপন্যাসের এই শৈশবে রহস্য-রোমাঞ্চ এবং অদ্ভুত অকল্পনীয় ভোগ-বিলাস ও চাতুর্যের লীলা খেলার চমকপ্রদ ঘটনাবহুল উপন্যাসের যে পাঠক তৈরী হয়েছিল তাদের রুচিকে উন্নত করতেও এই অনুবাদ সাহিত্য প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে যেসব মৌলিক সামাজিক উপন্যাস সেই শৈশবে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোতে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার সমস্ত সমস্যাগুলির প্রতি লেখকরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট থাকেন। এমন কি প্রথম উপন্যাস 'পরীক্ষাগুরু'তেও নৈতিকতার প্রতি একটি নির্দিষ্ট আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। এতে পারিবারিক মূল্যবোধগুলি সঙ্কীর্তিত করে তোলার উদ্দেশ্য বাঞ্ছিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের নীতি বাক্যগুলির বহুল ব্যবহার করে লেখকেরা জীবনের মূল্যবোধ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করেছেন। অধিকাংশ সামাজিক উপন্যাসে বিদেশী ও বিদেশী সভ্যতার প্রতি ঘৃণা উদ্রেক করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরই সমান্তরালে ভারত ও ভারতমাতা, এবং প্রাচীন সভ্যতার গরিমার প্রতি পাঠকবর্গের মধ্যে রুচি ও শ্রদ্ধা জাগ্রত করারও প্রভূত নিদর্শন এই সকল সামাজিক উপন্যাসে পাই। দেশ প্রেমের মূল সুর যেন প্রচ্ছন্নভাবে সর্বত্র বিদ্যমান। এছাড়া তৎকালীন বহু উপন্যাসে রোমান্টিক ভাবধারারও সম্যক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়: প্রেম, বিরহ, মিলন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কৃত্রিম জটিলতা ও অভাবনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রবৃত্তির সাথে-সাথে প্রেমের গম্ভীর ও গভীর ব্যঞ্জনাও মূর্ত করা হয়েছে। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে সেকালে এমন কোনো প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক ছিলেন না যিনি যুগের বিকৃত রুচিকে পরিবর্তিত করার সামর্থ্য রাখতেন অথবা ঘটনাবহুল কথা সাহিত্যকে মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তববাদী ভিতের উপরে উপস্থাপিত করার দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে উঠতেন। বিচ্ছিন্ন, বিপর্যস্ত ঘটনা সমূহের পঠন-পাঠনের আনন্দ যেন লেখকরাও উপভোগ করতেন। তাই তাঁরা পাঠকদের সম্বোধন করে বলতেন—"প্রিয় পাঠকেরা চলুন একবার

ওদিকটাও দেখে আসি।" (কিশোরীলাল গোস্বামীর "রজিয়া বেগম") পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভও লেখকরা জয় করতে পারতেন না। ঘটনার মাধ্যমে চরিত্র চিত্রণের পদ্ধতি ছিল তাঁদের অজ্ঞাত। পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ঔপন্যাসিকরা নিজেরাই বর্ণনা করতেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে হিন্দী কথা সাহিত্যের যে ট্রাডিশনের বাহক হয়ে প্রেমচন্দ সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেছিলেন তার সম্পর্কে তিনি নিজেই তাঁর এক প্রবন্ধে বলে গেছেন—"আমরা যে যুগকে অতিক্রম করে এসেছি তার সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না।...গল্প গল্পই, জীবন জীবন। এই দুই বস্তুকে সর্বদা পরস্পর বিরোধী বলে মনে করা হতো।" প্রকৃতপক্ষে প্রেমচন্দের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দী কথা সাহিত্য ছিল রূপকথা ভিত্তিক কল্পনা বিলাস মাত্র। গল্পের উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের মনোরঞ্জন করা এবং তার জন্য যথেচ্ছ ভাবে চমকপ্রদ ঘটনা সংযোজন করা। যখন হিন্দী কথাসাহিত্যে এই ধারা চলছে তখন মঞ্চে আবির্ভূত হলেন প্রেমচন্দ। তৎকালীন কথাসাহিত্যের জীবন বহির্ভূত এই হিন্দী সাহিত্যের আকাশে যেন এক নতুন সূর্যের উদয় হলো। কল্পলোকের উত্তরাধিকারী হয়েও প্রেমচন্দ তাঁর গল্প উপন্যাসকে করলেন বাস্তব ভিত্তিক। তাঁর সাহিত্য সাধনা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সমস্ত দুর্বলতার মূল ধরে যেন প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিল। সমাজ বহির্ভূত, অবাস্তব ঘটনাচক্রের জালে জড়ানো কথাসাহিত্যের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। জন্ম নিল মৌলিক হিন্দী কথাসাহিত্য। অঢেল অফুরন্ত ছোট ছোট কাহিনী এবং অসাধারণ, অনবদ্য উপন্যাসে ভরে উঠলো হিন্দী সাহিত্যের আঙ্গিনা। প্রেমচন্দের সাহিত্য হিন্দী পাঠক সমাজের হৃদয়ে ঝংকার তুললো। তাদের জীবনে এনে দিল এক নতুন স্বাদ। পাঠক সমাজ এই প্রথম নিজের আত্মাকে তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে দেখতে পেল। যেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে তারা নিজেকে খুঁজে পেল; খুঁজে পেল নিজের চার-পাশের সেই সমাজকে যা নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি যেন চারপাশে অহরহ ঘোরাফেরা করছে। তাই প্রেমচন্দকে সকলের অতি কাছের মানুষ বলে মনে হলো। কল্পলোকের মায়াকুমারী নয় বা পৌরাণিক উপকথার নায়ক নায়িকাও নয়—সমাজের নীচু তলার যে মানুষগুলি ঘর্মাক্ত কলেবরে দিনের পর দিন সংগ্রাম করে চলেছে তিনি গল্প লিখলেন তাদেরই জীবন নিয়ে। তাঁর গল্প জীবনের গল্প—এই সমাজের অবক্ষয়; ধ্বংস ও শোষণেরই কাহিনী। অবাস্তবতা ও কল্পলোকের বিলাসিতা থেকে প্রেমচন্দ হিন্দী কথাসাহিত্যকে মুক্তি দিলেন। তাই তাঁকে আধুনিক হিন্দী কথাসাহিত্যের জনক বলা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেমচন্দের সাহিত্য-সম্ভার

(ক) উপন্যাস

পূর্বেই বলেছি প্রেমচন্দ সাহিত্যজীবন আরম্ভ করেছিলেন উর্দু ভাষার মাধ্যমে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সেবাসদন নামে প্রেমচন্দের যে প্রথম হিন্দী উপন্যাস প্রকাশিত হয় তা আসলে তাঁর ১৯১৪ সালে উর্দুতে প্রকাশিত "বাজারে হুস্ন"-এর অনুবাদ মাত্র। এর পূর্বে তাঁর বহু গল্প উপন্যাস উর্দুতে প্রকাশিত হয়েছিল যার মধ্যে "রুঠিরাণী" "ইসরারে মুহব্বত (১৮৯৮) 'প্রতাপচন্দ্র' ও 'শ্যামা' (১৯০১) বরদান (১৯০২) প্রেমা, কৃষ্ণা (১৯০২), হম খুর্মা ও হম সবাব (১৯০৬) এবং প্রতিজ্ঞার হদিশ পাওয়া যায়। রুঠিরাণী রাজপুত জাতির ইতিহাসকে ভিত্তি করে লিখিত উর্দু উপন্যাস। এই উপন্যাসে রাজপুত সামন্ততন্ত্রের অপদার্থতা এবং তৎকালীন সমাজে নারীজাতির চরম দুর্দশার মর্মস্পর্শী ছবি তিনি এঁকেছেন। কথিত আছে যে ভোমরিয়াগঞ্জের তহশীলদার শ্রীমন্নন দ্বিবেদীর অনুপ্রেরণায় প্রেমচন্দ নিজের উর্দু গল্পগুলি হিন্দীতে রূপান্তরিত করে প্রকাশিত করেন। এই গল্পগুলি সহজেই সুধী সমাজে সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়। এর পরে দ্বিবেদী যুগের প্রবর্তক স্বয়ং মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীর অনুপ্রেরণায় তিনি হিন্দীতে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেন "সেবাসদন" নামে। অতঃপর তিনি স্থায়ীভাবে হিন্দীতে লিখতে লাগলেন। গল্পের পর গল্প, উপন্যাসের পর উপন্যাস তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হতে থাকে ভাগিরথীর ধারার মত। তাঁর সাহিত্য হিন্দী কথা সাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান দিল। সেই পথের নিশানা অনুসন্ধান করতে এবার তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক।

(১) **বরদান**—(আনুমানিক ১৯০২ সালে লিখিত) :—

বরদানের প্রকাশকাল যদিও সেবাসদনের পরে কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরদান প্রেমচন্দের উর্দুতে লেখা একটি বৃহৎ উপন্যাসের অতি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। মূল উপন্যাসটির উপজীব্য বিষয় ছিল হাস্যরস। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা উর্দুতে প্রকাশিত হতে পারে নি এবং এর পাণ্ডুলিপিটিও আজ আর পাওয়া যায় না।

'সেবাসদনে'র কয়েক বছর পূর্বে লেখা বলে এতে কাঁচা হাতের গন্ধ পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায় এর রচনাকাল ছিল ১৯০২ সাল।

এই উপন্যাসটি যখন লেখা হয় তখন বিশ্বব্যাপী চলছিল এক নিদারুণ অর্থ-সংকট। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এশিয়ার বুকে বেশ শক্ত করে শেকড় গেড়ে বসেছে। আবার অন্যদিকে পদানত দেশগুলি অত্যাচার ও অনাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সব দেশের বুকেই স্বাধীনতার কামনা ছাই চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ভারতময় এক অপূর্ব স্বাধীনতার স্পৃহা জনমনে বিস্তৃতি লাভ করছিল। পাঠকদের ভুললে চলবে না যে এই উপন্যাসের উর্দু নামকরণ হয়েছিল 'জলবা-ই-ইসার'।

মূল গল্পটি বলতে গিয়ে প্রেমচন্দ নানা প্রকারের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। বারাণসীর পুণ্যভূমির যে তিনটি সাধারণ পরিবারকে কেন্দ্র করে গল্পটি রূপ পরিগ্রহ করেছে তার একটির সদস্য হলো সুবামা এবং মুন্শী শালিগ্রাম, দ্বিতীয় পরিবারটিতে আছে সঞ্জীবন ও সুশীলা এবং শেষ পরিবারের সদস্য হলো ডেপুটি সাহেব শ্যামাচরণ এবং প্রেমবতী। এই তিনটি পরিবারেই একটি করে সন্তান। সুবামা ও শালিগ্রামের পুত্রের নাম হলো প্রতাপ, সঞ্জীব ও সুশীলার কন্যা হলো বৃজরাণী এবং শ্যামাচরণ ও প্রেমবতীর পুত্রের নাম হলো কমলাচরণ। পুত্র প্রতাপ দৈবযোগে পিতৃহারা হলো যখন তার বাবা শালিগ্রাম প্রয়াগে কুম্ভমেলায় স্নান করতে গিয়ে আর ফিরে এল না। দারিদ্র্য নেমে এল সংসারে। পুত্র প্রতাপ দেশের ও দশের কাজে থাকে ব্যস্ত। শেষে সুবামাই ঘরের আসবাব পত্র বিক্রী করে বাড়ীর একটা অংশে ভাড়াটে বসিয়ে কিছু আয়ের পথ করে নেয়। ভাড়াটে রূপেই আসে আমাদের দ্বিতীয় পরিবারের সদস্যরা অর্থাৎ সঞ্জীবন, স্ত্রী সুশীলা এবং কন্যা। যুবক প্রতাপ ও যুবতী বৃজরাণীর মধ্যে এখানেই প্রথম পরিচয় হয় যা স্বাভাবিক ভাবেই ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। কিন্তু বিধাতা বিরূপ। নারী-পুরুষের এই স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠা ভালবাসাকে যেন তিনি সহ্য করতে পারেন না। বৃজরাণীর বিয়ে হয় বিত্তশালী ডেপুটি শ্যামাচরণের অপদার্থ ও অশিক্ষিত পুত্র কমলাচরণের সঙ্গে। বেচারা প্রতাপ প্রেমের এই অসাফল্যের জন্যে ভাগ্যকে দোষারোপ করে। মনে মনে বৃজরাণীর প্রতি তার স্নেহের ভাবও অঙ্কুরিত হয়। অপদার্থ শ্যামাচরণের কুকর্মের গালগল্পে প্রেয়সীর

কান-ভরে সে যেন মনকে সান্ত্বনা দেয়। এদিকে জামাতার দুশ্চরিত্রতা ও দুষ্কর্মের জন্য বেচারা সঞ্জীবন লালের হৃদয়-দুঃখে বেদনায় ভরে ওঠে। একমাত্র কন্যার জীবনটা হয়ে উঠলো বিষাক্ত। আর আমাদের সমাজে এরকম অসম বিবাহের স্বাভাবিক যে পরিণতি হয় তাই হলো। কন্যার দুঃখে মা সুশীলা জীবন দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

এদিকে প্রতাপ ও কমলাচরণ উচ্চ শিক্ষার জন্যে এলাহাবাদে যায় ও একই বোর্ডিং-এ আশ্রয় নেয়। কমলাচরণ এখানে এসেও স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না। সে বোর্ডিং-এর নিকট অবস্থিত একটি বাগানের মালীর কন্যা সরযূর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়, এবং একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে মুখ রক্ষা করতে ট্রেন থেকে লাফিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। নব বিবাহিত বিরজন বিবাহের আনন্দানুভূতি উপলব্ধি করার পূর্ব্বেই ভাগ্যের পরিহাসে বিধবা হলো। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে শোকাহত পিতা ও মাতাও প্রাণ ত্যাগ করে বিধবা পুত্রবধূকে অকুলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

এদিকে প্রতাপ কিন্তু নিজের প্রথম প্রেমের স্মৃতি ভুলতে সক্ষম হয় না। কমলাচরণের মৃত্যুতে সে যেন সুযোগ পেয়ে যায় সেই পুরাতন প্রেমকে ঝালিয়ে নেওয়ার। সকলের অজ্ঞাতে সে বারাণসী যায়। সেখানে বৈধব্যপীড়িত দুঃখিনী বিরজনের সতী-সাধ্বী পবিত্র চেহারা দেখে প্রতাপ নিজের মনের পাপ মনেই রেখে ফিরতে বাধ্য হয়। অনুতপ্ত প্রতাপের মনে জাগে গভীর অনুশোচনা, মনে মনে প্রায়শ্চিত্তের পথ খোঁজে। বালাজী নামে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে সে দেশ সেবার কার্যে আত্মনিয়োগ করে।

বিধবা বিরজন নিজেকে সোঁপে দেয় কাব্যরসের জগতে। দিন দিন তার কাব্য-প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। বিরজন কথায় কথায় তার এক বান্ধবী মাধবীর নিকট প্রায়ই বালাজী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করতো। মাধবীর মনে অপরিচিত সেই সন্ন্যাসীর প্রতি বিন্দু বিন্দু করে প্রেম সঞ্চারিত হতে থাকে। অদেখা সৌন্দর্যকে দেখবার জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বালাজী দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে দীর্ঘ ১২ বৎসর পর ফিরে আসে তাদের সেই পল্লীতে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। বিরজন অতি চাতুর্যের সঙ্গে মাধবী ও বালাজীর মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। দুজনের মনেই যেন সাড়া জাগে। অজানা আকর্ষণের টানে দুজনে সাত পাকের বাঁধনে বাঁধা পড়ে। মাধবী স্বামীর মহৎ পথের অনুগামিনী হয়ে নিজেও যোগিনীর বেশ ধারণ করে।

শিল্পগত উৎকর্ষতার বিচারে 'বরদান'কে একটি অপটু হস্তের রচনাই বলা যায়। গল্পটির বিন্যাসে বহুক্ষেত্রেই অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। আদর্শ-বাদিতাকে উঁচুতে স্থান দেওয়ার জন্য বহু অস্বাভাবিক ও চমকপ্রদ ঘটনাবলীর সংযোজন ঘটানো হয়েছে। নায়িকা বিরজনের অন্যত্র বিবাহ হলেও সে বিরহে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং প্রতাপের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রোগমুক্ত হয়। এদিকে স্বামী কমলাচরণের প্রতিও তার আছে অটুট ভালবাসা। আসলে ভারতীয় নারীর আদর্শ থেকে লেখক নায়িকাকে বিচ্যুত করতে চান নি। আবার প্রতাপকে এক আদর্শবাদী যুবকরূপে দেখানোর মোহও ত্যাগ করতে সক্ষম হন নি। ফলে কাহিনীটি হয়ে পড়েছে দুর্বল ও অস্বাভাবিক। তবে প্রেমচন্দ তাঁর ২০-২১ বৎসর বয়সে লেখা এই কাহিনীটিতেও কৃষক সমাজের জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো যে ছবি অঙ্কন করেছেন তা অসাধারণ ও অবশ্যই বাস্তবসম্মত।

(২) **প্রতিজ্ঞা**—(রচনাকাল ১৯০৫-১৯০৬ খ্রীঃ)

প্রতিজ্ঞা পূর্ণা নামের একটি বালবিধবার জীবন কাহিনী, যার স্বামী বসন্ত-কুমারের গঙ্গায় ডুবে মৃত্যুর পর অন্য কোনও আশ্রয় জোটে না। ফলে সে এসে ওঠে বান্ধবী প্রেমার বাবা লালা বদরীপ্রসাদের গৃহে। কিন্তু বদরীপ্রসাদের দুরাচারী পুত্র কমলাপ্রসাদের কুদৃষ্টি পড়ে পূর্ণার প্রতি। কমলাপ্রসাদ চেষ্টা করে পত্নী সুমিত্রাকে উপেক্ষা করে পূর্ণাকে প্রেমজালে আবদ্ধ করতে। অশালীন ও অশোভন ব্যবহারের চেষ্টায় নিরত কমলাপ্রসাদকে আহত করে পূর্ণা ঘর ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নেয় অমৃত রায় নামে এক নারী সাহায্যকারীর আশ্রমে। অমৃত রায় এক আদর্শবাদী যুবক। এক সমাজসেবীর ভাষণে আকৃষ্ট হয়ে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে বিধবাকেই বিবাহ করবে। অমৃত রায় আশ্রমের কাজে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। কিন্তু এতটা এগিয়েও প্রেমচন্দ পূর্ণা ও অমৃত রায়কে বিবাহ বন্ধনে বাঁধবার সাহস পান নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কমলাপ্রসাদের মনে যে আঘাত লাগে তাতে সে ভবিষ্যতের জন্যে সচেতন হয় এবং চারিত্রিক দোষমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে সুমিত্রার প্রতি নিজ ব্যবহারকে সংশোধিত করে সুখে জীবন যাপন করতে থাকে।

দ্বিতীয় এই উপন্যাসেও প্রেমচন্দ নারী জাতির সমস্যাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যার মধ্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে বিধবা নারীর সমস্যা। কিন্তু

এই সমস্যার ইঙ্গিত মাত্র দিয়েই তিনি সাহস হারিয়েছেন। যদিও সেই সাহস নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে অসম-সাহসিকতা ও দরদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসে লেখকের সমাজ সংস্কারের আগ্রহ বেশ ভালভাবে ফুটে উঠেছে। সেকালের আর্য সমাজের প্রভাবও স্পষ্টই দেখা যায়।

শিল্প-সৌকর্যের দিক দিয়ে অবশ্য উপন্যাসটি অতি সাধারণ পর্যায়ের। চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্বও তার অভিব্যক্তিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন। সম্ভবতঃ এরই জন্য অমৃত রায়, দীননাথ, সুমিত্রা ইত্যাদি চরিত্রগুলি পাঠকের নিকট খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে নি। কথার বাঁধুনিতেও দুবলতা দেখা যায়। বাক্যবিন্যাস সাবলীল নয়। তবুও তাঁর প্রথম উপন্যাস "বরদান" অপেক্ষা এই উপন্যাসে প্রেমচন্দ যে আরো পরিণত হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৩) **সেবাসদন**—(১৯১৬ খ্রীঃ)

অন্যান্য উপন্যাসের মত "সেবাসদনে"ও প্রেমচন্দ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন: কেন সমাজের কোন কুসুম-কোমল কুল-ললনা সমাজ পরিত্যক্ত হয়ে পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়? কেন একজন সৎ-পুলিশ ইন্‌সপেক্টর হয়েও কৃষ্ণচন্দ্রকে জেলে পচতে হয়, তাঁর স্ত্রীকেই বা কেন দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে শেষ নিশ্বাস নিতে হয়? কেন তিনি কন্যা সুমনকে অপাত্রে দান করতে বাধ্য হন। কেন শেষ পর্যন্ত তাকে বিপথগামিনী হতে হয়? তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার জীবনই বা এত দুঃখময় হয়ে গেল কেন? কি জবাব দেবে আমাদের সমাজপতিরা? এর একটাই জবাব হতে পারে—পণ প্রথা বন্ধ করো। সমাজে পণপ্রথা না থাকলে কখনই একটি সৎ পুলিশ ইন্‌সপেক্টর কে জেলে পচতে হতো না বা তাঁর স্ত্রী ও প্রাণাধিক প্রিয় কন্যাদের এই দুরবস্থায় পড়তে হতো না। দুরবস্থার চরম পর্যায়ে সুমন যখন স্বামী দ্বারা নির্বাসিত হয়ে বেশ্যালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তখন প্রেমচন্দের প্রশ্ন—এই কি তোমার আধুনিক সভ্যতার নমুনা? এই সমাজ ব্যবস্থার জন্যেই তোমার গর্ব?

গল্পটি সংক্ষেপে এই। কৃষ্ণচন্দ্র একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টর। তিনি বড়ই সৎ ও সজ্জন প্রকৃতির মানুষ। পুলিশ বিভাগে কাজ করেও ঘুষ নেন না। তাই তিনি অপর পুলিশ কর্মচারীদের চক্ষুশূল। তাঁর দুই কন্যা সুমন ও শান্তা। সুমন বড়; বিয়ের বয়স হয়েছে। তাই তার জন্যে যোগ্য পাত্রের সন্ধান করা হচ্ছে। পাত্রের খোঁজ পান ঠিকই কিন্তু পাত্রের বাপের চাহিদা শুনে তাঁকে

ওঠেন। জীবনে কখনও এক পয়সাও ঘুষ নেন নি, কাজেই মাইনের টাকা থেকে কখনও কিছু সঞ্চয় করতে পারেন নি। আজ যেন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। আজীবন সৎপথের পথিক কৃষ্ণচন্দ্র বিবেকের দংশনে জ্বলতে থাকেন। দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত মনকে প্রস্তুত করেন ঘুষ নেওয়ার জন্যে। সুযোগের সন্ধানে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয় না। কেননা সমাজে চোর, ডাকাত, গুণ্ডা-বদমাইস আর খুন-জখমের ঘটনার অভাব নেই। তাই পুলিশের ঘুষ নেওয়ার সুযোগের অভাব নেই।

গ্রামেই আছে এক শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। সেখানকার পুরোহিত মোহান্ত রামদাস। শ্রীকৃষ্ণের নাম করে সে শোষণ করে গরীব চাষী মজুরদের। মহাজনী কারবারেও দু'হাতে পয়সা লোটে। বেচারা গোয়ালা চৌতু চাঁদার টাকা দিতে অপারগ হওয়ায় এমন মার খায় যে সে নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরে কাতরে মৃত্যু বরণ করে। এই খুনের মামলাটি গোড়ায়ই শেষ করে দেওয়ার জন্যে রামদাস কৃষ্ণচন্দ্রকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চায়। সমস্যার সমাধান এতো সহজেই হবে ভাবতে পারেন নি দারোগা সাহেব। তাই তিনি সহকর্মীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা না করে নিজেই টাকাটা হজম করতে চান। এমন কি মোহান্ত রামদাসের কাছে নিজের কমিশন চেয়ে না পেয়ে ব্যাপারটা রাষ্ট্র করে দেয়। ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র ফাঁদে পড়ে। ফলে জেলে যেতে হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী গঙ্গাজলী সংসারের স্বামীর এই পরিণামে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অনন্যোপায় হয়ে সে সরল সুশ্রী কন্যা সুমনের বিয়ে দেয় এক মধ্যবয়স্ক দোজবরের সাথে, যার না আছে যৌবন, না আছে রূপ, না পয়সা। এদিকে সুমন ছিল একটু আদুরে, তাই কিঞ্চিৎ বিলাসী প্রকৃতির। এক দিকে যৌবনের রস শুকিয়ে যাওয়া স্বামী গঙ্গাধরের অবহেলা আর অপর দিকে সুন্দরী যুবতী কন্যার অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্খা। দুই-এর ভিতর বাধে সংঘর্ষ। এই অতৃপ্ত বাসনার আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় তার বাড়ির উল্টোদিকের এক বারনারী ভোলা-বাঈ। তার গৃহে প্রায়ই বসে জলসা। সেখানে আসে শহরের সব গণ্যমান্য ধনীমানী ব্যক্তিরা। একদিন এমনি এক জলসায় নিজের স্বামীকে যেতে দেখে লজ্জায়, শঙ্কায়, ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে সুমনের মন। এক পতিতার এত সম্মান! ভোলীবাঈকে সম্মান জানাবার জন্তে ধনীমানীরা সবাই যেন সদাই ব্যগ্র। ভগবানের মন্দিরেও বাঈজীকে সম্মানিত ও অভিনন্দিত হতে দেখে তার মনে

যেন বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। তার সরল মনে প্রশ্ন জাগে—তবে সমাজে সৎজীবন ধারণের কোন মূল্য নেই? এদিকে স্বামী গজাধর সুমনের এই বাইরে যাওয়ায় ক্রমে সংশয়াকুল হয়ে ওঠে।

তার সংশয়াকুল স্বামী একদিন রাত করে বাড়ি ফেরার অপরাধে তাকে লাঠিপেটা করে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দেয়। অনন্যোপায় হয়ে সুমন ফিরে যায় বান্ধবী সুভদ্রার বাড়ি। সে আশ্রয় পায় কিন্তু গজাধর পদ্মসিং-এর বিরুদ্ধে দুর্ণাম ছড়াতে থাকে। দুর্ণামটা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে উকিল সাহেবেরও অসহ্য হয়ে ওঠে এবং তিনি সুভদ্রার বান্ধবীকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিতে আপত্তি জানান। ফলে সুমনের শেষ আশ্রয়ও হস্তচ্যুত হয়। আশ্রয়হীনা সুন্দরী যুবতী তবু আত্মসম্মান রক্ষার্থে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেলাই করে জীবিকা উপার্জনের আপ্রাণ চেষ্টা করে। ভোলীবাঈ যেন সুযোগের সন্ধানে ওঁৎ পেতে ছিল। সে তাকে লোভ দেখিয়ে নিজের পথে টেনে আনার চেষ্টা করতে থাকে। সহস্র সংস্কারে লালিত পালিত সুমন তা উপেক্ষা করে। কিন্তু সহায় সম্বলহীন নারীকে একা পেয়ে নারীমাংস লোভীর দল যেন পেয়ে বসে। অবশেষে তাকে প্রাণ বাঁচাতে সেই ভোলীবাঈর শরণাপন্ন হতে হয়। শুরু হয় তার পতিতার জীবন। আরম্ভ হয় তার সঙ্গীত চর্চা। অল্প সময়ের মধ্যেই গায়িকা হিসেবে সে সম্মান লাভ করে।

উকিল সাহেব যখন সুমনের দুর্ভাগ্যের কথা শোনেন তখন বৃশ্চিক দংশনে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয় সুমনের এই পরিণতির জন্যে যেন দায়ী তিনি স্বয়ং। আত্মগ্লানিতে ভরে ওঠে তাঁর মন। কি করে সুমনকে উদ্ধার করা যায় এই তখন তাঁর ভাবনা। তিনি বন্ধুবর বিট্‌ঠলদাসকে মনের কথা বলেন। সুমনকে কোন কাজে ঢোকাবার চেষ্টা সফল হয় না। উকিল সাহেব তখন বারনারীদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে নামেন. ওদিকে সুমন উকিল সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রকে কিছুতেই বিপথগামী হতে দেয় না। উকিল সাহেবের আন্দোলন আরো জোর বাঁধে। বিট্‌ঠলদাস অনেক চেষ্টায় সুমনকে এক বিধবাশ্রমে প্রবেশ করিয়ে দেন। সুমন অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারক বিট্‌ঠলদাসকে বলে "আমার অভিজ্ঞতা বলে যে এখন আমি যে সম্মান লাভ করছি তার শতাংশও আগে পাই নি।"

অপরদিকে সুমনের মামা উমানাথ সুমনের ছোট বোন শান্তার বিয়ে ঠিক

করে ফেলেন উকিল সাহেবের সেই দুশ্চরিত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু যখন বিয়ে বাড়িতে বরের বাবা জানতে পারেন যে ভাবী কুলবধূর দিদি পতিতা তখন তিনি বরযাত্রী ও বরকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। ওদিকে সুমনের পিতা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে সব খবরাখবর পান। লজ্জায় ও ঘৃণায় তিনি আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা থেকে মুক্তি পান। গঙ্গাধরও অনুশোচনা ও মনোবেদনার জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে গজানন্দ নাম নিয়ে সংসারত্যাগী হয়। সুমন একদিন যখন আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিয়ে গঙ্গায় আশ্রয় খুঁজতে যাচ্ছিল তখন সাধুবেশী গজানন্দ তার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

বিবাহ বাসরেই পরিত্যক্তা কন্যার বিবাহ আমাদের সমাজে অনেকটা অকল্পনীয়। তাই পূর্বসতর্কতামূলক কর্তব্য হিসেবেই পদ্মসিং এবং বিট্‌ঠলদাস শান্তাকেও বিধবাশ্রমে স্থান করে দেয়। এর ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা প্রতিবাদ করে কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় না।

'সেবাসদন'-এর মত সংস্থা স্থাপন করে পতিতা সমস্যার সমাধান করেছেন প্রেমচন্দ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি মূল সমস্যার দিক থেকে সরে এসেছেন। এই উপন্যাসটির পাতায় পাতায় নারী জীবনের অসংখ্য সমস্যাগুলির ছবি তিনি তুলে ধরেছেন। তাই প্রেমচন্দের প্রারম্ভিক উপন্যাস হয়েও "সেবাসদন" হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন। যদিও পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে গল্পটি এগিয়েছে তবু ভারতীয় সমাজের অসংখ্য ছোট বড় সমস্যাগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। নারীকে যে সমাজে কেবল এক ভোগ্যবস্তু বলে ধরে নিয়ে চার দেওয়ালের মাঝে আবদ্ধ রাখা হয় সেই সমাজে তার মূল্য কতটুকু! সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী ইত্যাদি কত না গাল ভরা নামে সম্বোধন করেও বিবাহের পূর্বে তাকে সোনা-রূপো দিয়ে ওজন করে তবেই গৃহে প্রবেশাধিকার দেওয়ার সময় সমাজ সব ভুলে যায়। আসলে মানুষকে পশুতে পরিণত করার দায়িত্ব মানুষের তৈরী এই সমাজের বিধি-ব্যবস্থারই। এই সমাজ-ব্যবস্থাই কৃষ্ণচন্দ্রকে পাপের পথে টেনে নিয়ে গেছে। পণপ্রথাই তাঁকে অসৎ পথে যেতে বাধ্য করেছে।

এই উপন্যাসের নায়িকা সুমনের চরিত্র যে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর তিনি গড়ে তুলেছেন তা প্রেমচন্দকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের পংক্তিতে দাঁড় করাবার স্পর্ধা রাখে। পদ্মসিং-এর চরিত্রটিও তিনি অপূর্বভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ধর্মকর্মের আড়ালে যারা অশিক্ষিত, দরিদ্র মানুষকে

নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে অত্যাচারের রোলার চালায় তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন প্রেমচন্দ মোহান্ত রামদাস ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের মাধ্যমে।

আরেকটি বিশেষ ব্যাপারে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। সেটা হলো এই যে, যে পতিতা-সমাজকে ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য এবং সর্বতোভাবে ত্যাজ্য বলে বর্ণনা করি তাকেই আবার বাড়ির ধর্মানুষ্ঠানে ও পালা-পার্বণে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে সাদরে আহ্বান করে সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একই আসনে স্থান করে দিই। এটা এমন একটি বিষয় যার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্টরাই আবার অগ্রগণ্য। বাংলার ধনী সম্প্রদায়ও এক সময় এই নেশায় মেতে উঠেছিল যা তাদেরকে একে একে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়ে তাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করে দেয়।

সেবাসদনের ঘটনা বিন্যাসে লেখক যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা তার কয়েকটি পরবর্তী উপন্যাসেও দেখা যায় না। বাতাবরণ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেভাবে তিনি তুলে ধরেছেন তাও অন্যত্র দুর্লভ। ধনী-মানী, শেঠ-মহাজন ও সমাজ-সংস্কারকদের চরিত্রগুলি অতি বাস্তব বলে মনে হয়। এই চরিত্রগুলি বিস্তারের মধ্যে প্রেমচন্দের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অসাধারণ ক্ষুরধার শক্তিও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

বস্তুতঃ সেবাসদন এক অসাধারণ উপন্যাস। পণপ্রথা, অসম বিবাহ ও তার সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি, নারী নির্যাতন, পতিতালয়ের বর্ণনা প্রভৃতি এখানে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। সমাজ সচেতন লেখক সমাজের বিকৃতিগুলির ছবিও তুলে ধরেছেন এবং তার সমাধানের জন্য পথ নির্দেশ করেছেন।

(৪) **প্রেমাশ্রম** (১৯২২ খ্রীঃ)—উপন্যাসটি আরম্ভ হয় জমিদারের এক পেয়াদা গিরিধরকে নিয়ে। সে জমিদারের প্রয়োজনে ঘি সংগ্রহের জন্যে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে অগ্রিম টাকা বিতরণ করতে এসেছে। যদিও বাজারদর টাকায় দশ ছটাক কিন্তু অগ্রিম টাকারও তো একটা মূল্য আছে। তায় স্বয়ং বর্তমান জমিদারের পিতা জটাশঙ্করের বাৎসরিক ক্রিয়া-কর্ম! ভীত কৃষকেরা নীরবে অগ্রিম টাকা দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আপত্তি জানিয়ে মনোহর ফ্যাসাদ বাঁধাল। সে বললে আমার না আছে গরু-মোষ না ঘি। টাকার কথা তো বাদই দিলাম কেননা নগদ টাকা দিয়ে বাজার থেকে ১০ ছটাক দরে ঘি কিনে ১৬ ছটাক দরে বিক্রী করলে ওর পরিবারের সদস্যেরা যে উপবাসে শুকিয়ে মরবে। তাই সে সাত-পাঁচ ভেবে টাকা নিতে অস্বীকার করলে পেয়াদা

তাকে সাবধান করে দেয়। বিদ্রোহী মনোহর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে "যখন জমির রাজস্ব পাই-পাই চুকিয়ে দিই তখন কারো দাপটের তোয়াক্কা করি না।" পেয়াদা চলে গেলে মনোহরের মনে কেন জানি ভয়ের সঞ্চার হলো। মনোহরের পুত্র বলরাজ ব্যাপার শুনে যেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। "আমাদের কাছে কেউ কেন ঘি চাইতে আসবে?"

এরপর আরম্ভ হলো গ্রাম্য রাজনীতির নোংরা খেলা। মনোহর ও তার পুত্রের এই উদ্ধত মনোভাব অন্য কয়েকজন কৃষকদের মনে জাগিয়ে তুললো প্রতিশোধের স্পৃহা। তারা কারিন্দা সাহেব গোলাম গৌস খাঁকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললো। মনোহরের ভুল সংশোধন করতে তার স্ত্রী গৌস খাঁর নিকট গিয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করেও তার মন গলাতে পারলো না। নতুন জমিদার জ্ঞানশঙ্কর গৌস খাঁকে এই অপমানের বিহিত করার পুরো স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন। অনুমতি পেয়ে গৌস খাঁ যেন প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। "বর্ষ শেষে সে খাজনা উসুল করলো অত্যন্ত কঠোর হস্তে। কেউ এক কানাকড়িও ছাড় পেল না। যে টাকা দিল না বা দিতে পারলো না, তার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে জমি নীলাম করলো এবং একের জায়গায় দেড়া উসুল করলো। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের শেকড় উপড়ে ফেললো। তাদেরকে উদ্বাস্তু করে অধিক খাজনায় অপর লোককে জমি দিয়ে দিল। মৌরুসী ও দখলদারদের খাজনা বৃদ্ধির উপায় ভাবতে লাগলো।" (পৃঃ ৪৯)। ফলে গ্রামময় গেল গেল রব উঠলো। সকলে নীরবে গৌস খাঁর এই অত্যাচার সহ্য করলো। প্রতিবাদের একটি স্বরও মুখরিত হলো না। কেবল মনোহর আর তার অভিন্ন বন্ধু কাদির প্রতিবাদ জানালো এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীরা সমস্ত বিপদের মূলে মনোহরকে দোষী সাব্যস্ত করলো। ফলে মনোহর ও তার পুত্র বলরাজও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। এমন সময় ডেপুটি সাহেবের পদধূলি পড়লো গ্রামে। আরম্ভ হলো চাপরাসীদের অন্যায় অত্যাচার। এবারও গর্জে উঠলো বলরাজ; চাটুকারের দলকে জানিয়ে দিল—"যাও, নিজের সাহেব বাহাদুরের জুতো ঠিক কর, যা তোমাদের কাজ। আমাদের ঔদ্ধত্যের খবরে কাজ নেই, না হলে হাত পুড়বে। গত জন্মের পাপের ফল ভোগ করছো, তবু তোমাদের চোখ খোলে না।" চাপরাসী ও জী-হুজুরের দল এবার হিংস্র পশুত্বে নেমে এলো। গ্রেপ্তার হলো বলরাজ।

আরম্ভ হলো ঘোর অত্যাচার। নিষ্ঠুর নিপীড়নের রোলারের চাপে পড়ে গ্রামের সমস্ত আকাশ-বাতাস আর্তনাদে ভরে গেল। বলরাজের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে গ্রামবাসীদের নামে বর্দ্ধিত খাজনা না দেওয়ার নালিশ করা হলো আদালতে। এমন সময় এলো ভগবানের মার। প্লেগ দেখা দিল মহামারী রূপে। কাদির মিঁয়ার জোয়ান ছেলেটা মরে গেল। মরলো আরো অনেকে। কয়েকটি পরিবার তো নির্বংশই হয়ে গেল। বংশে বাতি দেওয়ার লোক থাকলো না বহু পরিবারে। এদিকে প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস—বিপদের পর বিপদ। আর অপরদিকে আদালতের চাপ। বিপদক্লান্ত, অনাহারক্লিষ্ট, দুর্বল গ্রাম্য মানুষগুলো যেন দিশেহারা হয়ে পাগলপ্রায় হয়ে গেল। কিন্তু জমিদারের অত্যাচার তবু বন্ধ হয় না। প্লেগের দৌরাত্ম্য প্রশমিত হয়ে আসার পূর্বেই কুঁড়েঘরগুলিতে অগ্নি সংযোগ করে গৌস খাঁ হাসে। তার প্রতিশোধ স্পৃহা যেন আরো বৃদ্ধি পায়। যাদের অবস্থা তবু কিছুটা ভাল তাদের ওপর নতুন নতুন অত্যাচার চলতে লাগলো। কোনো মজুতের মিথ্যে অভিযোগে একজনের দু বছরের কারাদণ্ড হয়ে গেল। পুলিশ অফিসারের কিরিচে ঠেসার খাটিয়ে সম্মানীয় ব্যক্তিদের অপমানিত করা হলো। মনোহরের স্ত্রী বিলাসীকে যেদিন অপমান করলো সেদিন যেন বাপ-বেটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। রাত্রিবেলাতে গৌস খাঁকে হত্যা করে অপমানের প্রতিশোধ নিলো। নিজে থানায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে বক্তব্য রাখলো। কিন্তু তবু সমগ্র গ্রামবাসীদের বন্দী করা হলো। এই মামলা চলাকালে আদালতের মুখোস খুলে দিলেন প্রেমচন্দ পুলিশের মিথ্যা ও জাল সাক্ষী সৃষ্টি, ডাক্তারের মিথ্যা সাক্ষ্য, টাকা দিয়ে উকিল কেনার চক্রান্ত, ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার—এসবের ছবি তুলে ধরে লেখক বর্তমান ন্যায় ব্যবস্থাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। বলরাজ ও কাদেরের কালাপানির সাজা হলো ও অন্যান্য অভিযুক্তদের সাত বৎসর করে শাস্তি ঘোষিত হলো। বেচারা আত্মাভিমানী মনোহর জেলেই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়ালো। গৌস খাঁর মৃত্যুর পর এল এক নতুন কারিন্দা ফৈজুল্লাহ খাঁ নামে। সে আরো অধিক নির্দয়, অধিক কঠোর, অধিক অত্যাচারী।

জমিদারের খুল্লতাত ভ্রাতা প্রেমশঙ্কর, যে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল—সে এবার মঞ্চে ফিরে এলো যেন বিষ্ণুর অপর অবতার রূপে। মামলা হলো উচ্চ আদালতে। জমিদারের হয়ে যে বিশেশ্বর সাহ সাক্ষ্য দিয়েছিল সেই এবার সাক্ষ্য দিয়ে পুলিশের জঘন্য কারসাজির রহস্য উদ্‌ঘাটিত

করলো। তারই সঙ্গে মিথ্যা সাক্ষী ডাক্তার প্রিয়নাথও অনুশোচনা লাঘব করবার নিমিত্ত সত্যি কথা স্বীকার করে বিবৃতি দিল। ব্যারিষ্টর ইর্ফান আলি ভাল করে মামলা দেখাশুনা করলেন এবং সকল শাস্তি প্রাপ্তরাই মুক্তি পেল। লখনপুর, যা শ্মশানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, পূর্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে পেল। গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রামের প্রভূত উন্নতি হলো। পাঠশালা নতুন রূপ পেল, রাস্তাঘাট মেরামত হলো, কাচা কুঁয়ো পাকা হলো। মন্দিরের সংস্কার হলো, ধর্মশালা এবং অন্যান্য ঘর-বাড়ির রূপও পাল্টে গেল।

"সেবাসদন" থেকে প্রেমচন্দ এক পা অগ্রসর হয়ে "প্রেমাশ্রম"-এ পৌছেচেন। এখানে যেন তাঁর জীবন ও সমাজমুখী দৃষ্টি পূর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শোষক ও শোষিত কারা, শোষণের রূপ কত বীভৎস ও ভয়ঙ্কর, শোষকের হাতে থাকে কত বিভিন্ন প্রকারের শোষণের যন্ত্র, দরিদ্র কৃষক ও গ্রামবাসীরা সেই সকল যন্ত্রের হাতে কত অসহায় এবং দুর্বল তারই প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই প্রেমাশ্রম উপন্যাসে। জমিদার ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ পেয়াদা, পাটোয়ার, কারিন্দা, সরকারী অফিসার, পুলিশ ও দারোগা, এমন কি আইন ব্যাখ্যাতা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ও উকিল-মোক্তারের বাস্তব চেহারা খুলে ধরেছেন প্রেমচন্দ এই উপন্যাসে। কিন্তু লেখকের আসল উদ্দেশ্য এখানেই সীমিত নয়। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে শোষিত শ্রেণী যদি শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তবে শোষক কত নীচে নামতে পারে তাদের সেই আওয়াজকে গলা টিপে রুদ্ধ করে দিতে। তারই সঙ্গে তিনি এ তথ্যটার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে যদি নিপীড়িত ও শোষিত সমাজ মিলিতভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় তবে শেষ জয় তাদের হবেই। সত্যি বলতে কি হিন্দীতে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূত্রপাত হয় সম্ভবত এই উপন্যাসের মাধ্যমেই

প্রেমচন্দ এই উপন্যাসে সমকালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এই উপন্যাস যখন লেখা হয় তখন শ্রমিক আন্দোলনের এ দেশে প্রসার হয় নি কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের জন্ম হয় নি। এর বিষয়বস্তুর কেন্দ্রবিন্দু জমিদার; উদ্দেশ্য জমিদারী প্রথার কুফলগুলির রহস্যোদ্‌ঘাটন। গ্রামে জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচার, অনাচার, উৎপীড়ন, বল্‌গাহীন বিলাসিতা ও শক্তিমত্তার ছবি এঁকে শেষে তিনি এই প্রথা উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন।

প্রেমচন্দ পক্ষপাতশূন্য শিল্পী। তিনি জমিদারের পাঁচটি স্পষ্ট ভিন্ন রূপ এই

উপন্যাসে এঁকেছেন। প্রথম রূপটি মৃত জটাশঙ্করের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যার মধ্যে আছে জমিদারের দয়া-দাক্ষিণ্যের সঙ্গে ঔদার্যের মিশ্রণ। "তিনি প্রজাদের সঙ্গে যখন সন্তানদের মত ব্যবহার করতেন তখন প্রজারাও সানন্দে হাসতে হাসতে তার জন্যে বেগার খাটতো।"

আর এখন সেই জমিদারের বংশধর হলেন প্রভাশঙ্কর যিনি অতীতের ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাট-বাট বজায় রাখতে ইচ্ছুক হয়েও শক্তি-সামর্থ্যহীন নতুন বুদ্ধিবাদী যুগের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না। এ যুগের সন্তান জ্ঞানশঙ্করের হাতের তিনি পুতুল। নতুন জমিদার বুদ্ধিবাদী। নতুন গজিয়ে ওঠা পুঁজিবাদের তিনি সমর্থক। তিনি শোষণের নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করেন, শান্তির তথাকথিত রক্ষক পুলিশ ও হাকিমকে তিনি মুঠোয় রাখবার পদ্ধতিটা ভালভাবেই রপ্ত করেছেন। তিনি বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে আগ্রহী। তৃতীয় শ্রেণীর জমিদার জ্ঞানশঙ্করের চরিত্রটার ওপরই লেখক বেশী জোর দিয়েছেন। তিনি বুদ্ধিবাদী-যুগের বুদ্ধিবাদী জমিদার। শোষণ ও নিপীড়নের পন্থা তাঁর আধুনিক। প্রভাবশালী মহলকে হাতে রাখার পথও তিনি জানেন। অধিকার লিপ্সাও প্রবল। তাই নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাঁর বিবেক বাধা দেয় না। কিন্তু নিয়তির কশাঘাতে তাঁর নিজের পুত্র মায়াশঙ্করও, যার জন্যে তিনি ঘোর কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন—তাঁকে পরিত্যাগ করে।

মায়াশঙ্কর নতুন যুগের নতুন জমিদার। গান্ধিবাদের হাওয়া তার গায়েও লেগেছে। প্রজার কল্যাণেই যে তার নিজেরও কল্যাণ এই সত্যটা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। নাম কেনার লোভে সে সমাজ চেতনার ভান করে হলেও জমি বিলি করে দেয় কৃষকদের মধ্যে।

জমিদারের পঞ্চম রূপটি পাওয়া যায় রায় কমলাকান্তের মাধ্যমে। আন্তরিক ভাবেই কমলাকান্ত জমিদারবর্গের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করেন। জ্ঞানশঙ্করকে তিনি সোজাসুজি বলেন—এই জমিদারীর উপর তার কি অধিকার? এটা তো পিতার ইংরেজনীতির পরিবর্তে পাওয়া সম্পত্তি। কৃষকদের প্রতি আমাদের অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা নেই। এত সব ভাবনার অধিকারী হয়েও তিনি কিন্তু জমিদারীর বন্ধন থেকে মুক্তি পান নি।

"প্রেমাশ্রম" উপন্যাসে প্রেমচন্দ কঠোর বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছেন আদর্শের। অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন ও সত্যের জয়গান গেয়েছেন।

(৫ **নির্মলা :**—প্রেমচন্দের অধিকাংশ উপন্যাসই বৃহৎ। নির্মলা ও প্রতিজ্ঞা তার ব্যতিক্রম। নির্মলার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬। এই উপন্যাসটি তিনি লেখেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু প্রকাশিত হয় চার বছর পর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

এর গল্পটিও পণপ্রথা ও অসম বিবাহ এবং তার বীভৎস পরিণামকে কেন্দ্র করে লেখা। নায়িকা নির্মলার নামেই উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে। গল্পটি হল এই :—

উদয়ভানুলাল এক উকিল। তার পশার ভালই তাই পরিবারে এসে জুটেছে লতাপাতায় গজিয়ে ওঠা বহু আত্মীয়স্বজন। নিজের পরিবারে নিজের বলতে স্ত্রী ও দুই কন্যা। বড় নির্মলা ও ছোট কৃষ্ণা। নির্মলার বিয়ের কথা পাকা। প্রস্তুতিপর্ব চলছে। বরপক্ষ জানিয়েছেন যে পণ নেবেন না। এমন সময় একটি আকস্মিক ঘটনায় উকিলবাবু খুন হন এক গুণ্ডা দ্বারা যাকে কোনো এক সময় তিনি কয়েক বছরের জেল খাটিয়েছিলেন। উদয়ভানুর এই অকাল মৃত্যুই সংসারের সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট করে দিল। বরপক্ষ বেঁকে বসলো। উকিল সাহেবকে পণের কথা বলা হয়নি তার কারণ এই নয় যে বরপক্ষ পণ নিতে অনিচ্ছুক। বরং তাঁদের আশা ছিল যে দু-চার হাজার যা চক্ষুলজ্জার খাতিরে চাওয়া যাবে উকিলসাহেব নিজের তাগিদেই তার চেয়ে বেশী দেবেন। ছেলের মায়ের উক্তি—"যখন অন্য জায়গায় দশ হাজার নগদ পাচ্ছি তখন ওখানে কেন করবো না? ওর মেয়ে তো আর সোনার নয়। এখন আর ওখানে আছেই বা কি? জীবিত থাকলে লজ্জার খাতিরেই পনেরো-বিশ হাজার দিয়ে দিতেন।" (পৃ: ২২)।

কাজে কাজেই বিপদে পড়লেন বিধবা মা কল্যাণী। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে এক বুড়ো দোজবরের হাতে সুন্দরী সৎ মেয়েকে বিলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। জামাইয়ের নাম তোতারাম। তার আগের পক্ষের তিন সন্তান। ওকালতি করে ভালই পয়সা উপার্জন করেন। মোটামুটি সুখের এই সংসারে আগুন ধরাতে এগিয়ে আসে নির্মলার ননদ রুক্মিণী। যে দিন ভাই তোতারাম বাড়ির চাবিকাঠি তুলে দিল দ্বিতীয়া পত্নী নির্মলার হাতে সেদিন থেকে উঠতে-বসতে অহরহ প্রতি ব্যাপারে তীব্র বাক্যবাণে সে জর্জরিত করতে লাগলো নির্মলাকে। সৎমার বিরুদ্ধে প্রচলিত অভিযোগ গুলি শানিত ছোরার মত নির্মলার বুকে বিদ্ধ হত। নির্মলা নির্দোষিতা প্রমাণ করতে ননদকে বোঝাতে চেষ্টা করতো কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় না। রুক্মিণী বউ এর নামে মিথ্যে

অভিযোগ এনে নালিশ করতো ভাইয়ের কাছে। তোতারামও ক্রমে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। তার তিন ছেলের মধ্যে বড়টির নাম মনসারাম। সে লেখা-পড়ায় খুবই ভাল। ক্লাসে সব সময় প্রথম হয়। নির্মলা ছোট দুটি ছেলেকে স্নেহের ডোরে বেঁধে রাখে। বড়টি স্কুল থেকে এসেই জলখাবার খেয়েই মাঠে চলে যায় খেলতে। স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করে। নির্মলা বড়ছেলের কাছে ইংরিজি পড়ে। যে দিন তোতারাম তা জানতে পারলো সেদিনই তার সন্দিগ্ধ মন ছেলেকে হোস্টেলে দেওয়ার জন্যে উতলা হয়। নির্মলা কিন্তু স্বামীর মনের গোপন সন্দেহ ধরে ফেলে। হোস্টেলে ওর হয় যক্ষ্মা। নির্মলা ছোট ছেলেদের মুখে দাদার কথা শুনে অস্থির হয়ে স্বামীকে বলে ওকে বাড়ী নিয়ে আসতে। কিন্তু ছেলেকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো। মরবার আগে বিমাতার নিকট ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিল এই বলে—"ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আপনার গর্ভেই আমার পুনর্জন্ম হয়।" পৃঃ ২৮।

প্রধান এই ঘটনা প্রবাহের মাঝখানে আরেকটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার সংযোজন করেন প্রেমচন্দ। নির্মলার এক বান্ধবী নির্মলাকে আকৃষ্ট করে তার নাম সুধা। তার স্বামী ডাঃ ভুবনমোহন। দুই বান্ধবীতে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং সুধা নির্মলার জীবন কাহিনী শুনে তার ছোট বোন কৃষ্ণার সঙ্গে নিজের দেওরের বিয়ে দেওয়া স্থির করে ফেলে। নির্মলার অজ্ঞাতে সুধা সমস্ত ব্যবস্থা করে। এমন কি নির্মলার নামে তার মার নিকট সে পাঁচশো টাকাও পাঠিয়ে দেয়। বিবাহ বাসরে যখন সব রহস্য নির্মলার কাছে ফাঁস হয়ে যায় তখন সে চমৎকৃত হয়। এক পয়সাও পণ না নিয়ে এত বড় লোকের বাড়িতে বিয়ে হওয়ার মূল রহস্যটাও আর অজানা থাকে না। বিয়ের পর সবাই বিদায় নেয় কিন্তু নির্মলার মন আর যেন কিছুতেই বাপের বাড়ি ছাড়তে চায় না। তোতারামের তাগিদে সুধা একদিন শিশুসন্তান ও একজন কাজের লোককে নিয়ে নির্মলার কাছে ফিরে আসে। হঠাৎ এখানে সুধার ছেলের জ্বর হয় এবং ডাঃ ভুবনমোহনকে খবর দেওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়। সবাই আবার ফিরে যায় নির্মলাকে নিয়ে।

একদিন দ্বিতীয় পুত্র জিয়ারাম নির্মলার ঘর থেকে সমস্ত গয়নার বাক্স চুরি করে। যখন পুলিশের অনুসন্ধানে রহস্য ফাঁস হয় তখন সে আত্মহত্যা করে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে। যে বাড়িতে পরপর এমন অভাবনীয়

কুৎসিত ঘটনায় দুটি তরতাজা ছেলে আত্মহত্যা করে সে বাড়ি ছোট ছেলের কাছে বাসের অযোগ্য মনে হয়। সে এক সাধুর পাল্লায় পড়ে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। দুই পুত্রের এই অকাল মৃত্যুতে শোকার্ত পিতাও কনিষ্ঠ পুত্রের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। এদিকে একমাত্র শিশুসন্তানকে ননদের কোলে তুলে দিয়ে নির্মলাও প্রাণ ত্যাগ করে। শ্মশানে মুখাগ্নির সময় আবির্ভাব ঘটে এক জরাগ্রস্থ বৃদ্ধের। সে-ই নির্মলার স্বামী তোতারাম।

এই উপন্যাসে দু-একটি আকস্মিক ঘটনার সমাবেশে প্রেমচন্দ নিজেকে কিছুটা খেলো প্রতিপন্ন করেছেন। কাহিনীটির আরম্ভেই নির্মলার বাবার যে পরিস্থিতিতে মৃত্যু দেখান হয়েছে তা অনেকটা অস্বাভাবিক তো বটেই চমকপ্রদও বটে।

তা ছাড়া লেখক অপমৃত্যুর জোয়ারে ভেসে গেছেন বলে মনে হয়। অপমৃত্যুর ভাগী হয় উদয়ভানুলাল, তোতারামের মেজ ছেলে জিয়ারাম, সুধার স্বামী ডাঃ ভুবনমোহন। তা ছাড়া মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েছে মন্‌সারাম, নায়িকা নির্মলা ও সুধার শিশু সন্তান।

এই আকস্মিক ঘটনা কটি বাদ দিলে কিন্তু নির্মলা বেশ উঁচুদরের সামাজিক উপন্যাস বলে গণ্য হতে পারতো। বিশেষ করে নির্মলা ও মন্‌সারামের মানসিক দ্বন্দ্বের যে অপরূপ ছবি তিনি এঁকেছেন নিঃসন্দেহে তা তাঁর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের শক্তির প্রমাণ। ঘটনা সংযোজনের ও ক্রমিক বিকাশের ক্ষেত্রেও তিনি মুন্‌শিয়ানা দেখিয়েছেন।

কি ভাবে পণপ্রথার বলি হয় নিরপরাধ কুসুম কোমল বালিকারা তার চিত্রও তিনি সমাজের সামনে ভাল ভাবেই তুলে ধরেছেন। বিয়ে বাড়ী এসে বরযাত্রিরা যে ভাবে কন্যাপক্ষকে অপদস্থ করে তার কথা বলতে গিয়ে নির্মলার মা কল্যাণী বলছে—"কন্যা পক্ষের দোষ বারকরা বা নিন্দা করার কোন না কোন সুযোগ তারা বার করে ফেলেন। যার বাড়িতে শুকনো রুটিও জোটে না সেও বরযাত্রী হয়ে বাদশাহ হয়ে যায়। তেলটা সুগন্ধিত নয়। সাবান না জানি কোথা থেকে টাকায় সের দরে জোগাড় করে এনেছে, চাকররা কথা শোনে না, লণ্ঠনগুলো ধোঁয়া দেয়, চেয়ারে ছারপোকা ভরা, খাটগুলো ঢিলে, খাওয়ার জায়গায় হাওয়া নেই। এমনি হাজার হাজার অভিযোগ করা হয়।" (পৃঃ ৯)

বধূ নির্যাতনের মর্মস্পর্শী চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। আলোচ্য

উপন্যাসে বিধবা ননদ রুক্মিণী নববধূ রূপে আসার পর থেকেই আরম্ভ করে কারণে অকারণে অকথা কুকথায় এবং ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ করতে। যারে দেখতে নারি তার চরণ বাঁকা। কাজেই পান থেকে চূণ খসবার দরকার হয় না। "নির্মলা যদি ঘরে বসে থাকতো তবে বলতো কেমন অকর্মণ্যের ঢেঁকী, আবার যদি ছাতে যেতো কিংবা চারুদের সঙ্গে কথা বলতো তবে বুক চাপড়ে চেঁচাতো লাজলজ্জা বলে কিছু নেই, লজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছে! আর কিছু দিনের মধ্যে বাজারে নেচে বেড়াবে।" (পৃঃ ৩৮) লেখক নিজেই বলছেন— "ওকে চেপে ধরবার, টেনে-হিঁচড়ে কাঁটায় নিয়ে যাওয়ার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করবার, কাঁদাবার সুযোগ ও হাত থেকে যেতে দিত না।" (পৃঃ ৫৪) এই ননদই যখন বধূ মৃত্যুসজ্জায় তখন নিজের দোষ স্বীকার করে বলে—"বৌ, তুমি কোন অপরাধ কর নি। ভগবানের দিব্যি খেয়ে বলছি তোমার প্রতি আমার মনে বিন্দুমাত্র মালিন্য নেই। হ্যাঁ আমি তোমার প্রতি সর্বদাই দুর্ব্যবহার করেছি, এ দুঃখ আমার মনে আমরণ থাকবে।"

(৬) **রঙ্গভূমি**—(রচনাকাল ১৯২৫-২৭ ; প্রথম সংস্করণ ১৯২৭ খ্রীঃ)

এই উপন্যাসের মহানায়ক হলো বেনারস থেকে কিছু দূরে অবস্থিত পাণ্ডেপুর নামক এক গ্রামের নিবাসী অন্ধ সুরদাস। নামের সঙ্গে গুণেরও মিল রেখে সে ভাল ভজন গান করে, ধর্মই তার কর্তব্য নির্দেশ করে। মানুষ ও ভগবানের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। পিতৃ-মাতৃহীন একটি অবোধ ভাইপোকে কেন্দ্র করেই তার জীবন। অন্ধের ভিক্ষে করা ছাড়া তো এদেশে আর কোন অন্য জীবিকা নির্ধারিত নেই, তাই সে ভিখিরি। শহরে যাবার রাস্তার ধারে বসে মানুষ মাত্রের কল্যাণ কামনা করে সে ভিক্ষে চায়। লেখকের ভাষায় বলি— বাহ্যিক দৃষ্টি তার বন্ধ কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি খোলা। উপন্যাসের বীজ রয়েছে এ হেন এক অন্ধের একফালি জমিতে লুক্কায়িত, যে জমি আশে-পাশের সব গরু-মোষ, ছাগল-ভেড়াদের যোগায় অন্ন।

এই জমির ওপরই দৃষ্টি পড়ে এক বিত্তশালী ব্যবসায়ীর, সে এখানে সিগারেটের কারখানা খুলবে। সুরদাসের ওপর নানা দিক দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে জমিটা হাত করবার চেষ্টা করতে থাকে সেই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ী জনসেবক। জনসেবকের কন্যা সুফিয়া খ্রীষ্টান হয়েও সম্পূর্ণ ভাবে গোঁড়ামি মুক্ত। মা কিন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টান। তাই মার সঙ্গে প্রায়ই তার লাগে বাক্‌যুদ্ধ। একদিন এই কথা কাটাকাটির ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে মা তাকে বিতাড়িত করে দেয় বাড়ি থেকে।

সুফিয়া বিনা প্রতিবাদে গৃহত্যাগ করে; কিন্তু পথে এক অগ্নিকাণ্ডের সম্মুখীন হয়। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে সে নিজে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তিন দিন পর যখন তার মূর্চ্ছা দূর হয় তখন সে নিজেকে কুমার ভরত সিংহের বিশাল রাজবাড়িতে দুগ্ধ-ফেনিল শয্যার উপর শায়িত দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। সে জানতে পারে যে রাজাসাহেবের পুত্র বিনয় সিংহই তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ওদের দুজনের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা জন্ম নেয়।

স্বার্থান্বেষী জনসেবক জানতে পারে যে কুমার সাহেবের জামাতা চাতারীর পৌরসভার অধ্যক্ষ। সুরদাসের সেই জমিটুকু কেনার ব্যবস্থার জন্য তিনি তার ওপর জাল বিস্তার করেন। জামাই মহেন্দ্র নিজে সুরদাসের সঙ্গে দেখা করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে এই জমিটার ওপর কারখানা খুললে গ্রামের লোকেদের কত উপকার হবে। তা ছাড়া তার নিজেরও আর ভিক্ষে করতে হবে না কিন্তু সুরদাস নিজের আন্তরিক ভয়টা জানিয়ে দেয় যে কারখানা খোলা মানেই হল মদ ও তাড়ি ব্যবসায়ীদের পোয়া বারো। তা ছাড়া শ্রমিকদের হাতে পয়সা এলেই গ্রামে বারনারীদের আড্ডা বসবে। সুরদাসের সবাপেক্ষা ভয় আশেপাশের গ্রামের নির্বাক পশুগুলির খাদ্য জুটবে কোথা থেকে ?

অন্য দিকে সুফিয়ার মিষ্টি ব্যবহার এবং উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে কুমার সাহেব ও তাঁর স্ত্রী তো মুগ্ধ। তারা কিছুতেই মেয়েকে ছাড়বেন না। এদিকে সুফিয়া ও বিনয়ের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ভালবাসা বিনয়ের মা'র মনে শঙ্কা জাগিয়ে তোলে। হতে পারে সুফিয়া খুব ভাল মেয়ে কিন্তু একটি ম্লেচ্ছ কন্যার সঙ্গে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের বিয়ে কিছুতেই দিতে পারেন না। তাই তিনি কৌশলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন, মনে এই আশা যে কিছু কালের অদেখায় এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ভালবাসা দূর হয়ে যাবে। পুত্রকে এক অজুহাতে পাঠিয়ে দিলেন রাজস্থানে। কিন্তু পুত্রের মনের প্রথম ভালবাসার স্মৃতিটুকু তিনি মুছে ফেলতে অসমর্থ হলেন। বিনয় সুফিয়ার ভাই প্রভু-সেবকের হাত দিয়ে প্রেয়সীর নিকট পত্র প্রেরণ করে, যাতে সে নিজের প্রেমের কথা লেখে। সরল মনে সুফিয়া সেই চিঠিটি রাণীমার হাতে তুলে দেয় এই আশা নিয়ে যে হয়তো তিনি ছেলের মনোভাব বুঝতে পেরে দুটি প্রেমপাশে আবদ্ধ হৃদয়ের স্থায়ী মিলনের ব্যবস্থা দেবেন। কিন্তু হায় বিধাতা! রাণীমা সুফিয়াকে

দিয়ে পত্রপাঠ এই মর্মে একটি চিঠি লেখালেন যে তারা দু'জন ভাইবোন, এবং তাদের মধ্যে এই সম্বন্ধই স্থায়ী হতে পারে। বেচারী সুফিয়া এই মর্মে চিঠি লিখতে গিয়ে অন্তরে এমন বেদনা অনুভব করে যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

এই যখন অবস্থা তখন সেখানে ক্লার্ক নামে এক ইংরেজ যুবক ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসে। মা'র মনে জাগে নতুন আশা, তিনি তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যে ব্যবস্থা করতে থাকেন। এই আশাতেই তিনি সুফিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসেন।

বিনয় রাজস্থানে গিয়ে গ্রামসেবার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যায় কিন্তু তার মন থেকে সুফিয়ার স্মৃতি মুছে যাওয়ার পরিবর্তে যেন ঘা খেয়ে বিরহের বেদনার মাধ্যমে আরো সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। একদিন বিনয় যখন একটি গ্রাম থেকে ফিরে আসছিল তখন হঠাৎ পথে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সর্দার বীরপাল সিংহের ডাকাত দলের। কথাবার্তার মাধ্যমে বিনয়ের মনে এই ধারণা জন্মায় যে এরা আসলে ডাকাত নয় বরং দেশ ও দশের সেবক। রাজাসাহেবের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তাদের সশস্ত্র জেহাদ। ডাকাতদের সঙ্গে এই যোগাযোগের ফলে গ্রেপ্তার হয় এবং কারাবরণ করে। কয়েক মাস পর যখন ডাকাত সর্দার বীরপাল বিনয়কে কারামুক্ত করতে আসে তখন সে স্পষ্ট ভাষায় তার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে।

এদিকে সুফিয়াও বিনয়কে ভুলতে পারে না। বাড়ি এসে সে দেখতে পায় যে মা ক্লার্কের সঙ্গে তার বিয়ের যোগাযোগ করতে ব্যস্ত এবং বাবা তারই সাহায্যে সুরদাসের জমিটা যেন তেন প্রকারে দখলে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সুফিয়া অনন্যোপায় হয়ে মার পরিকল্পনানুসারে ক্লার্কের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় আরম্ভ করে এবং ক্লার্ককে বশে এনে সুরদাসের জমি দখলের আদেশ বাতিল করিয়ে দেয়। আরম্ভ হয় ওপরতলার দাবাখেলা। চাতারীর রাজা মহেন্দ্রসিং ক্লার্কের এই বাতিল আদেশকে অতি অপমানজনক মনে করেন এবং ক্লার্কের বদলির জন্যে চেষ্টায় ব্রতী হন। তার আন্দোলনে সরকার বাধ্য হয় তাকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে। ভাগ্যবশত ক্লার্কের বদলী হয় যশবন্তনগরে যেখানে বিনয় জেলে দিন গুনছিল। সুফিয়া সেখানে গিয়ে বিনয়ের সঙ্গে জেলে দেখা করে বাস্তব ঘটনা বিবৃত করে এবং নিজের প্রেমের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার কথা বুঝিয়ে বলে। জেলেই দুজনে একে অপরের প্রতি আমরণ বিশ্বস্ত থাকবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইতিপূর্বে বিনয় মার কাছ থেকে এই মর্মে চিঠি পেয়েছিল যে

সুফিয়া ও ক্লার্কের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। তা বিনয়ের মন ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু সুফিয়ার কথা তার মনে যেন সঞ্জীবনী শক্তি যোগায়। যে জীবন তার অন্তঃসারশূন্য মনে হত এখন যেন সে তার মানে খুঁজে পায়। তাই সুফিয়া বিনয়ের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ বিনয় খবর পায় যে তার মা রাণী জাহ্নবী খুবই অসুস্থ। মাকে দেখবার জন্যে তার মনে জাগে প্রবল বাসনা। তাই সে কারাগার থেকে পালায়। কিন্তু পথে সে এক জনতার সম্মুখীন হয়। ক্লার্কের গাড়ি চাপা পড়ে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ায় বীরপালসিংহের নেতৃত্বে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সুফিয়া ক্লার্ককে রক্ষা করার জন্যে চেষ্টা করে এবং হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে থেকে সজোরে ছুঁড়ে দেওয়া একটি পাথর আঘাত করে সুফিয়াকে। বিনয় সুফিয়ার অবস্থা দেখে অবুঝের মত জননেতা বীরপালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু একা সে কি করতে পারে! আন্দোলনকারীরা সুফিয়াকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বিব্রত বিনয় সুফিয়াকে উদ্ধার করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাজ্য পুলিশ ও কর্মচারিদের সাহায্যেও সে অনুসন্ধান কার্য চালায় কিন্তু কোন ফল হয় না। বিনয়ের মন যখন চরম হতাশার সম্মুখীন তখন হঠাৎ আন্দোলনকারীরাই সুফিয়াকে চুপিসারে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সরে পড়ে। আসলে সুফিয়ার কথাবার্তায় আন্দোলনকারীরা বুঝতে পেরেছিল যে সে তাদেরই একজন।

এবার আমরা আবার ফিরে যাই আমাদের সেই পাণ্ডেপুর গ্রামে যে গ্রামকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের মূল ঘটনাটি পল্লবিত হয়েছে। সুরদাসের মতই সে গ্রামের আরেকটি বাস্তববাদী চরিত্র হল ভৈরো। তার দোকান আছে তাড়ির। সুরদাস যতটা ভালমানুষ ভৈরো ততটাই বদ প্রকৃতির। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। প্রায়ই মত্তাবস্থায় সে নিজের বৌ সুভাগীকে ঠেঙ্গায়। মাঝে মধ্যে সুভাগীর সে মার অসহ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু তবু মুখ বন্ধ করে সব সহ্য করা ছাড়া সমাজের নিকট সে কিছুই আশা করতে পারে না। একদিন ভৈরো বৌকে বেদম প্রহার করার পর ঘর থেকে বার করে দেয়। বেচারা সুরদাস আশ্রয়হীন বিবাহিতা নারীকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়। ভৈরো যখন তা জানতে পারে সে সুরদাসের নামে কুৎসা রটনা আরম্ভ করে এবং গ্রামবাসীদের মনে সুরদাসের প্রতি ঘৃণা জাগাতে চেষ্টা করে। সকলে মিলে সুরদাসকে জমি বিক্রীর পরামর্শ দেয়। কিন্তু সুরদাসকে তার সিদ্ধান্ত থেকে কেউ টলাতে পারে না। ফলে গ্রামবাসীরা সুরদাসের ওপর আরো রেগে যায়। ভৈরো সুরদাসের

বিরুদ্ধে পরস্ত্রী হরণের মামলা দায়ের করে এবং সুরদাসকে দোষী সাব্যস্ত করে জজ তাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। ভৈরোর এই কাজকে কেউ সমর্থন করতে পারে না। তারা জরিমানার টাকা জোগাড় করে অন্ধ সুরদাসকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনে।

ওদিকে মুক্তির পর সুফিয়া ও বিনয় কিছুদিন প্রেমের নেশায় জীবন যাপন করে ফিরে আসে বাড়িতে। বিনয়কে চোখের সামনে আত্মহত্যা করতে সচেষ্ট দেখে মা তাকে ক্ষমা করেন। ধনিক শ্রেণীর নানা অস্ত্রে একদিন সুরদাস ও গরীব গ্রামবাসীরাও ঘায়েল হয়ে বাস্তুহারা হয়। জমির ওপর দখল নেয় জনসেবক। সুরদাসের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে। তারা যখন বিনয়কে দেখতে পায় তখন তাকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থাকে এই বলে যে বিপদে ফেলে কোথায় ছিলেন এত দিন। বিনয় উত্তেজিত হয়ে জনতার সামনেই নিজের বুকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করে। শেষ বিদায়ের পূর্বে সে বলে যায়—দেখো ধনীর দুলালরা কিভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। এই সত্যাগ্রহীদের ওপর শান্তি রক্ষকদের গুলি চলে। অন্ধ সুরদাস গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। সুফিয়াও বিনয়হীন জীবন যাপন ও ক্লার্কের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় আত্মহত্যা করে প্রাণ জুড়ায়। মেয়ের এই পরিণতির জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে তিল তিল করে দগ্ধে মরেন মিসেস জনসেবক। আর মিষ্টার জনসেবক? তিনি এখন বিরাট কারখানার মালিক, নির্লিপ্ত ভাবে নোটের বাণ্ডিল গোনেন আর তাকে দ্বিগুণ করার স্বপ্ন দেখেন। বিনয়ের মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত রাজা ভরতসিং বিলাসিতার পঙ্কে ডুবতে থাকেন, আর ডুবতে থাকেন। আর ভাবেন—ভগবান নেই, ভগবান নেই। দুনিয়া পঙ্কিল থেকে পঙ্কিলতর হয়ে উঠছে।

প্রথম যখন এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৩০। এই বৃহৎ উপন্যাসে তিনি নিজেকে আর পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। ব্রিটিশ শাসনকালীন বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে সম্পৃক্ত করে তিনি এমন একটি বৃহদাকার পটভূমি প্রস্তুত করেছেন যা মহাকাব্যোচিত গরিমামণ্ডিত। এতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ-প্রক্রিয়া, যন্ত্রচালিত কলকারখানার দোষ ত্রুটি, ক্রমবর্দ্ধমান স্বেচ্ছাচারিতা, পতনোন্মুখী সামন্ততান্ত্রিক কার্যাবলি ও মনোবৃত্তি, এবং সর্বতোমুখী ভ্রষ্টাচারের মুখে পড়ে সাধারণ প্রজার চরম দুর্দশার যে বাস্তব-

বাজী ছবি লেখক এঁকেছেন তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। মহাত্মাগান্ধী সত্যাগ্রহের যে নবীন পথ ১৯২০ সালে ভারতীয় জনগণের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন তার স্বরূপও এতে ভাল ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। তৎকালীন শাসকদের পুলিশবাহিনীর দ্বারা অহিংস গ্রামবাসীদের ওপর যথেচ্ছ গুলি চালনার বর্ণনা ও সুন্দর ভাবেই দিয়েছেন। সুরদাসের মত এক অন্ধ অকিঞ্চন ভিখারীকে এই বৃহৎ উপন্যাসের নায়ক করে প্রেমচন্দ হিন্দী কথাসাহিত্যকেই গৌরবান্বিত করেছেন। সুরদাসের জীবন অতি সাধারণ হয়েও অসাধারণত্বে ভরা, অতি সহজ সরল হয়েও অতি জটিল জীবনাদর্শমণ্ডিত, অন্ধ হয়েও তার জীবনমুখী দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী, নিজে অত্যন্ত দরিদ্র হয়েও পরের দারিদ্র্যের কথা শুনে তার অশ্রু ঝরে। সন্ধ্যের সময় এক পেট খিচুড়ি খেয়ে সে প্রত্যহ মন্দিরে গিয়ে ভজন ভক্তিতে গদগদ হয়ে যায়। তার মন আকাশের মত উদার আবার হিমালয়ের মত দৃঢ়। সে সত্যনিষ্ঠ, সত্য সে যতই নিষ্ঠুর হোক তার একান্ত ভাবে কাম্য। সে স্পষ্টবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ আবার অত্যন্ত বিনয়ী। মানুষের প্রতি ঘৃণা দ্বেষ বলে তার মনে কিছু নেই কিন্তু অপরদিকে সকল প্রকার কু' কে সে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে। কঠিনতম পরিস্থিতিতেও সে পরের উপকার করতে ভোলে না। নারীর অপমান বা অসম্মান সে সইতে পারে না। নারী মানে মা, বোন বা কন্যা। সুরদাসের কাছে জীবন মানেই সংগ্রাম, এ সংসার সেই সংগ্রামের লীলাভূমি। জীবন যুদ্ধে জয় পরাজয় হার-জিত তো লেগেই আছে। হারলে আবার শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধে নামতে হবে। এ যুদ্ধ মানুষকে আমরণ লড়তে হয়। পরম শত্রুকেও সে ঘৃণা করে না। বলে—"হেরে হেরে তোমার কাছ থেকেই খেলা শিখবো আর একদিন না একদিন আমার জয় হবেই।" তার আত্মবিশ্বাস কত গভীর তা বোঝা যায় যখন সরকারী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী গ্রাম্য জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত হওয়ার জন্যে অনুরোধ করে সুরদাস বলে—"একজন দীনহীন অন্ধ লোক কি করে একটি পুরো সৈন্যদলকে পিছু হটতে বাধ্য করতে পারে, তোপের মুখ বন্ধ করে দিতে পারে, তলোয়ারের ধার উল্টোমুখী করে-দিতে পারে?" আসলে গান্ধীজীর পরিকল্পিত অহিংস সত্যাগ্রহের মূর্ত প্রতীক এই সুরদাস।

প্রেমচন্দ মাস-সাইকোলজী সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ। উত্তেজনাকে প্রশমিত না করতে পারলে তার ফল কি হয় তাও তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার

চেষ্টা করেছেন। বিনয় ও সোফিয়ার মানসিক দ্বন্দ্বও তিনি ভালভাবে তুলে ধরেছেন। অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক এই দুই প্রেমিক যুগলের ভালবাসাকে তিনি অত্যন্ত ওপরে স্থান দিয়েছেন। তথাপি প্রেমচন্দ এই দুই গভীর প্রেমে আবদ্ধ আত্মাকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধতে সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি। আন্তর্জাতীয় বিবাহর ব্যাপারে তিনি যেন সংস্কার মুক্ত হতে পারেন নি তাই বিনয়কে দিয়ে নাটকীয় ভাবে আত্মহত্যা করিয়ে পথটা সহজ করে নিয়েছেন। প্রেমচন্দ এমতাবস্থায় সহজ ভাবেই সোফিয়ার বিবাহ ক্লার্কের সঙ্গে দিতে পারতেন কিন্তু তাঁর আদর্শ সেখানেও মাঝপথে এসে বাধা সৃষ্টি করলো যাতে সোফিয়াও আত্মহত্যা করে বিনয়ের নির্দেশিত পথে প্রাণ বিসর্জন দিল।

এই উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো চারিত্রিক বৈচিত্র্য। গ্রামের ভৈরো, তাহির আলী, জগধর, নায়করাম, বজরঙ্গী ইত্যাদি বহু প্রতিনিধি-মূলক চরিত্র তিনি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাদরী জনসেবক, তাঁর পুত্র প্রভুসেবক ও কন্যা সোফিয়া, এবং স্ত্রীর এই ছোট পরিবারটিকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন ঘটনার জাল বুনেছেন লেখক তাতে তাঁর ক্ষুরধার নিরীক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাই বোন দুজনেই ভাবুক প্রকৃতির, মা গোঁড়া খ্রীষ্টান, বাবার মধ্যে বিশেষ গোঁড়ামি নেই। এঁরা সকলেই যেন এক এক শ্রেণীর প্রতিনিধি। শ্রেণী চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে পাওয়া যায়। এছাড়া সামন্ততান্ত্রিক রাজসত্তা এবং সভ্যতার ম্রিয়মান প্রতিভূ রূপে আছেন চাতারী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং, কুমার ভরতসিং এবং যশবন্ত নগরের মহারাজা। এঁদের চরিত্রগুলিকে প্রেমচন্দ অনেকটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা অঙ্কিত করেছেন।

উপন্যাসটি পড়ার পর সকলেরই মনে হবে নায়ক সুরদাসের এই সর্বতোমুখী পরাজয় দেখানো কি ঠিক হয়েছে। আমি বলবো হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। লৌকিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পরাজয় হলেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিয়েও জয়ী হয়েছে। পর্যুদস্ত পরাভূত ও পরাজিত সুরদাসের মৃত্যুর পর শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলে যে ভাবে তাকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছে তা তার জয়েরই সূচক, পরাজয়ের নয়। সুরদাস প্রেমচন্দের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

(৭) **কায়াকল্প**—(১৯২৬ খ্রীঃ)

বজ্রধর সিংহের পুত্র চক্রধর পিতার সাহায্য ব্যতিরেকেই যখন কষ্ট করে এম. এ. পাশ করে সংসার যুদ্ধে অবতরণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তখন পিতার সঙ্গে লাগলো আদর্শের সংঘাত। পিতার ইচ্ছে পুত্র সরকারী চাকুরীতে যোগ

সেন কিন্তু আদর্শবাদী চক্রধর দেশের ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করবার সঙ্কল্প করে। অবশেষে অনেক অনুরোধ করে পিতা জগদীশপুরের দেওয়ান ঠাকুর হরিসেবক সিংহের কন্যা মনোরমাকে পড়াবার জন্যে সম্মতি আদায় করেন। পুত্রের এই যোগাযোগের মাধ্যমেই পিতা বজ্রধর সিংহও সেখানে তহসীলদারের একটি চাকুরীর ব্যবস্থা করে নেন। এই জগদীশপুরের রাজা-সাহেবের মৃত্যুর পর রাণী দেবপ্রিয়া বিধবা হন কিন্তু তাঁর অতৃপ্ত কামনা বাসনা দমিত না হয়ে যেন আরও বৃদ্ধি পায়। একদা এক রাজকুমার রাণী সাহেবার নিকট আসেন এবং নিজেকে রাণীর পূর্বজন্মের স্বামী বলে পরিচয় দেন। রাণী অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং রাজকুমার বিশালসিংহের হাতে শাসন ভার সোঁপে দিয়ে তাঁর সঙ্গে চলে যান।

বিশালসিংহের রাজতিলকের জন্যে প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ হয়। চাই টাকা। অতএব রাজকর্মচারীরা প্রজার ওপর আরম্ভ করে অত্যাচার। টাকা আদায়ের জন্যে চলে শোষন ও নিপীড়ন। গরীব চাষী মজুরের কাছ থেকে টাকা আদায় করার নানা অবৈধ ও অসমীচীন উপায় উদ্ভাবন করতে দিল লাগলো কর্মচারীর দল। চারদিকে হাহাকার রব উঠলো। যারা সহজে না তাদের ওপর শারীরিক পীড়ন আরম্ভ হলো। অবস্থা দেখে চক্রধর নিজেই রাজাসাহেবের নিকট নালিশ জানাতে গেলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ অস্বীকার করলেন। তারপর রাজা-প্রজায় আরম্ভ হয় সংঘর্ষ। নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের অনেকেই রাজা ও তার সাকরেদদের গুলিতে নিহত হয়। চক্রধর উন্মত্ত জনতার ক্রোধকে প্রশমিত করে। চক্রধর গ্রেপ্তার হয় ও কারাবরণ করে। মনোরমা যখন চক্রধরের সাজার কথা জানতে পারে তক্ষুণি রাজবাড়িতে গিয়ে রাজাসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ করে যেন তিনি চক্রধরের মত একজন সবজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। রাজাসাহেব মনোরমার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন এবং মুক্তির চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা অসফল হয়।

এবার রাজাসাহেব মনোরমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। মনোরমার মা-বাবা সম্মত না হলেও মনোরমার আপত্তি না থাকায় অবশেষে বিবাহ সম্পন্ন হয়। রাজাসাহেব তখন প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে উপস্থিত। বাড়িতে তিন তিনটি বিবাহিতা রাণী। তৎ সত্ত্বেও নব পরিণীতার সৌন্দর্যসাগরে ডুব দিয়ে কিছুদিন আরো যৌবনকে উপভোগ করার বাসনা ত্যাগ করতে পারেন না।

ওদিকে জেলে কয়েদিদেরকে কেন্দ্র করে আরো গণ্ডগোল হয় এবং চক্রধর সঙ্গীনের খোঁচায় ভীষণ ভাবে আহত হয়। গণ্ডগোলের জন্য দায়ী করা হয় চক্রধরকেই। তাকে আগ্রা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এবং একটি অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা হয়। এখানে বিশেষ অনুমতি নিয়ে দেখা করে সেই অহল্যা নামের মেয়েটি যাকে তীর্থস্থান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল। অহল্যা একপ্রকার বাগদত্তাই।

অবশেষে মুক্তি পায় চক্রধর। রাজ্যের দিক থেকে তাকে স্বাগত জানান হয়। স্টেশনে বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। পুষ্পবৃষ্টি ও জয় জয়কার ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে স্টেশন এলাকা। শোভাযাত্রা সহকারে তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানান হয়। চক্রধর সহজেই বুঝতে পারে যে মনোরমা রাজাকে বিয়ে করলেও চক্রধরকে বিস্মৃত হতে পারে নি। এই ব্যাপক অভিনন্দনের পশ্চাতে নিশ্চয় তার অদৃশ্য হাত আছে।

এমতাবস্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে আগ্রায়। সে দাঙ্গায় মারা যান যশোদানন্দন যিনি সন্তানস্নেহে লালন পালন করে বড় করে তুলেছিলেন মাতৃ-পিতৃহারা অহল্যাকে। দাঙ্গার খবর পেয়েই চক্রধর আগ্রায় পৌঁছোয়। খবর পায় যে অহল্যাকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে গেছে। যশোদানন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু খোয়াজা মহমুদের সহযোগিতায় অহল্যাকে উদ্ধার করা হয়। অহল্যার মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে চক্রধর তাকে বিবাহ করে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন মাতা-পিতা পুত্রকে গ্রহণ করলেও অহল্যাকে স্বীকৃতি দিতে অপারগ হন। অবশেষে সে সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করে এলাহাবাদে চলে যায়। মনোরমা বিদায় বেলায় চক্রধরকে একটি টাকার থলে উপহার দিয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখী করাব চেষ্টা করে। এলাহাবাদে তার এক পুত্র হয় যার নাম রাখা হয় শঙ্খধর। সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করায় আয় বৃদ্ধির কোনো পথ খুঁজে পায়না চক্রধর। অর্থাভাবে কষ্ট পেতে থাকে সবাই! এমন সময় জগদীশপুর থেকে একটি টেলিগ্রাম আসে এই দুঃসংবাদ নিয়ে যে মনোরমা ভীষণ অসুস্থ। চক্রধর অবিলম্বে সস্ত্রীক জগদীশপুরে যায় এবং সকলের এই আনন্দময় মিলনের মুহূর্তে জানা যায় যে অহল্যা রাজা সাহেবেরই হারানো কন্যা। রাজা সাহেব আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। অহল্যা ক্রমে ভোগের দিকে আকৃষ্ট হয়। চক্রধর ঐশ্বর্যের মাঝেও নিজেকে সংযত রাখে। রাজ বাড়ীর এই অবস্থা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী মনে হয়। তাই

একদিন সে সব ত্যাগ করে চলে যায়। মনোরমা শত চেষ্টা করেও চক্রধরের খোঁজ পায় না।

এদিকে পুত্র শঙ্খধর যৌবনে উপনীত হয়েই পিতার খোঁজে বার হয় এবং পিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু পথে এক অজ্ঞাত শক্তি তাকে দেবপ্রিয়ার নিকট টেনে নিয়ে যায়। অদৃশ্য শক্তির দ্বারা জানা যায় যে শঙ্খধর পূর্বজন্মে দেবপ্রিয়ার স্বামী ছিল। কমলা নাম নিয়ে সে শঙ্খধরকে বিবাহ করে। কিন্তু শঙ্খধর আত্মগ্লানিতে ভুগতে থাকে এবং এই বলে প্রাণ ত্যাগ করে যে আমরা তখন মিলিত হব যখন আমরা বাসনা মুক্ত হতে পারবো। এ খবর পেয়ে রাজাসাহেব আত্মহত্যা করেন। চক্রধর বাড়ি ফেরে। সন্তানহারা অহল্যা শোকে দুঃখে মৃত্যু বরণ করে। রাজ্যে আবার দেবপ্রিয়া ফিরে আসেন এবং শাসনকার্যের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নেন। কামনা-বাসনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত সেই দেবপ্রিয়া আর পূর্বের দেবপ্রিয়া থাকে না। সে তপস্বিনীর জীবন যাপন করতে থাকে।

সেবাসদন, প্রেমাশ্রম ও রঙ্গভূমির মত বাস্তববাদী বৃহৎ উপন্যাস লেখার পর কায়াকল্পে এসে যেন লেখক প্রেমচন্দ নিজেকে ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হয়। কোথা থেকে হঠাৎ তিনি এমন উদ্ভট অবাস্তব ও অলৌকিক ঘটনাবলী সংযোজনের প্রেরণা পেলেন বোঝা মুস্কিল। সর্বাধিক আশ্চর্য হতে হয় এই দেখে যে এই অলৌকিক অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিলেও মূল উপন্যাসের কোনো অঙ্গহানি হয় না। এই অংশগুলির ধারাবাহিকতার অভাবও লক্ষনীয়। অথচ এই উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে এই অবাঞ্ছিত ঘটনা সমূহকে কেন্দ্র করেই। ঘোর বাস্তববাদী প্রেমচন্দ কি তবে জ্যোতিষবিদ্যা, যোগশক্তি, জন্মান্তরবাদ, যাগযজ্ঞের ওপর আস্থা রাখতেন, শেকড়ের অলৌকিক শক্তির ওপর বিশ্বাস করতেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমি গল্পটির এই আজগুবি অংশটি ইচ্ছাকৃত ভাবেই উপেক্ষা করেছি যাতে মূল গল্পটির রসাস্বাদনে বিঘ্ন না ঘটে।

(৮) **গবন—(১৯৩০ খ্রীঃ)**

সাংসারিক অভাব অনটনগ্রস্ত পরিবারের একটি জলন্ত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আমরা "গবনে"। দয়ানাথ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন শান্তিপ্রিয় সৎ চাকুরিজীবি, সে ঘুষের রাজত্বে থেকেও ঘুষ নেয় না।

দয়ানাথ যখন একমাত্র পুত্র রমানাথের বিবাহ দেন তখন তিনি সাধ্যাতীত

ব্যয় করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ধনী পরিবারের আদরে লালিতা পালিতা কন্যা জালপা অতি শৈশব থেকে স্বপ্ন দেখতো একটি চন্দ্রহারের (এক ধরণের হার)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিয়েতে সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না তাই তার মনে ক্ষোভ থেকে যায়।

পুত্র রমানাথ সংসারের প্রকৃত অবস্থাকে নববধূর দৃষ্টির অন্তরালে রাখতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাকে আশ্বাস দেয়—এ আর এমন কি, গড়িয়ে দেবো চন্দ্রহার। পিতা দয়ানাথের বিশ্বাস ছিল বিয়েতে যে পণের টাকা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে শোধ করে দেবেন ঋণ। কিন্তু সে টাকাও জাঁক-জমক ও আড়ম্বরে হাওয়ায় উবে গেল। এদিকে মহাজনদের তাগাদা আরম্ভ হয়। পিতা-পুত্রে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলো যে কিছু গয়নাপত্র দোকানে ফেরত দিয়ে দেওয়া হোক। পুত্র রমানাথ সোজাপথ না অবলম্বন করে এক রাত্রে নিজেই বৌয়ের গয়নার বাক্স উধাও করে দেয়। বেচারী জালপার জীবনে গয়নাই ছিল প্রাণাধিক প্রিয়বস্তু। সমস্ত গয়না হারিয়ে সে ম্রিয়মান হয়ে যায়।

এদিকে রমানাথ মিউনিসিপ্যালিটিতে চুংগী বিভাগে চাকরী পেয়ে যায়; মাসোহারা তিরিশ টাকা। বিভাগের দৌলতে কিছু উপরি আয়ও হয়। পারিবারিক দৈন্যের বাস্তব ছবিটা চোখের আড়ালে রাখবার অপচেষ্টায় ব্রতী রমানাথ বধূর ইচ্ছেমত কতগুলি গয়নাগাটিও কিনে দেয়। ফলে স্বর্ণকারের কাছে ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬০০ টাকা। নববধূ জালপার গহনা দেখে তার এক বান্ধবীও তার কাছে টাকা দিয়ে সেই গহনা গড়িয়ে দেওয়ার আব্দার করে। রমানাথ টাকা দিয়ে স্বর্ণকারকে আরেকটি গহনা তৈরী করতে বলে। কিন্তু স্বর্ণকার টাকা ঋণ বাবদ কেটে নেয়। এবার বিপদে পড়ে রমানাথ। প্রথম কিছুকাল কাটে "আজ নয় কাল" বলে। শেষ রক্ষা করতে রমানাথ একদিন টাকা দেখাবার জন্য তার হেপাজতে রক্ষিত চুংগী করের সরকারি টাকা জমা না দিয়ে বাড়িতে এনে রাখে। বেচারী জালপা সেই টাকা তার বান্ধবীকে দিয়ে দেয়। এবার বিপদে পড়ে রমানাথ। টাকা জমা না দিলে টাকা তছরূপের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় রমানাথ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে স্ত্রীর নামে একটি পত্র লেখে। চিঠিটা স্ত্রীর হাতে দেওয়ার পূর্বেই আকস্মিকভাবে জালপা সেটা পেয়ে যায়। স্ত্রীকে চিঠিটা পড়তে দেখে লজ্জিত রমানাথ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পত্রপাঠ মাত্র বুদ্ধিমতী জালপার কিছুই বুঝতে বিলম্ব হয় না। সে সহজেই অসঙ্কোচে অলঙ্কার বিক্রী করে মিউনিসিপ্যালিটির টাকা ফিরিয়ে দেয়।

ওদিকে স্বার্থ রমানাথ যেন কল্পিত পুলিশের তাড়া খেয়ে ট্রেনে করে কলকাতা এসে উপস্থিত হয়। পথে এক বৃদ্ধ শাকসব্জীর দোকানদার দেবীদীনের সঙ্গে আলাপ হয়। রমানাথ তার এখানেই আশ্রয় নেয়। এখানে সে নিজেকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলে পরিচয় দেয়।

অপরাধী মন নিয়ে রমানাথ অজানা অপরিচিত কলকাতা শহরে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একদিন যখন সে একটা নাটক দেখে রাত করে বাড়ি ফিরছিল তখন হঠাৎ পুলিশের মুখোমুখী হয়ে পড়ে এবং অবাঞ্ছিত ভাবে পালাতে চেষ্টা করে। স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশের মনে সন্দেহ জাগে। তার পশ্চাদ্ধাবন করে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। থানায় আসার পর সে অকপটে সমস্ত ব্যাপারটা বিবৃত করে অপরাধ স্বীকার করে নেয়। পুলিশ যোগাযোগ করে জানতে পারে যে সে দোষী নয়। টাকা তক্ষুণি ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। আইনত তারা তাকে গ্রেপ্তার করে রাখতে পারে না। কিন্তু কলকাতার সুযোগ সন্ধানী চতুর পুলিশ রমানাথকে টাকা শোধের কথা জানায় না। এবার আরম্ভ হয় ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম চাটুকার পুলিশের লীলা খেলা। বাংলায় তখন সন্ত্রাসবাদের প্রসার ঘটেছে। পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে তাদের ধরতে। কত নিরাপরাধ যুবককে মিথ্যে সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করে চলছে তাদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার। পুলিশ রমানাথকে কেন্দ্র করে একটি ষড়যন্ত্রের রূপরেখা প্রস্তুত করে। রমানাথের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলতে থাকে। তাকে বলা হয় এক সন্ত্রাসবাদী দলের বিরুদ্ধে সরকারী সাক্ষী রূপে আদালতে একটি মিথ্যে লিখিত বিবৃতি পাঠ করতে। প্রথমটা রমানাথ স্বীকার না করলেও পরে চাপে পড়ে ভয়ে সে পুলিশের পরামর্শ মত কাজ করতে স্বীকার করে। বেচারা রমানাথের বক্তব্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদী দেশ প্রেমিকদের দীর্ঘকালীন শাস্তির রায় দেন জজ। রমানাথ মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ পায় এই ঘটনায়। পুলিশ রমানাথকে নানা ভাবে লোভ দেখাতে আরম্ভ করে। সুসজ্জিত বাসভবনে তার থাকবার ব্যবস্থা হয়। চাকররূপী পুলিশ তাকে ঘিরে রাখে।

এদিকে জালপা স্বামীর খোঁজ করতে থাকে চারিদিকে। খবর পেয়ে সে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। অনেক অনুসন্ধানের পর সে রমানাথের খোঁজ পায়। গোপনে সে রমানাথকে জানিয়ে যায় যে সে নির্দোষ। রমানাথ পুলিশের দেওয়া এক গাদা গহনা নিয়ে জালপাকে দিতে যায় কিন্তু জালপা তা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। উপরন্তু জালপা এক দণ্ডপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীর বৃদ্ধামাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

স্ত্রীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে রমানাথের মনে যে আঘাত লাগে তাতে তার মন জ্বলতে থাকে। পুলিশ দ্বারা তার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত প্রেরিত এক পতিতা রমণীর সহযোগে রমানাথ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পলায়ন করে এবং স্বয়ং জজের নিকট গিয়ে সমস্ত কথা ফাঁস করে দেয়। আবার মামলা ওঠে আদালতে এবং সকল আসামীই মুক্তি পায়। গল্পটি এখানেই শেষ হয়।

এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য হলো দুটি। প্রথমটি হলো ভারতীয় নারীর গহনা প্রেম এবং দ্বিতীয় হলো উৎসব বা পালা পার্বনে আমাদের সাধ্যাতীত ব্যয় করার প্রবৃত্তি। দ্বিতীয়টির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের পরকে দেখাবার একটা হালকা মনোবৃত্তি জড়িয়ে আছে যাকে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের একটি সমস্যা বলা যায়। আমি যা নই তাই দেখাবার চিরন্তন দুর্বলতা মানুষের মনের কোনে লুক্কায়িত থাকে। তার যে কি কুফল তা বেশ সুন্দরভাবে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক। রমানাথ সেই শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি যারা স্ত্রীর কাছেও সত্যকে তুলে ধরতে ভয় পায়। মিথ্যার আশ্রয় একবার নিলে যে মানুষ কি বিপদেই পড়ে তার জ্বলন্ত উদাহরণ রমানাথ।

গবন উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাস প্রেমচন্দের অনেক উপন্যাস অপেক্ষা সুসংগঠিত এবং এতে তাঁর রচনাত্মক প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ পরিস্থিতির দাস। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। তার উত্থান-পতনের নিয়ন্তা এই পরিস্থিতি। পরিস্থিতির উর্দ্ধে উঠে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করার সাধ্য মানুষের নেই তাই রমানাথ যে মিথ্যা অহঙ্কারের বশে একটি ভুল করে বসে তাই তাকে টেনে নিয়ে যায় একের পর এক বিপদে। রমানাথের মত দুর্বল চরিত্রের মানুষের পক্ষে এই বিপদ থেকে উদ্ধার সম্ভব হতো না যদি না জালপা তাকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে আসতো।

রমানাথ মধ্যবিত্ত সমাজের এক প্রতিনিধি চরিত্র। সে তার মিথ্যাভিমানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিপদে পড়ে এবং সরকারী টাকা তছ্রূপ করতে বাধ্য হয়। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেওয়ার এই চেষ্টায় পরপর পরিস্থিতিকে সে জটিলতর করে ফেলতে থাকে। ফলে বিপদও ঘনিয়ে আসতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা একান্ত ভাবেই স্বার্থান্বেষী এবং তাই জেলে যাওয়ার ভয়ে সরকার পক্ষের হয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নিরপরাধ দেশবাসীকে দণ্ডিত

করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। রমানাথের ইচ্ছে নয় যে তাদের শাস্তি হোক তথাপি ব্যক্তিস্বার্থের মোহে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অপকর্ম করে। যখন সে জানতে পারে যে তার সাক্ষ্যের জোরেই দেশপ্রেমিকদের দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে, সে তখন মর্মাহত হয়।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই আরেক প্রতিনিধি হলেন উকিল ইন্দ্রভূষণ। তিনি সমাজ সেবা আর দেশ সেবার ধার ধারেন না। ধন উপার্জন করাই এঁদের লক্ষ্য। দিনে দিনে এঁরা কিছুটা সম্পত্তিশালীও হয়ে ওঠেন। সম্পত্তি রক্ষার জন্যেই এঁরা বিয়ে করেন। এই শ্রেণীর লোকেরা ভাল খেয়ে ভাল পরে বাঁচতে পারেন। কিন্তু এঁদের একটা নির্দিষ্ট স্বার্থান্বেষী সীমিত সমাজ আছে। তার বাইরে এঁরা যান না।

জালপা জমিদারের মোক্তারের কন্যা। সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে লালিত পালিত। মা-বাবা জানে যে মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করে তোলার দরকার নেই। পণের টাকা থাকলেই মেয়েকে বিদেয় করা এদেশে সহজসাধ্য। তাই জালপা সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। সামাজিক জ্ঞানও অত্যন্ত সীমিত। সাজপোষাক এবং গয়নাগাটির প্রতি মেয়েদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তা তার মধ্যেও বেশী পরিমাণেই আছে। এই গহনা-প্রেম অতি শৈশবেই তার ঠাকুরমা গল্পোচ্ছলে তার মনে অঙ্কুরিত করে দিয়ে গেছেন। সে প্রেম তার মনে এক স্বপ্নের জাল বিস্তার করেছে। তার এই গহনা প্রেমই মূলতঃ রমানাথের সমস্ত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ হেন জালপাই আবার যখন বুঝতে পারে সমগ্র ব্যাপারটা তখন তার চরিত্র যেন হঠাৎ চোট খাওয়া ব্যাঘ্রের মত সম্পূর্ণ ভাবেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। বহু সমালোচক জালপার এই চারিত্রিক পরিবর্তনটিকে অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যদি জালপার সঙ্গে তার বান্ধবী এবং রমানাথের কথোপকথনের ধারাটিকে আমরা বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করি তবে এ কথাটি অনুধাবন করতে আমাদের কষ্ট হয় না যে সে বুদ্ধিমতী নারী। তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির উর্দ্ধে উঠতে সক্ষম। যে চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে সমালোচকরা চমৎকৃত তার কিছুটা শাকসব্জীওয়ালা দেবীদীন এবং তার স্ত্রীর। স্বামীর দিক থেকে ঘা খেয়েও সে কিছুটা চারিত্রিক দৃঢ়তা সঞ্চয় করে।

দেবীদীন নিঃসন্দেহে এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। শাকসব্জী বিক্রী করে সে জীবন যাপন করে। সহজ সরল পথের পথিক সে তাই প্রকৃতিতে উদার।

কয়েকটি অতি উচ্চ গুণের সে অধিকারী। মানুষ মাত্রের প্রতি তার মনে অকুণ্ঠ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। সে একান্ত ভাবে ভালবাসে দেশকে। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তার দুটি সন্তান। সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছে তারা। কিন্তু দেবীদীন তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়। সে নিজেও তাই সত্যাগ্রহে এবং পিকেটিং-এ অংশ গ্রহণ করে। অহঙ্কার বলে তার মনে কিছু নেই। অশিক্ষিত হলেও সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে সর্বশ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখে। রমানাথ যখন দেবীদীনকে বলে—"তুমি বড্ড নিয়মানুবর্তী" তখন দেবীদীন দৃপ্ত কণ্ঠে বলে—যে দেশে থাকি, যার অন্নজল সেবন করি, তার জন্যে এটুকু না করলে তো জীবনটাকে ধিক্কার। দুটি জোয়ান ছেলেকে এই স্বদেশীতে অর্পণ করে দিয়েছি ভাই।

এই হ'ল দেবীদীন। ও দেশ নেতাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—বড় বড় দেশভক্তদের বিদেশী মদ ছাড়া চলেই না। ওদের ঘরে গিয়ে দেখ তো একটাও দেশী জিনিষ পাবে না। দেখাবার জন্যে দশ-বিশটা মোটা কাপড়ের জামা তৈরী করে নিয়েছে, ঘরের অবশিষ্ট সব বস্তুই বিদেশী। (পৃঃ ১৪২) রমানাথ যেদিন শেঠ করোড়ীমলজীর দানের এক কম্বল নিয়ে হাজির হয় তখন দেবীদীন অসন্তুষ্ট হয়ে বলে "শেঠজী জুট মিলের মালিক। শ্রমিকদের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার ওর মিলে করা হয় তা অন্য কোথাও হয় না। শ্রমিকদের চাবুক পেটা করা হয়। চবি মিশ্রিত ঘি বিক্রী করে ও লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছে, কোনো কর্মচারী এক মিনিট বিলম্বে এলে তক্ষুনি তার ডাক পড়ে। বছরে দু-চার হাজার টাকা দান না করলে এই পাপের টাকা হজম হবে কি করে ?" (পৃঃ ১৪৩)

দেবীদীন যেমন তার বৃদ্ধা পত্নী জগ্‌গোও তেমনি। স্বাভাবিক ভাবেই তার স্নেহশীল হৃদয় পাঠকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। নারিকেলের মত তার বাইরেটা কঠিন ও ভেতরটা স্নিগ্ধ ও কোমল। সে দেবীদীনের সুযোগ্যা পত্নী। রমানাথের মাতৃ সম্বোধন তার মনে অপার পুত্র স্নেহের বন্যা বইয়ে দেয়। জালপাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণও তারই পরিপূরক। দেবীদীনের মত সেও দেশ ও দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত। মাঝে-মাঝে যে কটুক্তি আমরা তার মুখ থেকে শুনতে পাই তা প্রেমেরই নামান্তর মাত্র। জগ্‌গোর সামনে দেবীদীন যেন ভিজে বেড়ালে পরিবর্তিত হয়। দেবীদীনের দুয়েকটি নেশার জন্যে প্রায়ই তাকে ধমক শুনতে হয়। দেবীদীন সবটাই নীরবে সহ্য

করে। এই স্বামী-স্ত্রীর অন্তরের ব্যাথা বেদনা, প্রেম ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা লেখক অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গবন উপন্যাসের দ্বারা প্রেমচন্দ তৎকালীন পুলিশী ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতাও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রকৃত অপরাধিদের গ্রেপ্তার করার কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ না করে পুলিশ অফিসাররা কিভাবে নিরপরাধ মানুষকে অপরাধী প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন তার ছবি এই উপন্যাসে প্রেমচন্দ সর্বাধিক সুন্দরভাবে এঁকেছেন। আসলে প্রেমচন্দের প্রতিটি উপন্যাসে কোন না কোন শোষক শ্রেণীর চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে এবং তারই সঙ্গে সংস্কারের উপায় নির্দেশিত করা হয়েছে। সংস্কারের এই মোহে পড়েই তিনি কখনও কখনও পাঠকের শিরঃ পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বাস্তববাদী প্রেমচন্দ মন থেকে তাঁর আদর্শটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারেন নি। তাই সময় সময় আদর্শ ও সংস্কারের এই প্রবৃত্তিটা কাহিনীকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে বাধা সৃষ্টি করে। গবনেও তাই তিনি একটি সুখী শান্তিপূর্ণ পরিবারের স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করতে ভোলেন নি। গণিকা নারী জোহরার কোন ব্যবস্থা না করতে পেরে তিনি তাকে গঙ্গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন।

(৯) **কর্মভূমি :—**

এই উপন্যাসটি লেখা হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পটভূমি মূলতঃ ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতি। তাই উপন্যাসটিকে বুঝতে হলে আমাদের সেই পটভূমি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। অতি সংক্ষেপে তারই একটা স্পষ্ট ছবি আমি এখানে তুলে ধরছি। আশা করছি এটা পাঠকদের উপন্যাসটি বুঝতে সাহায্য করবে।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতের রাজনৈতিক জীবনে কিছু কালের জন্যে নেমে আসে গতি মন্থরতা ও অবসাদ। তখন গান্ধি ইত্যাদি বড় নেতারা কারারুদ্ধ। চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের স্বরাজ্য দলও উপলব্ধি করতে পেরেছে যে আইন সভায় গোলমাল করে কোন ফল হবে না। এমন সময় ১৯২৮ সালে মহাত্মাজী মুক্তি পান এবং মুমূর্ষু রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে সকলকে আহ্বান করেন। ১৯২৮ সালে সর্বভারতীয় যুবকংগ্রেস বসে। এদিকে বিপ্লবী আন্দোলনও তীব্রতর হয়ে ওঠে। বটুকেশ্বর, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ ইত্যাদি যুবশক্তিকে সঞ্জীবিত করে তোলার জন্যে

উত্তর ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বীজ ছড়িয়ে দেন। অপরদিকে মানবেন্দ্র রায়, মুজফ্‌ফর আমেদ ও ডাঙ্গে ইত্যাদি মিলে ১৯২৫ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেন। ইংরেজ প্রভু দ্বারা প্রেরিত সাইমন কমিশন ভারতে কোন পাত্তা না পেয়ে ফিরে যায়। এমন সময় কলিকাতায় ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশন বসে। সুভাষ ও নেহরুর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বরাজের দাবি ওঠে। গান্ধিজীর দৌলতে তা দমিত হয় এবং নেহরু রিপোর্টের ভিত্তিতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবী গৃহীত হয়। অবস্থার চাপে পড়ে লর্ড আরউইন ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে গান্ধিজী বলেন **I have burnt my boat.** ১৯২৯ সালে লালা লাজপতের মৃত্যু যেন দেশে আগুন ধরিয়ে দেয়। সন্ত্রাসবাদীরা স্থানে স্থানে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ব্রিটিশ শাসক দলকে চিন্তিত করে তোলে। গান্ধিজীর পক্ষেও আর বসে থাকা সম্ভব হয় না। তিনি ১৯৩০ সালে লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্যে ডাণ্ডি অভিযান করেন। দেশের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক তখন কারারুদ্ধ অবস্থায় ফুঁসছে। ব্রিটিশ দমননীতিও চরমে ওঠে। এই সময় গান্ধিজী হিংসার জোয়ারকে বেঁধে রাখবার জন্যে আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনকারীদের শান্ত করলেন।

ভারতে এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত বলে কর্মভূমিতে আমরা প্রেমচন্দের রাজনৈতিক মতবাদের আভাস পাই। এতে আছে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ অর্থাৎ গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন যে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল তারই প্রভাবে শেঠ সমরকান্তের পুত্র অমরকান্ত বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে খদ্দর ধারণ করলো। গান্ধিজীর ডাকে চরখা চালান আরম্ভ করলো এবং জনসেবায় আত্মনিয়োগ করলো। পরিণামে পিতাপুত্রে আরম্ভ হলো মনোমালিন্য। ক্রমে এমন অবস্থা হলো যে পিতা পুত্রের স্কুলের মাইনে পর্যন্ত বন্ধ করলেন। পুত্রের সেলীম নামে ধনী বন্ধু ছিল যে তার স্কুলের মাইনে দিয়ে দিত। শৈশবেই অমরকান্ত মাতৃহারা হয়েছিল কিন্তু পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করায় তার অধিক দিন মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় নি। কিন্তু বিধাতা বিরূপ থাকাতে কয়েক বছরের মধ্যেই বিমাতারও মৃত্যু হয়। অমরকান্তকে একটি ছোট বোন তিনি উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ ভাইবোনে খুব মিল ছিল। বোনের নাম নয়না। এমতাবস্থায় পিতা সমরকান্ত পারিবারিক শূন্যতা দূর করবার জন্যে পুত্র অমরকান্তের বিবাহ দেন।

শেঠ সমরকান্ত বিষয়ী লোক। অনেক খোঁজ-খবরের পর এমন গৃহবধূ ঘরে আনলেন যে বিধবা মায়ের বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। পিতা-পুত্রের মনো-মালিন্যে বধূ সুখদা শ্বশুরের পক্ষে। সেও স্বামীর এই স্বার্থহীন দেশসেবার কাজে বিরক্ত হয়। বার বার নানা ভাবে স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে ঐ কাজের চেয়ে শ্বশুরের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে সাহায্য করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে আবার শ্বশুর মহাশয়ও শান্তি পাবেন। কিন্তু অমর নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না। সে ডাক্তার শান্তিকুমার ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গ্রাম সেবার কাজে বেরিয়ে যায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে সুখদাও খুব বিরক্ত হয়। ফলে শৈশব থেকে মাতৃ স্নেহে বঞ্চিত স্নেহের কাঙ্গাল অমরকান্ত স্ত্রীর নিকট ভালবাসা না পেয়ে সকীনা নামে এক বিধর্মী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। দুজনের অবৈধ প্রেম যত ঘনীভূত হয় গৃহকলহ ততই বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হতে থাকে। অবশেষে একদিন পিতাকে স্পষ্ট ভাষায় এ কথা জানিয়ে দেয় যে সে শুধু টাকার গোলাম হয়ে থাকতে সক্ষম নয়। অমর ঘর ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে পিতাকে বলে—"বাবা, আপনার ঘরে আমাব জীবনের এতগুলি দিন নষ্ট হয়ে গেছে, আর আমি তা নষ্ট হতে দিতে পারি না। মানুষের জীবন শুধু খাওয়া এবং মরে যাওয়ার জন্যে নয়; শুধু ধন সঞ্চয় করাও জীবনের লক্ষ্য নয়। আমি যে পরিস্থিতিতে আছি তা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এক নতুন জীবন যাপন করতে যাচ্ছি।"

অমর গৃহত্যাগ করে চামারদের এক গ্রামে গিয়ে বাস করতে থাকে। এবার গৃহত্যাগী স্বামীর জন্যে সুখদার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এত দিন যে স্ত্রী অকাজের দোহাই দিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ছাড়া কিছুই করেনি সে এখন স্বামীর পথের পথিক হওয়ার সঙ্কল্প নিল। শহরে ওর সহযোগিতায় ও প্রচেষ্টায় অস্পৃশ্যদের জন্যে নির্মাণ হয় একটি মন্দির। মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ নিষেধের প্রতিবাদে গড়া এই মন্দির অনেকের মনে আশার সঞ্চার করলো।

অপরদিকে নয়নার বিয়ে হয় ধনিরামের পুত্র মনিরামের সঙ্গে। অমর যেখানে সমাজ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে সেখানে এক সাধুবেশী জমিদার ছিল। তার অন্যায় অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৃষক জীবন হয়ে উঠছিল দুবিসহ। অমর এই জমিদারের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলে। তার নেতৃত্বে প্রজারা একতাবদ্ধ হয়ে

বিদ্রোহে যোগ দেয়। অমর গ্রেপ্তার বরণ করে। এই গ্রেপ্তারকারী হলো তার সেই বাল্যকালের বন্ধু সেলীম যে সর্ব্বোচ্চ পুলিশ অধিকারী রূপে সেখানে বদলী হয়ে এসেছিল। দুই বন্ধুর মধ্যে অতীত দিনের প্রসঙ্গ তুলে কথাবার্তা হয়, তারপর বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়। অমরের কথায় সেলীম এমন প্রভাবিত হয় যে সে নিজেই সেই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং গ্রেপ্তার বরণ করে। ক্রমশঃ আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। শহরে অস্পৃশ্যদের জন্যে বাসভবন নির্মাণের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা দলে দলে গ্রেপ্তার বরণ করতে থাকে। এই আন্দোলনের সূত্রে গ্রেপ্তার হয় সুখদা, তার বিধবা মা রেণুকাদেবী ও ডাঃ শান্তিকুমার ইত্যাদি। শেষকালে অমরের পিতা সমরও পুত্রের সঙ্গে গ্রামে এসে আন্দোলনের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেন।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে আন্দোলন সফল হয় এবং সরকার আন্দোলন-কারীদের দাবীর কাছে নত হতে বাধ্য হয়।

আগেই বলেছি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসটি। সমাজের নিপীড়িত ও অবহেলিত নীচু স্তরের মানুষের মুক্তি আন্দোলন এই গল্পের মূল উপজীব্য হলেও এতে আছে সুদখোর মহাজন, ঘুষের রাজত্ব ও কালো টাকার ব্যবসার প্রতিচ্ছবি। এতে আছে স্বার্থান্বেষী শিক্ষিত সমাজের নগ্ন ছবি, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দোষ ত্রুটি এবং জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী। মনে হয় যেন তৎকালীন পুঁতি দুর্গন্ধময় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পচন ধরে গিয়েছিল তার থেকে লেখক মুক্তি খুঁজতে চেয়েছেন। প্রশ্ন ওঠে মুক্তির বাস্তববাদী পথ কি তিনি দেখাতে সক্ষম হয়েছেন? তাঁর পথ গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের পথ। অহিংস আন্দোলনের পথ। তাই তিনি তীব্র আন্দোলনের মুখে রাশ টেনে ধরে সেই সব নিঃস্বার্থ ত্যাগী আন্দোলনকারীদের যেন হেয় করে তুলেছেন যাদের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলছিল। এখানেই লেখকের মধ্যে কিছু দুর্বলতার আভাস পাওয়া যায়। চরিত্রের বাস্তবসম্মত পরিণতিকে উপেক্ষা করে যেন তিনি কতকগুলি পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। তাই সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহির ভাব নিয়ে যে অমর আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয় তাকে দেখি সরকারের সঙ্গে আপোস মীমাংসায় তৃপ্ত হতে। আবার সুদখোর পিতার সঙ্গে সেই ঘরে ফিরে যেতে যে ঘর সে একদিন এই বলে ত্যাগ করেছিল

যে বাবা তোমার ঘরে থেকে আমার একটা জীবন-নষ্ট হয়ে গেছে। আমি আর তা নষ্ট করতে চাই না।

বিশ্বের সেই সমস্ত বৃহৎ আন্দোলন যার নেতৃত্ব দিয়েছে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ তা সীমায়িত থেকেছে শহরের চার-দেওয়ালের মধ্যে। আর যখন সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে গ্রামে-গঞ্জে তখনই স্বার্থান্বেষী নেতৃত্ব হাত গুটিয়ে নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্দোলনকে দমন করতে পশ্চাৎপদ হয় নি। আলোচ্য উপন্যাসেও ডাঃ শান্তিকুমার, অমর, সেলীম, শেঠ সমরকান্ত এবং ধনিরামের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রেণীমুক্তি আন্দোলন যখন তীব্রতম হয়ে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে তখনি নেতৃবৃন্দ সরকারের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলেন। এ যেন ১৯৩০ সালের সেই আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি যার পরিণতি লাভ করে গান্ধী-আরউইন সন্ধিতে।

এখানে আরেকটা প্রশ্ন জাগে মনে। গান্ধীজী কি সমাজে হরিজনদের উপযুক্ত আসন দেওয়ার জন্যই আন্দোলন করেছেন? কিছুটা তাই। প্রেমচন্দ কিন্তু তাদের শোষণ ও আর্থিক মুক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন বেশী। শুধু উচ্চাসনে বসিয়ে কি হরিজনদের উদ্ধার করা সম্ভব? এটা প্রেমচন্দ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে নিম্ন জাতির মানুষের উন্নতির পথে সর্বাধিক বড় বাধা তাদের দারিদ্র্য। দারিদ্র্য থেকে মুক্ত না হলে কিছুতেই তাদের উন্নতি সম্ভব নয়। সমাজে উচ্চবর্ণের সঙ্গে একাসনে বসবার আর মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেলেই কি হরিজন উদ্ধার সম্ভব! এখানেই গান্ধীজীর পথ যেন তিনি সংশোধন করতে চেয়েছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সত্যাগ্রহের পথে যেন আস্থা রাখতে পারেন নি তাই বলেছেন—এতে শত শত গৃহ ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কোনো কিছু ফল পাওয়া যায় না। তবে পথ কি? "আমাদের প্রজার মধ্যে জাগৃতি ও সংস্কার সাধন করতে হবে। আমাদের সমস্ত শক্তি জাতির আত্মাকে জাগিয়ে তোলার কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিৎ।"

(১০) গোদান—(১৯৩৬ খ্রীঃ)

প্রেমচন্দের সাহিত্য প্রতিভার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল 'গোদান'। সত্যি বলতে কি গোদান হিন্দী উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারি পদক্ষেপ। প্রেমচন্দের ইতিপূর্বের প্রায় সমস্ত উপন্যাসে নানা প্রকারের দুর্বলতা দেখা যায়।

মনে হয় 'গোদানে' এসে তিনি সেই সকল দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর অবাস্তব আদর্শ যেন তাঁর ভাবপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। গোদানে তিনি যেন আদর্শের বাঁধনকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। গোদানকে তাই ভারতীয় কৃষক জীবনের মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া হয়।

হোরী এক সাধারণ কৃষক। সংসারে আছে ধনিয়া তার স্ত্রী, পুত্র গোবর এবং দুই কন্যা সোনা ও রূপা। হোরীর ছেলে মেয়েদের নামকরণের মধ্যেও আমরা ভারতীয় কৃষক সমাজের সহজ সারল্যের আভাস খুঁজে পাই যা অন্যত্র দুর্লভ। হোরীর আছে আরও দুভাই শোভা ও হীরা। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে যথারীতি ধরে ভাঙন। সম্মিলিত পরিবারের সম্পত্তির মোটামুটি আয়ে চলে যেত সংসারটা। কিন্তু ভাগাভাগী হয়ে যাওয়ার পর আর সেই স্বচ্ছলতা রইলো না। পরিশ্রমী হোরী অনন্যোপায় হয়ে জমিদার অমরপাল সিং এর দ্বারস্থ হয়। দু-চার দিন পরপর ও জমিদারকে সেলাম ঠুকতে যায়। একদিন হঠাৎ যাতায়াতের পথে ভোলার ওখানে একটি গরু দেখে ওর মনেও গরু পোষার ইচ্ছে জাগে। ভোলা বিপত্নীক। তাকে দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে হোরী নিয়ে আসে গরুটা। নিখরচায় হোরী ভোলাকে কিছু পরিমাণে ভুষিও দেয়। কিন্তু এই লেনদেনের মধ্যে গোবর ভোলার বিধবা কন্যা ঝুনিয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়। মুগ্ধ ঝুনিয়াও হয় গোবরকে দেখে। এদিকে আরো একটি ঘটনা ঘটে। হোরী চায় কিছু বাঁশ বেচতে। কিন্তু ভাই হীরার বৌ প্রতিবাদ জানায়। হোরীর গরু দেখতে আসে গ্রামের সবাই। আসেনা কেবল হীরা ও তার বৌ পুনিয়া। হোরীর গরু দেখে হীরার মনে জাগে অকারণ ঈর্ষা। সেই ঈর্ষাই পরিবর্তিত হয় জিঘাংসায়। একদিন সে চুপিসারে গরুটিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। হোরীর বৌ ধনিয়া হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়। পুলিশে খবর যায় চৌকিদার মারফত। পুলিশ আসে কিন্তু বংশ মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে হোরী ধার করে দারোগাবাবুকে ঘুষ দিয়ে ব্যাপারটা আপোষে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তবে ধনিয়া মাঝে পড়ে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় স্বামীকে দুদিক দিয়ে রক্ষা করে। বেচারা দারোগা ও গ্রামের নেতারা যেন চুপসে যায়। শত কষ্টেও হোরী হৃদয়ের বিশালতা ও ঔদার্য ত্যাগ করে না। দিনে দিনে তার অবস্থা খারাপ হয়ে আসে। আগুনে ঘৃতাহুতির মত এমনি সময় পঞ্চায়েত তার ছেলে গোবরের বিরুদ্ধে

অবৈধ প্রেমের অভিযোগে হোরীর ওপর ১০০ টাকা নগদ এবং ৩০ মন গমের জরিমানা করে। সে রাতেই নববধূ ঝুনিয়া একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। ভাগ্যাহত হোরী ঝিঙ্গুরী সিং এর হাতে জামিন রেখে ৮০টি টাকা এবং কিছু গম নিয়ে পঞ্চায়েতের জরিমানা শোধ করে দেয়। এমনি করে হোরী মহাজনদের হাতে নিজেকে বিকিয়ে দিতে থাকে। ছেলে গোবর গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মজুরীর আশায়। লখনউ শহরে এসে সে কাজও পেয়ে যায়। হোরী ততদিনে মহাজনদের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়। নিজের এই চরম অবস্থায়ও হোরী ভাইয়ের স্ত্রী পুনিয়াকে সাহায্য করতে যাবে। ভোলাও টাকার জন্তে তাগাদা করতে থাকে। যখন কিছুতেই কিছু হয় না তখন সকলের বারণ করা সত্ত্বেও সে হোরীর ওখান থেকে বলদ খুলে নিয়ে যায়। কৃষক হোরী এবার কৃষিমজুরে পরিণত হয়। সে দাতাদীনের সঙ্গে ভাগচাষী হয়ে কাজ করতে সম্মত হয়। মাঠে যখন আখের সুন্দর ফসল দেখে দেখে হোরীর মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হচ্ছিল তখন হঠাৎ ঝিঙ্গুরী ও নোখেরাম উপস্থিত হয় যমের মত এবং আখের সম্পূর্ণ টাকাই তারা আদায় করে নিয়ে যায়। এবং সে শুধুই খেটে খাওয়া দীনমজুরে পরিবর্তিত হয়। হোরী দাতাদীনের চাকর হয়ে যায়। ওরই সঙ্গে স্ত্রী ধনিয়া। কন্যা সোনা রূপাও মজুরী করা আরম্ভ করে বেঁচে থাকার তাগিদে। সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও দু-বেলা অন্ন জোটান ভার হয়ে পড়ে। এমনি সময় লু লেগে হোরী অসুস্থ হয়ে পড়ে। হঠাৎ গোবর সস্ত্রীক গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। শহরে হাওয়ায় থেকে গোবর আর সেই আগেকার গোবর নেই। গ্রামে এসেই সে পুরোনো প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। বলদ দুটি ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বৃদ্ধ ও দুর্বল পিতাকে অধিকতর ব্যবহারিক হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু জন্মগত ঔদার্য ও সারল্য সে পরিত্যাগ করতে পারে না। ফলে গোবর বৌকে নিয়ে শহরে ফিরে যায়। এদিকে সোনা ও রূপার বয়স বাড়তে থাকে। বিয়ে না দিলেই নয়। তাই নোহরী এবং দুলারীর নিকট টাকা ধার নিয়ে বড় মেয়ে সোনার বিয়ে দেয় মথুরার এক কৃষকের ছেলের সঙ্গে। ঋণের বোঝায় ও পাওনাদারদের তাগাদায় বেচারা হোরীর কোমর ভেঙে আসে। বার্ধক্যের চাপে যেন তার মন হাহাকার করে ওঠে। এমন সময় আবার পুত্র গোবর গ্রামে ফিরে আসে। ফিরে আসে হোরীর সহোদর হীরা ও তার স্ত্রী শোভা। হোরীর করুণ অবস্থা দেখে

সকলের মনে জাগে গভীর সহানুভূতি। কিন্তু হোরী সেই পূর্বের হোরীই। চরম দারিদ্র্যও তার মনের বিশালতা এবং ঔদার্য দমন করতে পারে না। না, জীবন যুদ্ধে পরাজয়ের কোন গ্লানি তার মনে নেই। সে যেন আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এ হেন দুর্বল অবস্থায় সে আবার মজুরী করতে যায়। প্রচণ্ড তাপে আবার সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হোরীর গরু কেনার বাসনা আর বোধ হয় এ জীবনে পূরণ হবে না। শয্যা পাশে ধনিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে। ক্রমশঃ যেন হোরীর দৃষ্টি নিভে আসে, নিভে আসে জীবনযুদ্ধের এক অপরাজেয় যোদ্ধার চোখের আলো। হীরা বৌদিকে বলে "বৌদি মনকে শক্ত কর। গোদান করিয়ে দাও, দাদা চললো।" ধনিয়া সেদিনের অর্জিত পাঁচসিকি পয়সা স্বামীর হাতে দিয়ে মহাজন দাতাদীনকে বলে—"মহারাজ, ঘরে গরু নেই, বাছুর নেই, পয়সাও নেই। এই কয়েক আনা পয়সা আছে, এই ওঁর গোদান।" বলেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল। স্বভাবতই উপন্যাসের সমাপ্তি অতি করুণ ও বেদনাময়।

কিন্তু এই মূল কাহিনীর সঙ্গে আরেকটি প্রাসঙ্গিক শহুরে গল্পও আছে যার মূল পাত্রের মধ্যে আছে মিল মালিক খান্না, প্রোফেসর মেহেতা, লেডী ডাক্তার মালতী, সম্পাদক ওঙ্কারনাথ, বীমা কোম্পানীর দালাল মিঃ তন্খা, এবং মির্জা সাহেব। রামলীলার সময় এক আসরে জমায়েতের সূত্রে এদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয়। এঁরা সবাই উচ্চ মধ্যবিত্ত বা বিত্তশালী সমাজের সদস্য। বুদ্ধিজীবিও বটে, তাই দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সমস্যা নিয়ে এঁরা তর্কবিতর্ক করেন। এঁরা সকলে নিজ নিজ শ্রেণীর প্রবক্তা রূপে চিত্রিত হয়েছেন। এঁদের রসিকতার কেন্দ্রবিন্দু হলেন মির্জা সাহেব। এঁদের কেউ বা নিজেকে শিকারী বলে জাহির করতে চান আবার কেউবা অভিনেতা। মাঝে মাঝে অন্যান্য খেলাও খেলতে এঁরা ভালবাসেন। মিষ্টার মেহ্‌তা ও মালতী শিকার পার্টিতে গিয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। মালতী আধুনিকা নারী, ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন। মিঃ খান্না অতি রসিক ব্যক্তি তাই স্ত্রী গোবিন্দীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বনে না। মালতী তাঁর ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খান্না এই চেষ্টায় কৃতকার্য হন না। মিল মালিক হওয়াতে তাঁর দৃষ্টি সর্বদাই উপার্জনমুখী। ব্যবসায়িক স্বার্থ খুঁজে বেড়ান তাঁর বড় নেশা। তাঁর মিলে ধর্মঘটের সময় তিনি দমননীতির আশ্রয় নেন কিন্তু যখন তাঁর মিলে আগুন

ধরে সব নষ্ট হয়ে যায় তখন তিনি তাঁর পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন করেন। অপর দিকে মেহতা ও মালতীর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। যদিও জীবন সম্পর্কে দুজনের ধারণার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে তবু তাঁরা নৈকট্য লাভ করে তৃপ্ত হন এবং বিবাহ বন্ধনে না বেঁধে একত্রে সমাজ কল্যাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আর্তের সেবা এবং দীনের সাহায্য এই মহান ব্রত নিয়ে এঁরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রচার করতে থাকেন।

প্রেমচন্দ এই বৃহৎ এবং সর্বশেষ উপন্যাসে ভারতের কৃষক সমাজের যে দৈন্য দশা ও অসহায় অবস্থার ছবি এঁকেছেন তা সত্যি অসাধারণ। সম্ভবতঃ এর আগে এ ধরণের দরিদ্র্য নিপীড়িত কৃষক কুলের বাস্তবভিত্তিক উপন্যাস ভারতের কোনও ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নি। প্রেমচন্দ নিজের জীবনেই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। সমাজের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের হৃদয়ের হাহাকার নিজের কানে শুনেছেন ও দেখেছেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁকে চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে; সাহায্য করেছে অভিজ্ঞতালব্ধ চরিত্র বিন্যাসেও। হোরী কৃষক সমাজের প্রতীক। তার জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ভারতের প্রতিটি কৃষকের দুঃখ-কষ্ট ব্যথা বেদনা। ভারতের কৃষক জীবনের একমাত্র সত্য হলো দুঃখ, শোষণ এবং নিপীড়ন। কৃষক হোরীর জীবনেরও একমাত্র সত্য হলো দুঃখ, শোষণ এবং নিপীড়ন। কৃষক হোরীর জীবনালেখ্য চিত্রণের সময় কোন খেলো ভাবাদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন নি। পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে চিন্তার যে দৈন্য প্রকট হয়ে ওঠে তা এখানে অনুপস্থিত। কথায় কথায় স্বভাব ও চরিত্র পরিবর্তনের যে রীতি আমরা প্রেমচন্দের পূর্ববর্তী উপন্যাসে পাই তা এখানে নেই। এখানে যেন চরিত্রগুলি মাটি থেকে তুলে আনা হয়েছে। প্রেমচন্দ এ উপন্যাসে বিশুদ্ধ বাস্তবভিত্তিক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। কৃষক হোরীর যেন সুখের দিন চলে গেছে, এসেছে দুঃখের দিন, সর্বনাশের দিন। জীবন ধারণের তাগিদে সে কৃষক থেকে নিজেকে কৃষিশ্রমিকের স্তরে নামিয়ে আনে —আশা এইটুকুই যে দুটি খেয়ে পরে যেন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু যে কৃষক একবার সুদখোর মহাজনের ফাঁদে পা দেয় সে কি কখনও পুনরায় জীবনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে? না। তাই হোরীও পারে নি। ঘরের দোরে গরু বলদ বাঁধা থাকবে এ স্বপ্ন তাই স্বপ্নই থেকে গেছে। তার স্বপ্ন কোন বড় আশা আকাঙ্ক্ষার ওপর নিভর করে নেই। একটি গ্রাম্য

কৃষক, বিশেষ করে ভারতের মত একটি দরিদ্র দেশের কৃষক চেয়েছিল নিজের পাঁচ সাত বিঘে চাষের জমি থাকবে, নিজের বলদ ও হাল থাকবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করবে, ফসল ফলবে, গোলায় ধান উঠবে, দীন দুখীদের দুমুঠো দান ধ্যান করে বেঁচে বর্তে থাকবে। কিন্তু তার এই ক্ষুদ্র আশাও পূর্ণ হয় না। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে সে এই সমাজ থেকে বিদায় নেয়। হোরী শেষ নিঃশ্বাস নেয়, স্ত্রী ধনিয়া অচৈতন্য হয়ে পড়ে। গ্রাম্য সমাজের গণ্ডে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে হোরী বলে যায় এ ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারে না। এ ঘুণ ধরা সমাজে সচ্চরিত্র মানুষের ঠাঁই নেই।

গোদানে গ্রাম্য জীবনের সাথে সাথে তারই সমান্তরালে চলেছে আর একটি শহুরে কাহিনী মেহতা, মালতী এবং খান্নাকে নিয়ে। কলকারখানার মালিক, কালো টাকার মালিক মসনদের উপর উপবিষ্ট পুঁজিপতি খান্না সাহেব, জমিদার অমর পাল, স্বার্থান্বেষী সাংবাদিক ওঙ্কারনাথ এঁরা সকলে এক একটি শ্রেণীর এক এক জন প্রতিনিধি। এঁরা সবাই বড় বড় ন্যায়নীতিবিদদের মতন বড় বড় কথা বলেন, মানবিকতার দোহাই পেড়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করেন এবং গরীব জনতার রক্ত শোষণ করে আনন্দ লাভ করেন। এঁদের পথ ভিন্ন কিন্তু জাত এক, উদ্দেশ্য এক। এ দের ক্যাশবাক্স ভরে তোলে বুভুক্ষু কৃষক ও শ্রমিকের দল। তাই হোরী ও ধনিয়ার গল্পের পাশাপাশি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র বিন্যাসের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। গরীবের কুঁড়ের পাশাপাশি একটি উদ্যানবাটির বর্ণনা যেমন সমাজের দুই প্রান্তের দুটি ছবিকে অধিকতর বাস্তবমুখী করে তোলে তেমনি প্রেমচন্দ যে ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন তা অপেক্ষাকৃত ফলপ্রসূ হয়েছে এই দুই ভিন্নমুখী ছবিতে। চিনি মিলের মালিকের বাস্তব চরিত্রটা কি আমাদের অগোচরেই থেকে যেত না যদি না লেখক আখ কেনার রহস্যজনক ব্যাপারটা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেন।

কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হোরী ও ধনিয়া সাধারণ কৃষকের মতই দোষে-গুণে মানুষ। গ্রাম্য কৃষিজীবি হোরী অভাব অনটনে দিন যাপন করে। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে কখনও কখনও সে নিজের উদার হৃদয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু সহস্র চাপে পড়েও সে বংশ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে প্রস্তুত নয়। এরই জন্যে সে ভাইয়ের দ্বারা কৃত অপরাধ নীরবে হজম করে। কপর্দকশূন্য হয়েও ধার করে দারোগাকে ঘুষ দিতে যায়। অপরের

বিপদে আপদেসে সর্বদাই সহানুভূতিহীন। তাই স্বাভাবিক ভাবে হোরী আমাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওর দুঃখে কষ্টে, বিপদে আপদে আমাদেরও মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে প্রেমচন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপতরায়ের একটি কথা উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেছেন যে হোরীর মাধ্যমে বাবা নিজের ব্যক্তিত্বই অঙ্কিত করেছেন।

পূর্বেই বলেছি যে গোদান সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা। অন্যান্য উপন্যাসের মত তিনি এই গল্পে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত দেন নি। তাঁর কোন আদর্শের দ্বারা গল্পটিকে প্রভাবিত না করে সহজ সাবলীল গতিতে এগোতে দিয়েছেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে হোরী ও তার পরিবারের গতি প্রকৃতি র্ধাবিত হয়েছে। তাই তার দুর্দশার জন্যে সে নিজেও অনেকটা দোষী। তথাপি হোরী ব্যক্তিত্বহীন নয়। এটা ঠিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সে কখনও রুখে দাঁড়াতে পারে নি যার জন্যে সে ভাগ্যের হাতের পুতুল হয়ে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এগিয়েছে। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে সে জ্ঞানার্জন করেছে। একবার হোরীকে আমরা ক্রুদ্ধ হতে দেখি যখন ধনিয়া রাত্রে এসে তাকে খবর দেয় যে তার পুত্র গোবরের সন্তান গর্ভে নিয়ে ঝুনিয়া শ্বশুরালয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছে। ক্ষণিক উত্তেজনাবশে হোরী ক্রোধে ফেটে পড়ে ধনিয়াকে বলে ওকে দূর করে দেবো। কিন্তু সেই ঝুনিয়াই যখন তার পায়ে এসে পড়ে তখন স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলে—ভয় পাস না, ভয় পাস না, তোর ঘর দোর আছে, তোর আমরা আছি, আরাম করে থাক। কিন্তু ঝুনিয়াকে এই আশ্রয় দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজ রক্ষকদের দল তার ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করে তা সে নীরবে সহ্য করে কিন্তু তাকে ঘর থেকে বিতাড়িত করে মুক্তি নেয় না। ঝুনিয়ার প্রতি তার ব্যবহার স্নেহময় পিতার ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভাইরা শত্রুতা করলেও হোরীর মনে তাদের প্রতি স্নেহমমতায় টান পড়ে না। ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে সে তার বৌকে সাহায্য করে। দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, সহজ সারল্য এবং হৃদয়ের বিশালতা থাকলেও হোরী মাঝে মাঝে স্বার্থপরের মত কাজ করে। ছোট মোট মিথ্যা বলে কাজ হাসিল করতেও সে পিছপা হয় না। আসলে হোরী তো দেবতা নয়, সে দোষে গুণে মানুষ, অতি সাধারণ মানুষ যার জীবিকা কৃষি। কৃষক জীবনের প্রতিনিধি সে। তাই কৃষকের বাস্তব জীবন ফুটে উঠেছে তার জীবনের মাধ্যমে।

শোষণের চক্রটিরও সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন প্রেমচন্দ গোদানে। শোষণ যে কত ভাবে করা যায়, শোষক যে কত প্রকারের হয়, তারা যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তার কিছুটা এ উপন্যাসে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। হোরীর গ্রামের মহাজনরূপী শোষকের মধ্যে আছে দাতাদীন, ঝিঙুরী সিং, লালা পটেশ্বরী, দুলারী ইত্যাদি। এদের মধ্যে ঝিঙুরীর স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন—"তিনি পাকা কাগজ লেখান, আলাদা সেলামী নেন, দস্তরী নেন, ষ্ট্যাম্পের দাম নেন আর সবশেষে লেখার মজুরী নেন। এক বছরের সুদ আগেই কেটে নেন। পঁচিশ টাকার কাগজ লেখালে মোট সতেরো টাকা হাতে দেন।" দাতাদীন ও লালা পটেশ্বরীর সুদের হার কিছুটা বেশী কাজেই মূল সুদে-আসলে মিলে দ্বিগুণ, তিনগুণ, বা চারগুণ হতে দেরী হতো না। দুলারীর আসল ব্যবসা হলো মুদিখানার। মানুষের দরকারে, বিপদে আপদে একবার ধারে মাল গছাতে পারলেই হলো। পাকা হিসেবী। এ ছাড়া আছে জমিদার ও তিলকধারী ও ধর্মের ভেক ধারীর দল। এদের নানা ধরনের অত্যাচার গোদানে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রেমচন্দের মনে পঞ্চায়েতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তাই পঞ্চায়েতের আদেশকে তিনি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে ধরেছেন। গ্রাম্য সমাজে থাকতে হলেঁ দশের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হয় তাই পালা পার্বনে, বিভিন্ন সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে সে পরোক্ষে শোষিত হয়। পয়সা থাকলে সমাজের ওপর ওয়ালাদের অপরাধ লোকে দেখেও দেখে না। কিন্তু সেই অপরাধই যদি কোন গরীব কৃষক ভুল ক্রমেও করে বসে তার আর রক্ষা নেই। সমাজচ্যুত হতে হয়, না হলে অর্থদণ্ড দিয়ে মুক্তি পেতে হয়। দাতাদীন অবৈধ প্রেম করলে তাদের এক ঘরে করার ধমক দেওয়া হয়, জরিমানা করা হয়। এ হলো শোষণেরই নামান্তর মাত্র।

গোদানে লেখক একদিকে হোরী এবং কৃষক অধ্যুষিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবন সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন অপরদিকে শহরে সভ্যতার প্রতিভূ মালতী আর মাধবী ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের বিলাসবহুল চাকচিক্যময় জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। একদিকে কেবল অভাব, দারিদ্র্য, শোচনীয় বঞ্চনা ও অন্তলস্পর্শী হাহাকার; অপরদিকে শিকার, সিনেমা, থিয়েটার, পার্টি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আমোদ-প্রমোদের হাজার আয়োজন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসার শূন্যতার প্রকৃত স্বরূপটিকে।

(১১) মঙ্গলসূত্র—

প্রেমচন্দের শেষ উপন্যাস "মঙ্গলসূত্র" অসম্পূর্ণ থেকে যায়। "প্রেমচন্দ স্মৃতি"তে এই উপন্যাসটির অসম্পূর্ণ অংশটি প্রকাশিত হয়। এতে আছে দেবকুমার নামে এক উদার লেখক ও তার দুই পুত্রের কাহিনী। পুত্র সন্তকুমার উকিল ও কনিষ্ট সাধুকুমার বি এ পাশ করা একটি উদারমনা বাইশ বছরের যুবক যে একজন বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়। কনিষ্ঠতম সন্তান পঙ্কজার বিবাহের জন্মে স্ত্রীর হাতে ৫০০০ টাকা তুলে দিয়ে তিনি সংসার জীবন থেকে মুক্তি চেয়ে নেন। প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসাবে দেবকুমার যদি চাইতেন সঞ্চয়ের খাতায় কোন একটি মানানসই অঙ্ক বসিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু নিঃস্পৃহ দেবকুমার সেদিক দিয়ে কখনো ভাবেন নি। খেয়ে-পরে সংসার খরচ থেকে যা অবশিষ্ট থাকতো তার অধিকাংশ ব্যয় হতো চাঁদা ও দানের খাতায়। বিষয়-আশয় ও সম্পত্তি রক্ষার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তির আশায় তিনি লক্ষাধিক টাকার পৈত্রিক সম্পত্তি তুলে দেন অপরের হাতে মাত্র কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে। পুত্র উকিল সন্তকুমার এই হস্তান্তর অবৈধ প্রমাণ করার চেষ্টায় ব্রতী হয় কতিপয় বন্ধু-বান্ধবদের কুট মন্ত্রণায়।

সন্তকুমার আদালতের খরচপত্রের জন্মে ধনীর দুলালী স্ত্রী পুষ্পার নিকট পিতার কাছ থেকে কয়েক সহস্র টাকা ধার নিতে বলে কিন্তু স্ত্রী তাতে সম্মতি দিতে চায় না। ফলে সে অবৈধ প্রেমের লীলাখেলায় মেতে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার চেষ্টায় ব্রতী হয়।

উদার পিতাকে সৎপথ থেকে না সরিয়ে আনতে পেরে সন্তকুমার অন্য পথ ধরেন। এমন কি পিতাকে উন্মাদ প্রমাণ করার ষড়যন্ত্র করতেও সে পিছপা নয়। এমন যখন অবস্থা তখন দেবকুমার সেই ক্রেতার নিকট গিয়ে মিষ্টি কথায় সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতে চান। কিন্তু মুখের ওপর কটু উত্তর শুনে তিনি জলে ওঠেন। ফিরে আসেন বাড়িতে। পুত্রের দ্বারা প্রস্তুত আদালতের কাগজে সই করে দেন।

…কিন্তু এখানেই এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি শেষ হয়। লেখক দেবকুমারের চরিত্রটীর যে ইঙ্গিত আমরা এই উপন্যাসে পেয়েছি তা অনেকটা প্রেমচন্দের নিজের চরিত্রটির প্রতিচ্ছবি বা অনুকৃতি বলেই মনে হয়। অসম্পূর্ণ এই উপন্যাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করাই বিধেয়।

———

(খ) ছোটগল্প

প্রেমচন্দ প্রায় তিনশত গল্প লিখেছিলেন সেগুলির অধিকাংশ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশেষে তাঁর প্রায় সমস্ত কাহিনীই "মান-সরোবর" নামক গল্প সঙ্কলনের আটটি খণ্ডে বেনারস থেকে সরস্বতী প্রেস দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রেমচন্দের গল্প বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে লেখা। তাঁর অধিকাংশ গল্পই সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক; আবার কিছু মানবেতর জীব বিশেষকে কেন্দ্র করেও লেখা হয়েছে। কিন্তু মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, প্রেম ভালবাসাকে কেন্দ্র করে তাঁর গল্পে যে অসংখ্য ভারতীয় সামাজিক সমস্যাকে তিনি রূপায়িত করেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। অনেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রেমচন্দের তুলনা করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে এই দুই মহান কথাশিল্পীর প্রতিপাদ্য বিষয় এক নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য বা উপজীব্য পাত্র-পাত্রীও এক নয়। প্রেমচন্দ মূলতঃ গ্রাম্যসমাজের সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে এগিয়েছেন। গরীব দুঃখী অশিক্ষিত চাষী ক্ষেত মজুর এবং তাঁদের কুঁড়ে ঘরে আবদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন নারী সমাজকে নিয়েই তাঁর চিন্তা ভাবনা আবর্তিত হয়েছে। নিম্নজাতির সামাজিক সমস্যাগুলিই তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পাত্র-পাত্রীদের অধিকাংশই শিক্ষিত, পরিমার্জিত, পরিশীলিত মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের সদস্য। তাঁদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, প্রেম-ভালবাসা ও সমস্যাই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে, উপন্যাসে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে উভয়েই একচ্ছত্র সম্রাট। এখানে বাঙালী পাঠকদের একটি খবর পরিবেশন করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না এবং বোধ হয় তা অপ্রাসঙ্গিকও হবে না। প্রেমচন্দ একবার "সপ্তসরোজ" নামে তাঁর এক গল্প সঙ্কলনের ভূমিকা লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র তার উত্তরে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে লেখেন, "বাংলা ভাষায় রবিবাবু ব্যতীত আর কেউ এমন লেখা লিখতে পারবে না। আপনার গল্প সংগ্রহের ভূমিকা লেখার যোগ্যতা আর যারই থাক, অন্ততঃ আমার নেই।"

সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা প্রেমচন্দের গল্পগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগে পড়ে সেইসব গল্প যেগুলিতে তিনি নানা সামাজিক সমস্যা ও পরিস্থিতি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

যথা, **'পুস কী রাত', 'ঈদগাহ', 'গরীব কী হায়', 'কফন', 'সদগতি'**, **'ঠাকুর কা কুআঁ', 'নরক কা মার্গ'** প্রভৃতি। দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে সেই সব গল্প যেগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তৎকালীন, রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে লেখা যথা, **'রাণী সারন্ধা', 'রাজা হরদৌল', 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', 'যুদ্ধযাত্রা', 'জুলুস', 'য়হী মেরী মাতৃভুমি হায়', 'পশু সে মনুষ্য', 'সমরযাত্রা', 'মর্যাদা কী বেদী', 'জুগন্নু কী চমক', 'রাজ্য-ভক্ত'**, ইত্যাদি। রাজপুত ও মারাঠা জাতির দেশপ্রেম, রাজপুত নারীর জহরব্রত, শরণাগতদের রক্ষার্থে প্রাণদান, রণে ভঙ্গ দিয়ে আসা স্বামীকে স্ত্রী দ্বারা ব্যঙ্গ করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা এই গল্পগুলির মাধ্যমে প্রেমচন্দ চেয়েছিলেন তৎকালীন ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে। তবে প্রেমচন্দ ঐতিহাসিক গল্পলেখক হিসেবে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন নি যদিও তাঁর গল্প সঙ্কলন "সোজে ওয়তন" ও "সমরযাত্রা" নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

সামাজিক গল্পের মধ্যে বোধহয় তিনি ভারতের সামাজিক সমস্যার কোন কিছুই বাদ দেন নি। দারিদ্র্য, শোষণ, ধর্মের নামে ভাঁড়ামি, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্যায়, অত্যাচার, আলস্য, কর্ম্মবিমুখতা প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে বাল বিবাহ, অসম বিবাহ, বৈধব্য, যৌতুক প্রথা, পর্দা প্রথা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি কোনও বিষয়ই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। প্রেমচন্দ রচিত কয়েকটি অসাধারণ গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হলো।

"বুঢ়ী কাকী" গল্পে মনোবিজ্ঞানের একটি জটিল সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গল্পটি প্রেমচন্দ আরম্ভই করেছেন এই বলে যে বার্ধক্য অনেক সময় বাল্যকালের পুনরাগমন। ভ্রাতুষ্পুত্র স্ত্রীর প্ররোচনায় মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধা কাকীর সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করেছিল। বুড়ি ছিল কিছু ভোজন বিলাসী, ভালমন্দ খেতে ভালবাসতো, বলা যায় একটু লোভও ছিল। সেই বাড়িতে এক নাতির বিয়ের রান্না হচ্ছে। বুড়ি তারই গন্ধে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে লুচি ভাজার জায়গায় গিয়ে বসে। বৌ দেখতে পেয়ে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। অনেকক্ষণ চুপটি করে থেকে আর না পেরে বুড়ি আবার বেরিয়ে আসে তার ঘর থেকে। তখনও চলছিল নিমন্ত্রিতদের ভোজনপর্ব। ক্রুদ্ধ দেবরপুত্র মুহূর্তে বুড়িকে টেনে-হিচড়ে নিয়ে গিয়ে তার কুঠুরিতে চালের বস্তার মত করে ফেলে দেয়। সে

জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। যখন জ্ঞান ফেরে তখন অনেক রাত। ছোট নাতনি চুপি চুপি নিজের খাবারের কিছু অংশ নিয়ে আসে দাদীর জন্যে। মুহূর্তে তা ভক্ষণ করে নাতনির হাত ধরে বুড়ি বেরিয়ে আসে বাইরে। নিমন্ত্রিতদের ফেলে যাওয়া উচ্ছিষ্টের ওপর লুব্ধ দৃষ্টি পড়তেই বুড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। লেখকের ভাষায় বলি—"দীন ক্ষুধাতুর, হৃতজ্ঞান বৃদ্ধা পাতা থেকে বেছে বেছে লুচির টুকরোগুলি খেতে থাকে। আহা কী স্বাদ। দইটা কী মিষ্টি, কচুরি কত খাস্তা আর নরম। এমন সময় বাড়ির বৌ রূপা সেখানে এসে উপস্থিত হয়। এই মর্মান্তিক দৃশ্য নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানে তার বুকে। ভাবে—"হায়! কি নিষ্ঠুর আমি। যার সম্পত্তি থেকে আমার দু'শ টাকা আয় হচ্ছে, তার এই দুর্গতি। আর আমার জন্যে!" অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সে থালা সাজিয়ে বৃদ্ধার সামনে রাখে। শিশুরা যেমন মণ্ডামিঠাই পেলে মায়ের সব তিরস্কার ভুলে যায়, তেমনি বৃদ্ধা কাকী মুহূর্তে সব অনাদর, অবজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে ভোজন করতে থাকে। বৃদ্ধার যে লোভাতুর ছবি **প্রেমচন্দ** এঁকেছেন তা অসাধারণ। আবার রূপার মনের পরিবর্তনও লক্ষনীয়। একটি মর্মান্তিক দৃশ্য তার মনে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। কৃতকর্মের জন্য সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছিল।

'বড়ে ভাই সাহব', 'বড়ে ঘরকী বেটি', 'অলগোঝা' প্রভৃতি গল্পেও তিনি পাত্র পাত্রীদের মনোবিশ্লেষণকারী পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। **'বড়ে ভাই সাহব'** গল্পে দাদার কড়া শাসনকে উপলক্ষ্য করে প্রেমচন্দ ছোট ভাই এর প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যবোধের একটি অপরূপ ছবি এঁকেছেন। যৌবনের ধর্মকে তিনি অস্বীকার না করেও এক অগ্রজের দায়িত্ববোধকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যই বৈচিত্র্য-পূর্ণ। বড় ভাই ছোট ভাই অপেক্ষা কয়েক ক্লাস উঁচুতে পড়ে। ছোট ভাইকে লেখাপড়া সম্পর্কে নানা উপদেশ দেয়। নিজে অধ্যবসায়ের নমুনা উপস্থাপিত করবার জন্য সব সময় বই নিয়ে বসে থাকে। পরীক্ষার দিন-গুলিতেও নিয়মানুবর্তিতার এক চরম উদাহরণ প্রস্তুত করে বড় ছোটকে তার নির্দেশে চলতে বাধ্য করে। একদিন এক কেটে যাওয়া ঘুড়ি ধরতে গিয়ে ছোট ভাই একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় দাদার হাতে। দাদা ভাইকে অনেক করে বোঝায়, বহু বড় বড় উদাহরণ দিয়ে এ সব ছোট জাতের ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি ধরবার নিম্নস্তরের প্রতিযোগিতায় যেতে বারণ করে। বলে—

আমি জীবিত থাকতে তোমাকে বিপথে যেতে দেব না। একদিন আমার উপদেশ গুলির মূল্য বুঝবে। ছোট ভাই অশ্রুসজল চোখে দাদাকে বলে সে আর কখনও এমন কাজ করবে না। দাদা ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলে—আমার কি মনে হয় না ঘুড়ি ওড়াই? কিন্তু তোর ভালোর জন্যই আমি নিজেকে সংযত করি। এমন সময় হঠাৎ একটা ঘুড়ি কেটে আসে। মুহূর্তে দাদা লাফিয়ে উঠে সেটা ধরে হোস্টেলের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দেয়। বোধ হয় তাও ঐ ছোট ভাই-এর জন্যই।

"**অলগোঝা**" (পৃথক হওয়া) গল্পটিতে প্রেমচন্দ একটি একান্নবর্তী পরিবারের ভেঙে যাওয়া ও পরে জোড়া লাগার এক বিচিত্র কাহিনী বলেছেন। নতুন বৌ পরের বাড়ির মেয়ে তাই স্বার্থের সংঘাতে পৃথক হতে চায়। স্বামী তা হতে দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে পরিবারে ভাঙ্গন ধরে। ক্রমশঃ মনের দুঃখে ও কাজের চাপে শরীর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে আর তারপর একদিন শেষ নিঃশ্বাস নেয়। এবার বধূ বিপদে পড়ে। গল্পটির সমাপ্তি ঘটে বিচ্ছিন্ন পরিবারের জোড়া লাগার মাধ্যমে। আর এই জোড়া লাগাতে গিয়ে প্রেমচন্দ একটি অসীম সাহসের কাজ করে বসেন দেবরের সঙ্গে বিধবা বৌদির বিয়ে দিয়ে। এখানে মনে রাখতে হবে যে এই গল্প লেখা হয়েছিল ৫০।৬০ বছর আগে। এতটা সামাজিক দুঃসাহস বোধহয় এর আগে কোন হিন্দী লেখক দেখাতে পারেন নি। মনে রাখতে হবে যে প্রেমচন্দ নিজেও বিধবা বিবাহ করেছিলেন।

"**বেটোঁ ওয়ালী বিধবা**" গল্পে প্রেমচন্দ এক বড় পরিবারের মাধ্যমে আমাদের সমাজে বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারের নিয়মগুলির প্রতি ব্যঙ্গ করে তার ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করেছেন এবং এগুলির সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

"**সজ্জনতা কা দণ্ড**" গল্পে প্রেমচন্দ দেখাতে চেয়েছেন যে আমাদের বর্তমান সমাজে ন্যায়পরায়ণ, সচ্চরিত্র ও সৎ পদাধিকারীদেব কোন স্থান নেই। এখানে ঘুষ নেন না বলে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারকে অপদস্থ হতে হয়। "**নমক কা দারোগা**" গল্পের মধ্যেও সেই একই দুর্নীতিমুক্ত কর্মীর সমস্যা তুলে ধরেছেন তিনি, সমাজের এমনই অবস্থা যে এখানে আদালতেও ঘুষ ও দুর্নীতির রাজত্ব। আদালত ন্যায়ের দরবার, কিন্তু তার কর্মচারিদের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের নেশা।

"পঞ্চ পরমেশ্বর" গল্পে গ্রামের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতি লেখক পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করে দেখিয়েছেন যে উচ্চাসনের দায়িত্ব বোধ বহু ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্কীর্ণ আচার ব্যবহারকে সুসংস্কৃত করে তোলে। পঞ্চায়েত প্রধানের গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়া মাত্র এই কাহিনীর দুই বন্ধুর মনে কি অপূর্ব মহিমাময় পরিবর্তন আসে লেখক তা দেখিয়েছেন। **"শঙ্খনাদ"** গল্পে প্রেমচন্দ যুক্ত পরিবারের ভাঙ্গন দেখিয়ে একটি ঘটনার মাধ্যমে এক নিষ্কর্মাকে কর্মের প্রেরণা যুগিয়েছেন।

প্রেমচন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দেশপ্রেমের পরিচয় মেলে বহু গল্পে। **"ইস্তিফা"** ও **"মোটর কী ছীঁটে"**তে প্রেমচন্দ ভারতীয়দের দ্বারা ইংরেজকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও অপমানিত করে গায়ের ঝাল মিটিয়েছেন। **"অধিকার চিন্তা"** গল্পে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে তিনি লোভী, স্বার্থান্বেষী ও কাপুরুষ বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। **"পত্নী সে পতি"** গল্পে এক ইংরেজ ভক্ত স্বামীর পরিবর্তনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে যিনি সাহেবের অপমান সূচক কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে সাহেবকে মুষ্ঠাঘাত করে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন ও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। **"শরাব কী দুকান"** গল্পে মদের দোকানে সত্যাগ্রহ করে ও মদের অপকারিতা বুঝিয়ে গরীব মানুষকে সৎপথে আনার গল্প বলেছেন লেখক। গল্পের শেষে মদের দোকানীও বলে "এবার স্বদেশী কাপড়ের ব্যবসা করবো—যশও হবে আর লোকের উপকার করাও হবে।" **"জেল ও আহুতি"** গল্পেও তিনি "ইংরেজ দেশছাড়ো"র শ্লোগান দিয়েছেন।

প্রেমচন্দ নিশ্চয়ই দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন কিন্তু তার চেয়ে তাঁর কাছে আরো বড় ছিল মানুষের সামাজিক মুক্তি। গোঁড়ামীকে—তা সে যে ধর্মেরই হোক বা সমাজ সংস্কৃতিরই হোক—তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। তাই তিনি সকল প্রকার গোঁড়ামী ও ভণ্ডামিকে তিরস্কৃত করেছেন। প্রেমচন্দের গল্প পড়লে এটাই মনে হয় যে এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুন ধরে গেছে, এখানে সবাই স্বার্থান্বেষী, আচারভ্রষ্ট, নীতিহীন, ব্যাভিচারী, লোভী। "পুস কী রাত" "ঈদগাহ" "গরীব কী হায়" প্রভৃতি গল্পে প্রেমচন্দ দরিদ্র গ্রামবাসীর প্রকৃত অবস্থার মর্মান্তিক ছবি তুলে ধরেছেন। **"পুস কী রাতে"**র কৃষক হলকু এক এক পয়সা সঞ্চয় করে যে তিনটি টাকা জমা করেছিল শীতের রাতের জন্য একটি কম্বল কেনার আশায় তা নিষ্ঠুর মহাজনকে দিয়ে দিতে

হলো। "**ঈদগাহ**"র সেই পাঁচ ছয় বৎসরের ছোট ছেলেটিকে তিনটি পয়সা দিয়ে মেলা থেকে দাদীর জন্য চিমটে কিনে আনতে দেখে কার না হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠবে? "**ঠাকুর কা কুঁআ**" গল্পের রোগাক্রান্ত জোখুকে কি তৃষ্ণায় এমনভাবে ছটফট করতে হতো যদি গঙ্গী ঠাকুর সাহেবের কুয়ো থেকে একপাত্র জল ভরে আনবার অনুমতি পেত? ঠাকুর সাহেবের কুয়ো থেকে সকলেই জল নিতে পারে কিন্তু গ্রামের নীচু জাতের লোকরা নয়। "**চক্রবৃদ্ধি**" গল্পে প্রেমচন্দ মহাজনরূপী এক বিপ্র মহারাজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন যে শঙ্কর নামের এক কৃষক সোওয়া সের গম ধার করে নিয়ে তার পরিবর্তে আড়াই সের গম ফেরৎ দিয়েও কি করে সারাজীবন বিপ্রের বাড়ী বেগার খেটেও একশো কুড়ি টাকার অনাদায়ী ঋণের বোঝা মাথায় বহন করে নীরবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। শুধু এখানেই শেষ নয়। পণ্ডিতের দয়ার শরীর, তাই তার বংশধরের একজন এখনও তার ধার শুধতে বেগার খাটে। এমনি অসংখ্য গল্পে প্রেমচন্দ শোষণ ও দারিদ্র্যের ছবি এঁকেছেন।

উপন্যাসের মতই প্রেমচন্দ নিজের ছোট গল্পগুলিতেও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যা তুলে ধরেছেন। তিনি সেই সমস্যাগুলির আদর্শমুখী সমাধানও প্রস্তুত করেছেন। তবে তাঁর ঔপন্যাসিক বিকাশের ধারার মতই ক্রমশঃ তিনি বাস্তববাদী হয়ে উঠেছেন। তাই "পুস কী রাত", "সদ্গতি", "কফন" প্রভৃতি গল্পে শুধু সমস্যাই পাই, সমাধান নয়। "**সভ্যতা কা রহস্য**" গল্পের নায়ক রায়সাহেব রতন কিশোর ব্রিটিশ আদালতের জজ। তাঁর এজলাসে কোটিপতি খুনী ঘুষ দিয়ে সহজেই বেকসুর খালাস পেয়ে যায় আর গরীব দুঃখী চাকর "দমড়ী" নিজের বুভুক্ষু বলদের জন্যে পরের জমি থেকে এক মুঠো ঘাস কাটার অপরাধে ছ'মাস জেল খাটতে বাধ্য হয়। প্রেমচন্দের প্রশ্ন—এরাই কি প্রকৃত সভ্য? শ্রদ্ধেয়?

"**সদ্গতি**" গল্পে আমরা গ্রামের পুরোহিত শ্রেণীর শোষণের প্রকৃত রূপ দেখতে পাই। গ্রামের চামার দুখীর মেয়ের বিয়ে। সিধের ডালি প্রস্তুত করে যখন লগ্নের সময় জানবার জন্যে গ্রামের পণ্ডিত ঘাসীরামের নিকট এসে উপস্থিত হয় তখন পণ্ডিত তাকে স্বার্থের জাঁতাকলে আবদ্ধ করে বেগার খাটতে বাধ্য করে এবং বুভুক্ষু দুখী অক্লান্ত পরিশ্রম করতে করতে সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার মৃত্যুতে পণ্ডিত বা তার সহধর্মিনী বিন্দুমাত্র দুঃখিত

হয় না। চামার বস্তির মেয়েরা যখন সেখানে এসে বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে তখন তারা বিরক্ত বোধ করে এবং আশ্চর্য হয়ে বলে—"এই ডাইনিদের কি ঘরদোর নেই কেঁদে মরছে কি জন্যে? চেঁচিয়ে গলা দিয়ে রক্ত উঠে মরুক না এই আবাগির বেটিরা!"

গরীব দিনমজুর ও কৃষকদের ফাঁদে ফেলে কিভাবে তাদের বেগার খাটতে বাধ্য করা হয় তার এক বীভৎস ছবি এই গল্পে প্রেমচন্দ এঁকেছেন। দেখিয়েছেন অসহায় এই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জীবনের মূল্য এই ধর্মের ধ্বজাধারীদের কাছে এক কানাকড়িও নয়। এদের ব্রাহ্মণত্ব কেবল শোষণের এক যন্ত্র মাত্র। সেখানে মায়া দয়া বলে কিছু নেই। আছে কেবল স্বার্থ।

"**কফন**" প্রেমচন্দের লেখা একটি অসাধারণ গল্প। গল্পটি একজোড়া বাপ-বেটার অদ্ভুত চরিত্র নিয়ে লেখা। এরা ঠিক জমিহীন দরিদ্র কৃষি-শ্রমিক নয় আবার ঠিক খেটে খাওয়া মজুরও নয়। ঘরে একদানা অন্ন থাকতে এরা কাজে যাবে না। ঘরে বসে আয়েস করবে, দরকার হলে উপবাস করবে কিন্তু মজুর খেটে অন্নের সংস্থান করবার লালসা এদের নেই। অতি অল্পেই সন্তুষ্ট। বৌ এসে এদের হাল ফেরাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দারিদ্র্য যাদের মন থেকে সমস্ত মনুষ্যত্ববোধটাই ধুয়ে-মুছে দিয়েছে সেখানে তার চেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালা ছাড়া আর কি? তাই যখন সে গর্ভযন্ত্রণায় ঘরের ভেতর আছাড় খাচ্ছে তখন বাপ-বেটায় মিলে পরের ক্ষেত থেকে তুলে আনা আলু আগুনে ঝলসে খাচ্ছে, আর ভাবছে কতক্ষণে বৌ শেষ নিঃশ্বাস নেবে আর তারা মুক্তির আস্বাদ পাবে; কেন না সন্তান জন্মগ্রহণ করা মানেই খরচের ধাক্কা। অবশেষে তাদের মনস্কামনাই পূর্ণ হয়। আলু খেয়ে আকণ্ঠ জল পান করে আগুনের সামনে বাপ-বেটা যখন কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে তখন এক ফাঁকে বৌটা বিশ্ব সংসারকে অভিশাপ দিতে দিতে চিরবিদায় নেয়। সকালে ছেলে বৌকে দেখতে ঘরে ঢোকে। সে বাপকে জাগিয়ে তুলে চীৎকার করে মরা কান্না কাঁদতে আরম্ভ করে। পাড়া প্রতিবেশীরা এসে সান্ত্বনা জোগায়। আর তারপর বাপবেটা শলাপরামর্শ করে বেরিয়ে পড়ে লাশ ঢাকবার জন্যে নতুন কাপড় ভিক্ষা করতে। করুণ চোখে দয়া ভিক্ষা করে যে কটা টাকা তারা পায় তা নিয়ে বাজারে আর মদের দোকানে বসে মহোৎসব জুড়ে দেয়। ভূরি-ভোজন ও আকণ্ঠ মদ্যপান করে এক অপূর্ব আনন্দ সাগরে ভাসতে ভাসতে তারা নৃত্য করতে থাকে। আর

ভাবে বৌটা জনমভর খাটলো, মরেও আমাদের পেটভরে খাইয়ে গেল। এই গল্পে প্রেমচন্দ যে করুণ ও বীভৎস রসের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন তা অন্যত্র দুর্লভ। দারিদ্র্য কিভাবে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ লুপ্ত করে—"কফন" তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এভাবেই প্রেমচন্দ বিংশ শতকের প্রথমার্ধেই উত্তর ভারতের সমাজের বাস্তব ইতিহাসকে কেন্দ্র করে একের পর এক গল্প লিখে গেছেন ও তারই মাধ্যমে নানা ভাবনা চিন্তার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছেন। এগুলি গল্প তো নয়—সমাজের কঠোর বাস্তবতার এক একটি অভেদ্য অভঙ্গুর হীরের টুকরো বিশেষ।

(গ) নাটক

কথাশিল্পী প্রেমচন্দ যে নাট্যকারও ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। তিনি তিনটি নাটক লিখেছেন যার মধ্যে প্রথমটি হলো 'সংগ্রাম', দ্বিতীয়টির নাম 'কারবালা' এবং শেষেরটির নাম ছিল "প্রেম কী বেদী"। তবে তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন যে তিনি নাট্যকার হিসেবে সফল হতে পারেন নি। 'সংগ্রাম' নাটকটি প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার এক বছর পর প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে লখনউ থেকে। তাঁর শেষ নাটকটি প্রকাশিত হয় বেনারস থেকে ১৯৩৩ সালে। নাট্যশাস্ত্রের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে এগুলো ঠিক নাটক নয়, উপন্যাসেরই নামান্তর মাত্র। তিনি স্বয়ং একটি পত্রে স্বীকারও করেছিলেন যে—নাটক লেখা তাঁর কম নয়। এ ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটকটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন আজকাল নাটক লেখার জন্যে সঙ্গীতের জ্ঞান আবশ্যক। কিছুটা কবিত্ব শক্তিও প্রয়োজন। আমি এই উভয় গুণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কিন্তু এই গল্পটিতে এমন কিছু ছিল যে আমি এটাকে উপন্যাসের রূপ দিতে পারে নি। এটাই এই অনধিকার চেষ্টার প্রধান কারণ। আশা করি সহৃদয় পাঠকেরা আমাকে ক্ষমা করবেন। আর কখনও আমি এই ভুল করবো না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা আমার প্রথম এবং শেষ দুঃসাহসিক পদক্ষেপ।

"আমি বিশ্বাস করি যে এই নাটকটি মঞ্চে অভিনীত হতে পারে। হ্যাঁ, রসজ্ঞ ষ্টেজ-ম্যানেজারকে কোথাও কোথাও কাঁটছাঁট করতে হবে। আমার

পক্ষে নাটক লেখাই কম দুঃসাহসের কাজ ছিল না। তায় এটাকে মঞ্চের যোগ্য করার ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য।

"কিন্তু আমার অপরাধের এখানেই শেষ নয়। আমি একটি তৃতীয় অপরাধও করেছি। সঙ্গীতে একেবারেই অনভিজ্ঞ হয়েও আমি যেখানে মনে হয়েছে গান যোগ করে দিয়েছি। দুটো অপরাধ ক্ষমা করার প্রার্থনা তো আমি করেছি, কিন্তু তৃতীয় অপরাধের জন্যে কোন মুখে ক্ষমা চাইবো। এর জন্যে পাঠকবৃন্দ এবং সমালোচকরা যে দণ্ড দেবেন তা মাথা পেতে নেবো।"

এই স্বীকারোক্তির পর প্রেমচন্দের নাটক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করাই সমীচীন, তবুও প্রথম দুটি নাটকের কাহিনী সম্পর্কে কিছু না বললে প্রেমচন্দের শিল্পকৃতির একটি দিক বোধ হয় অকথিতই থেকে যায় তাই প্রথম দুটি নাটক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো।

সংগ্রাম:—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা প্রথম এই নাটকটি নিঃসন্দেহে অতি অপটু হস্তের রচনা। শুধু দৃশ্যকাব্যের নিরিখে নয় কাহিনীটির বাঁধুনিও বেশ হাল্কা। কাহিনীর বিষয়বস্তু গ্রামের একটি কৃষক পরিবার ও জমিদারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। কৃষক হলধর ও তার সুন্দরী স্ত্রী রাজেশ্বরী মাঠের ফসল দেখে আনন্দে আত্মহারা। নতুন সুন্দর স্বপ্নময় দিনের কথা ভাবে ওরা। নতুন গয়না গড়ার বাসনা জাগে তাদের। রাজেশ্বরী পরামর্শ দেয় এবার একটা মজুর রেখো। তোমাকে একা এতো খাটতে হয়। এ কথায় হলধরের পৌরুষে আঘাত লাগে। বলে—জমি পেলে এর দ্বিগুণ খাটতে পারি। স্বামী-স্ত্রীতে আরো ঠিক হয় যে এবার একটা গরু কেনা হবে। মটরের ক্ষেতে টিয়া পাখীর এক ঝাঁককে দেখে হলধর গুলতি ছুঁড়ে মারে। রাজেশ্বরী বলে—দেখো সত্যি সত্যি যেন মেরে বসো না। কিন্তু সত্যি একটা পাখী ছট্‌ফট্ করতে করতে পড়ে যায়। ব্যথিত হৃদয়ে রাজেশ্বরী বলে—এক্ষুনি তোমার ঐ গুলতি ভেঙে ফেলে দাও।

তারপর যথারীতি হলধর শ' চয়েক টাকা ধার নেয় জমিদার সেরেস্তা থেকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন শিলাবৃষ্টিতে ক্ষেতের সমস্ত ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রামের সব কৃষকদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। এদিকে সচ্চরিত্র সহানুভূতিশীল জমিদারের হঠাৎ চোখ পড়ে রাজেশ্বরীর ওপর। তিনি হঠাৎ যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এই সুন্দরী পরস্ত্রীকে হাত করার জন্যে। নানা ষড়যন্ত্র করে হলধরকে জেলে পাঠিয়ে রাজেশ্বরীকে হাত করার চেষ্টা করেন।

পতিব্রতা কৃষকস্ত্রী রাজেশ্বরী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। সে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে জমিদারের নিকট ধরা দেয়। ধরা দিয়েও কিন্তু সে নিজেকে ধরা ছোঁওয়ার বাইরেই রাখে। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকেরা ঋণের টাকা শোধ দিয়ে হলধরকে মুক্ত করে আনে। সে পাগলের মত স্ত্রীকে খুঁজে ফেরে। অবশেষে মনের দুঃখে এক ডাকাতের দলে যোগ দেয়। জমিদার গিন্নি পুত্র-লালসায় এক সন্ন্যাসীর ফাঁদে পড়ে। সেখানে অপমানিত হয়ে রাত্রে ফেরার সময় গিন্নি এক ডাকাতের হাতে পড়ে এবং হলধর তাকে রক্ষা করে। ওদিকে জমিদার বিপাকে পড়ে পথের কাঁটা ছোট ভাইকে একধারে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু সে বেঁচে যায়, যদিও জমিদার জানেন যে-সে নিহত হয়েছে। এদিকে মনে মনে গভীর অনুশোচনা জাগে জমিদারের। রাজেশ্বরীকে নিয়ে কোথাও দূরে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে। জমিদার গিন্নী রাজেশ্বরীর আচার ব্যবহার এবং কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে তাকে বোন বলে স্বীকার করেন এবং শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বিষ খেয়ে বসেন। ওদিকে রাজেশ্বরী সমাজে স্থান না পাওয়ার আশঙ্কায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। এমন সময় হলধর নগ্ন তলোয়ার হাতে নিয়ে প্রবেশ করে। ফাঁসীর রজ্জু কেটে তাকে রক্ষা করে। রাজেশ্বরী জ্ঞান ফিরলেই বলে ঐ তলোয়ার দিয়ে আমার মুণ্ডচ্ছেদ কর। হলধর বলে-যে নিজেই মরছে তাকে আবার মারবো কি? রাজেশ্বরী বলে—এখনো এত দয়া?

হলধর ঘৃণা মিশ্রিত তীব্র কণ্ঠে বলে—দয়া তোমার লাজ-লজ্জার মত বাজারে বিক্রীর বস্তু নয়।

হলধরের এই কথার উত্তর দেয় জ্ঞান ফিরে পাওয়া জমিদার গিন্নি। বলেন কে বলে ও নিজের লাজ-লজ্জা বিক্রী করেছে? ও আজও ততই পবিত্র যত নিজের ঘরে ছিল। …ও লাজ-লজ্জা রক্ষার্থেই এই পথ বেছে নিয়েছে বিক্রী করতে নয়।" এই কথাগুলি বলেই প্রাণ হারান জমিদার গিন্নী।

অপর দিকে জমিদার আত্মহত্যা করতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হ'ন। দুই ভাইয়ে মিলন হয়। জমিদারের ঔদার্যে হলধরের অবস্থা ফেরে। তিনি সমস্ত জমিজমা চাষীদের মধ্যে বিতরণ করে তীর্থ করতে বেরিয়ে যান। সম্পত্তি বিক্রী করে যে লাখটাকা হয় তা দিয়ে জমিদার গিন্নির নামে পুকুর, ধর্মশালা ইত্যাদি তৈরী করার ব্যবস্থা হয়। ভণ্ড সাধু জলে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

১৯৮ পৃষ্ঠার 'সংগ্রাম' নাটকটি পাঁচটি অংকে বিভক্ত। এর প্রথম অঙ্কে আছে সাতটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে দশটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে নয়টি, চতুর্থ অঙ্কে সাতটি এবং পঞ্চম ও শেষ অঙ্কে দুটি দৃশ্য। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে দৃশ্যের সংখ্যা হল উনচল্লিশ। গানের সংখ্যাও পনেরো। স্বভাবতই এই পরিসংখ্যান শুনে আজকের নাট্যরসিকেরা ভুরু কোঁচকাবেন। খুব কম করেও পাঁচ ঘণ্টার কমে এ নাটক মঞ্চস্থ করার কথা চিন্তাই করা যায় না। আর আজকের দর্শকের কাছে এতো সময় নেই। কিন্তু এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে এ নাটক পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বের লেখা যখন দর্শকরা সমস্ত রাত ধরে নাটক দেখবার প্রস্তুতি নিয়ে আসতেন এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যার যার বাড়ি পৌঁছে যেতেন। বিশেষ করে হিন্দীর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চও ছিল না। তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে এতগুলো দৃশ্য পরিবর্তন ও এতো গান কাহিনীর গতিকে রুদ্ধ করবেই। দৃশ্য কাব্যের বিচারে এই দোষগুলি ক্ষমার অযোগ্য তো বটেই। তবে এই দোষ কিছুটা লাঘব করা সম্ভব যদি নাটকটিকে কিছু কাটছাঁট করে নেওয়া যায়। অবাঞ্ছিত দৃশ্য সংখ্যা এবং গান কম নয়। তবে পাত্রের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত নয়। এতে আছে ন'টি পুরুষ পাত্র এবং পাঁচটি স্ত্রী পাত্র। এছাড়া ছোট খাটো কয়েকটি চরিত্রও আছে। হলধর নাটকের নায়ক, খলনায়ক জমিদার সবল সিং, নায়িকা হলধরের স্ত্রী রাজেশ্বরী যাকে কেন্দ্র করে গল্পটি এগিয়েছে। হলধর এবং রাজেশ্বরীর চরিত্র দুটি নাট্যকার ছোট ছোট কথোপকথনের মাধ্যমে ভাল ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু জমিদার সবলসিং-এর চরিত্রটা যেন কিছুটা ধোঁয়াটে থেকে গেছে। জমিদার সচ্চরিত্র, গরীব ও দীন দুঃখীদের সহায়ক। বিপদে আপদে প্রজাদের সাহায্য করা নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন। গ্রামে বেগার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এমনি একজন লোক হঠাৎ গরীব কৃষক হলধরের বৌকে দেখে বেচাল হয়ে পড়েন কি করে এটা বোধগম্য হয় না। তবে স্বাভাবিক ভাবে জমিদার কুলের নারীহরণে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাই এটা না হয় স্বীকার করে নেওয়া গেল। আবার যখন রাজেশ্বরী স্বয়ং এসে ধরা দেয় তখন হঠাৎ তার মানসিক দ্বন্দ্বটার গতি প্রকৃতি অবোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভ্রাতৃহত্যার ষড়যন্ত্রটিতেও কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে কেননা তিনি এই অনুজটিকে খুব ভালবাসেন আবার অনুজটিও দাদাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। জমিদারের

অত্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে বলতে বাধা নেই যে তিনি তাতে অসফল হয়েছেন। কারণ নাটকটি দেখে দর্শকের মনে জমিদারের প্রতি বিশেষ ঘৃণার উদ্রেক হয় না বরং মাঝে মাঝে তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে তাঁর প্রতি কিছুটা করুণারই উদ্রেক হয়।

তবে এই নাটকটিতেও কৃষক জীবনের দুঃখ ও দুর্দশার ছবি অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে এঁকেছেন নাট্যকার প্রেমচন্দ। হলধর, কাকা ফত্তু, বধূ রাজেশ্বরী ইত্যাদি পরিপূর্ণ ভাবে ভারতীয় কৃষকেরই প্রতিনিধি। মাঠের সোনালী ফসল সত্যি তাদের মনে আনন্দের জোয়ার আনে, আশার সঞ্চার করে এবং এনে দেয় চোখে রঙীন স্বপ্ন। আর প্রকৃতির নিষ্ঠুর আঘাতে যখন সেই সোনালী ফসল ধ্বংস হয়ে যায় তখন তাদের সেই সোনালী স্বপ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, ভবিষ্যতের অন্ধকারে তা বিলীন হয়ে যায়। ভগবানের এই নিষ্ঠুর আঘাতের সঙ্গে যেন মত্ততায় মেতে ওঠে গ্রামের জমিদার, ইজারাদার ও মহাজনদের দল। আঘাতের পর আঘাত সইতে সইতে কৃষকের বলিষ্ঠ দেহ হয়ে আসে ক্ষীণ, কোমর যায় ভেঙ্গে, তিরিশ পঁয়ত্রিশের জোয়ান পরিবর্তিত হয় পঞ্চাশ ষাটের বৃদ্ধে। ফলে এই সব রক্তপিপাসুর দল সহজেই বেদখল করে কৃষকদের জমি ও বাস্তুভিটে।

কারবালা—প্রেমচন্দের দ্বিতীয় নাটক "কারবালা"। এই নাটকটি লেখার উদ্দেশ্য বিবৃত করতে গিয়ে প্রেমচন্দ বলছেন—"কত বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা যে মুসলমানদের সঙ্গে কয়েক শতাব্দি ধরে এক সঙ্গে থেকেও আমরা তাদের ইতিহাস সম্পর্কে কতই না অজ্ঞ। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের এটাও একটা কারণ যে আমরা হিন্দুরা মুসলিম মহাপুরুষদের সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে কিছুই জানি না। কোনো মুসলিম বাদশাহের উল্লেখ মাত্র আমাদের চোখের সামনে ঔরঙ্গজেবের ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু সৎ এবং অসৎ চরিত্রের মানুষ সব সমাজেই থাকে এবং থাকবে ও।"

তাঁর এই উক্তি থেকে আমাদের এটা বুঝে নিতে বিলম্ব হয় না যে তাঁর এই নাটকটি লেখার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-পাঠক সমাজের সামনে এমন মুসলিম মহাপুরুষের চরিত্র তুলে ধরা যাতে তাঁদের এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি দূর হতে পারে যে মুসলিম সমাজে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন না। অবশ্যই এর মূল উদ্দেশ্য হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করা। তাই তিনি আরব দুনিয়ায় সর্বাধিক চর্চিত মহাপুরুষ হোসেনকে কেন্দ্র করে ইতিহাস এবং ধর্ম

মিশ্রিত এই নাটকটি রচনা করেছেন। তিনি নাটকটির ভূমিকায় বলেছেন "ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনার ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কুচিত থাকে। ঘটনা যত বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করে কল্পনার ক্ষেত্র ততই সঙ্কীর্ণ হতে থাকে। ঘটনা এত প্রসিদ্ধ যে এর এক একটি কথা, এর চরিত্রগুলির এক একটি শব্দ সহস্র বার লেখা হয়ে গেছে। আপনি এক তিলও তার থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না।...পাঠকগণ এই নাটকে হিন্দুদের অনুপ্রবেশ দেখে চমকে উঠবেন, কিন্তু এগুলো স্বকল্পিত নয় ঐতিহাসিক ঘটনা। আর্যরা আরবে কি করে ও কখন পৌছাল এটা বিতর্কিত বিষয়। কিছু লোকের ধারণা, মহাভারতের পর অশ্বত্থামার বংশধরেরা সেখানে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছিল। কতিপয় বিজ্ঞজনের ধারণা যে এরা সে সব হিন্দুদের সন্তান যাদের আলেক্জাণ্ডার এখান থেকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক এ ঘটনার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যে কিছু হিন্দুরাও কার্‌বালার এই সংগ্রামে সম্মিলিত হয়ে প্রাণদান করেছিলেন।"

নাটকটির সংক্ষিপ্তসার হলো এই :—

হজরত মোহম্মদের নির্দেশ ছিল যে খলিফার নির্বাচন সর্বসম্মতি ক্রমে হবে কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই তাঁর নির্দেশ কার্যকর করা সম্ভব হলো না। পর্যায়ক্রমে যখন উসমান খলিফা হলেন এবং তাঁর স্বজনপোষণ নীতির জন্যে তিনি হত হলেন তখন জনগণ হজরত আলিকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করলো। এদিকে শাম প্রান্তের সুবেদার মুয়াবিয়া কিন্তু আলিকে খলিফা বলে স্বীকৃতি দিল না। ফলে পাঁচ বৎসর কাল যুদ্ধ চলার পর মুয়াবিয়া খলিফা হলেন এবং তিনি নিজের কথার বিরুদ্ধাচারণ করে মৃত্যুকালে সপুত্র য়জীদকে খলিফা নিযুক্ত করেন। অপরদিকে হসনের অনুজ হজরত হোসেন খলিফা পদের উমেদার হলেন। প্রেমচন্দের কার্‌বালা নাটকটি এই থান থেকেই আরম্ভ হয়।

য়জীদ খলিফা হয়েই হোসেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে নিজের খলিফা হওয়ার স্বীকৃতি আদায় করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। য়জীদ ছিল ছলাকলায় পারদর্শী, কুটনীতি বিশারদ। সে মদীনার সুবেদারকে এই কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করে কিন্তু হোসেন তাকে খলিফা বলে স্বীকৃতি দিতে কিছুতেই সম্মত হয় না। তাই য়জীদ হোসেনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে থাকে গোপনে। এদিকে কুফা প্রদেশের জনগণ হোসেনকে

খলিফা পদে অভিষিক্ত করতে আগ্রহী ছিল। তারা সকলেই হোসেনের শান্ত, সৌম্য, সহিষ্ণু চরিত্রে মুগ্ধ। তাঁর ঔদার্য, ধর্মপরায়ণতা এবং জ্ঞানবুদ্ধি দেখে সেখানকার সকলেই তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠে। তাই কুফার অধিবাসীদের ওপর য়জীদের অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসে। সেখানকার অধিবাসীগণ মক্কায় হোসেনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং তাঁর সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু হোসেন রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন। তিনি তাই মুখ বুঁজে মক্কায় বসে থাকেন। এদিকে কুফায় হোসেনের সমর্থকদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁরা বারংবার হোসেনের নিকট সাহায্যের জন্যে করুণ আবেদন পাঠাতে থাকেন। তাঁদের শেষ পত্রের বয়ান পাঠ করে হোসেন এতই মর্মাহত হন যে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না এবং এক পত্রে জানালেন—"আমি শীঘ্রই তোমাদের সাহায্যের জন্যে আসবো।"

অপর দিকে য়জীদ কুফায় এক নিষ্ঠুর নরাধম সুবেদারকে নিযুক্ত করে। সে এক সভায় ঘোষণা করে যে যারা য়জীদকে খলিফা বলে স্বীকৃতি দেবে তারা উপকৃত হবে এবং যারা হুসেনের নামে প্রার্থনা জানাবে তাদেরকে শূলে চড়ান হবে। এই নিষ্ঠুর ঘোষণায় কুফাবাসীরা ভয়ে কেঁপে উঠলো। তারা সেদিন আর কেউ হোসেনের সংবাদবাহক তাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা মুসলিমের নমাজ সভায় উপস্থিত হওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে সমর্থ হয় না। দিকে দিকে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগলো। একদিন মুসলিম য়জীদকে ঘিরে ফেলেন। য়জীদ এক সমর্থকের বাড়ির ছাতে উঠে ঘোষণা করলেন—"যারা য়জীদকে সাহায্য করবে তাদেরকে জায়গীর দেওয়া হবে এবং যারা বিদ্রোহ করবে তাদেরকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যাতে তাদের জন্যে কেউ অশ্রু বিসর্জন করারও লোক না থাকে।" এ কথায় ধীরে ধীরে মুসলিমের সঙ্গীরা সকলে সে স্থান ত্যাগ করে যায়। মুসলিম নিজেকে একা দেখে পলায়ন করে এক বৃদ্ধার বাটিতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু য়জীদ তাকে হত্যা করে। ক্রমশঃ য়জীদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিরোধীদের হত্যালীলায় সে মত্ত হয়ে ওঠে।

ঠিক সেদিনই হোসেন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে কুফা অভিমুখে প্রস্থান করেন। ১৮ দিনের কঠিন যাত্রার পর তিনি ফরাত নদীর ধারে অবস্থিত কারবালার ময়দানে উপস্থিত হন। কুফার নিষ্ঠুর সুবেদারের

আদেশে তাঁকে তথায় জনমানবশূন্য মরুপ্রায় বনস্পতিহীন রুক্ষ স্থানেই তাঁবু পাততে হয়। এদিকে শত্রুসেনা মক্কা থেকে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে আসছিল। অন্যান্য সব দিকেও সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে হোসেন কিছুতেই কোনো মতেই কোনো পথে কুফা না পৌছতে পারে। কারবালা পৌছোবার আগের দিন হোসেনের দেখা হয় হুরের সৈন্যের সঙ্গে। হোসেনের সম্মুখে হুরের মাথা নত হয়ে আসে; সে তাঁর নেতৃত্বে সৈন্যসহ নামাজ পড়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। এদিকে য়জীদের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

হোসেনের পরিবারসহ সকলে ক্ষুধা তৃষ্ণায় ছটফট করতে থাকে। কিন্তু তাঁদেরকে নদীর তীরে যেতে দেওয়া হয় না। বারংবার মিনতি করেও তারা তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে নদীর থেকে এক ফোঁটাও জল পান না। কয়েক সহস্র সৈন্য নদীর তীরে মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে হোসেনের লোকজন জল না নিতে পারে। হোসেন শেষ বারের মত একবার সন্ধির প্রস্তাব করেন কেননা তিনি কোনো অবস্থাতেই রক্তপাত হতে দিতে চাইছিলেন না। তাঁর শর্ত ছিল—আমাদের মক্কা অথবা সীমান্ত প্রদেশের দিকে শান্তি-পূর্ণ ভাবে চলে যেতে দেওয়া হোক কিংবা আমাকে য়জীদের নিকট উপস্থিত করা হোক। কিন্তু তাঁর এই শর্তের দিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগলো। কুফার সুবেদারের ভয় ছিল যে মৃদুভাষী হোসেনের কথাবার্তায় হয়তো বা য়জীদেরও মত পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়লো।

একে একে পরিবারের সকলে সেই কারবালার ময়দানে ধর্মযুদ্ধ করে প্রাণ দেন। অবশেষে হোসেন হসনের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কোলে করে কোমল গণ্ডে শেষ স্নেহচুম্বন এঁকে দিতে যাবেন এমন সময় এক তীক্ষ্ণ শরবিদ্ধ হয়ে কোলেই শিশু প্রাণ হারায়। তিনি নিজ হস্তে শিশুকে কবরস্থ করে মাত্র সাত বছরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শত্রু সেনার সম্মুখীন হয়ে বললেন—"হে অত্যাচারীরা আমি তোমাদের চোখে পাপী, কিন্তু এই বালক তো কোনো অপরাধ করে নি, একে কেন তৃষ্ণার্ত মারছো?" কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি তীর বালকের কণ্ঠচ্ছেদ করে হোসেনের বাহুতে আঘাত করলো। এবার শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। একা হোসেন একদিকে এবং বিপুল সজ্জিত সেনা অপর দিকে। বহু সৈন্যকে নিধন করে তিনি নমাজ পাঠরতাবস্থায় প্রাণ বিসর্জন দেন। হোসেনকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে দেখে অনেকের চক্ষু

অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করতে গিয়ে অনেকে তাঁর চোখে চোখ রেখে ব্যাকুল হয়ে ফিরে যায়। অবশেষে শিমর হোসেনের বুকে চড়ে বসে এবং তলোয়ারের এক কোপে তাঁর শিরচ্ছেদ করে। শহীদের সমস্ত মৃতদেহগুলি নিয়ে যে নারকীয় খেলা অনুষ্ঠিত হয় তা লিপিবদ্ধ আছে ইতিহাসের পাতায়।

ইতিহাসটি বহুশ্রুত ও বহুচর্চিত। এতে নবীনত্ব বা অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করতে গেলে হয়তো অনেক ধর্মান্ধরা ক্ষুব্ধ হবেন কিন্তু প্রেমচন্দ ইতিহাস ভিত্তিক কতিপয় হিন্দু চরিত্র সংযোজনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবনার নতুন যে পটভূমি স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। এক হিন্দু যোগী মক্কায় যান পয়গম্বর মোহম্মদের সমাধি দর্শনাভিলাষে। তিনি হোসেনকে জিজ্ঞাসা করেন—মহানুভব! আমি সেখানে যেতে চাই যেখানে মহর্ষি মোহম্মদের সমাধি।

হোসেন বলেন—তুমি কে? এমন চেহারা কেন ধারণ করেছো?

যোগী উত্তর দেন—আমি সাধু। সেই দেশ থেকে আসছি যেখানে প্রথম ওঙ্কার ধ্বনিত হয়েছিল। মহর্ষি মোহম্মদ সেই ধ্বনিকে সম্পূর্ণ বিশ্বে প্রতিধ্বনিত করে দিয়েছেন। তাঁর অদ্বৈতবাদ ভারতের সমাধিমগ্ন ঋষিদের মনকেও আন্দোলিত করেছে। সেই মহাত্মার সমাধি দর্শনার্থে আমি ভারত থেকে আসছি, দয়া করে আমায় পথ বাতলে দিন।

হোসেন যোগীকে রাত্রিটা তাঁর আশ্রয়ে অতিবাহিত করতে অনুরোধ করায় যোগীবর তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন—"প্রভু, আপনার মুখকমলেও আমি সেই মহর্ষির তেজস্বিতার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আপনি কি তার আত্মীয়?

হোসেনের উত্তর শুনে যোগী বলেন—আমি তাঁর স্থূল শরীর দেখি নি কিন্তু তার আত্মার দর্শন লাভ করেছি। আত্মার দ্বারা তাঁর পবিত্র বাণী শ্রবণ করেছি।

অতঃপর যোগী নির্দেশিত পথে চলে যান।

পুনর্বার আমরা কারবালার রণাঙ্গণে দেখতে পাই আরো সাত হিন্দু ভ্রাতাকে যারা অসীম সাহসের সঙ্গে হোসেনের হয়ে যুদ্ধ করতে করতে একে একে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁদের বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে হোসেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, এমন পাঁচ শত লোকও যদি আমার সঙ্গে থাকতো তবে যুদ্ধে আমরাই জয়ী হতাম।

কতিপয় হিন্দু চরিত্রের অতি সংক্ষিপ্ত সংযোজনে নাটকটির মূল্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে। তবু বলবো হয়তো সেদিক দিয়ে এটিকে আরো অধিক প্রভাবশালী করা সম্ভব ছিল।

আধুনিক নাট্যশাস্ত্রের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে প্রথম দোষ যা আমাদের চোখে পড়ে তা হলো নাটকটির বৃহৎ আকার। ২৭২ পৃষ্ঠার পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে হলে নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টার প্রয়োজন আজকের দর্শকের নিকট যার একান্ত অভাব। তবে এই নাটকটি লেখা হয় আজ থেকে প্রায় ষাট বছর পূর্বে. সে সময় হিন্দী নাটক শৈশবাবস্থায় ছিল এবং তাতে দৃশ্য-কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলির একান্তই অভাব ছিল। হিন্দি নাটক তখনও শ্রুতি কাব্যের পর্যায়ে ছিল। মানুষের সময়াভাবও এত প্রবল ছিল না। নাটক আরম্ভ হতো রাত দশটা এগারটায় এবং শেষ হতো ভোর বেলা অথবা শেষ রাত্রে।

দ্বিতীয় দোষটি হল মুহুর্মুহু এর দৃশ্য পরিবর্তন। প্রথম অঙ্কে আছে সাতটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তেরোটি, তৃতীয় অঙ্কে সাতটি, চতুর্থ অঙ্কে ন'টি এবং পঞ্চম ও শেষ অঙ্কে আছে ছ'টি দৃশ্য। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে সংখ্যা হলো বিয়াল্লিশ। নিশ্চয়ই আজকের বিচারে এই সংখ্যা অকল্পনীয় ও অবাস্তব বলে মনে হবে। পাত্রের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সাত জন নারী চরিত্র ছাড়াও পনেরো জন পুরুষ চরিত্র এমন আছে যাদের নগণ্য বা মৃত সৈনিকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আসলে হোসেনের সমগ্র পরিবারের ছবিটা তুলে ধরা আবশ্যক মনে হয়েছে লেখকের তাই পাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। হয়তো বা দৃশ্য ও পাত্র সংখ্যা সহজেই কমিয়ে আনা যেত যদি মঞ্চের দিকটা ভেবে কাহিনী রচনা করতেন। প্রেমচন্দ নিজেই ভূমিকায় বলেছেন—"যত দূর আমি জানি, এখন পর্যন্ত কোনো ভাষায় সম্ভবত এ বিষয়ে নাটক লেখা হয় নি। আমি হিন্দিতে এই নাটক লেখার সাহস করেছি।" তাঁর মতে—"নাটক দৃশ্য ও পাঠ্যও। কিন্তু আমার মনে হয় এই দুই প্রকারের পাঠকের মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিভাজন রেখা টানা সম্ভব নয়। ভাল অভিনেতা দ্বারা মঞ্চস্থ হলে পর সব নাটকই মনোরঞ্জক ও উপদেশাত্মক হয়ে উঠতে পারে। নাটকের প্রধান অঙ্গ হলো তার ভাব প্রাধান্য, অন্য সব জিনিষ গৌণ।...আমি এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্যে লিখি নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস যদি কেউ এটা মঞ্চস্থ করতে আগ্রহী হন তবে কিছুটা কাটছাঁট করে তা করতে পারবেন।"

নাট্যকারের এই উক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে তিনি এই নাটকটির দোষ ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি জ্ঞাত সারেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে এটি রচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর অন্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দির পাঠক সমাজের সামনে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি মহান চরিত্র তুলে ধরা। তাঁর এই উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই তিনি সাফল্য লাভ করেছেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রেমচন্দ সাহিত্যের সর্বাধিক আকর্ষণীয় বস্তু হলো তাঁর অপূর্ব প্রাঞ্জল জীবন্ত ভাষা। কথোপকথনের যে ভাষা তিনি এই নাটকে ব্যবহার করেছেন তাকে হিন্দী না বলে উর্দু বললেই বোধ হয় ভাল হয়। আরবী ফারসী এমন শব্দ তিনি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছেন যা সাধারণ হিন্দী পাঠকের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে। তবে নাটকের পটভূমি মক্কা মদীনা হওয়াতে তাতে অস্বাভাবিকতা দুষ্ট মনে হয় না। যেখানে বক্তা হিন্দু সেখানে কিন্তু লেখক শুদ্ধ তৎসম হিন্দী শব্দের ব্যবহার করেছেন। হিন্দুদের দিয়ে গাওয়ানো গান ও ভারতের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ব্যাপক ভাবেই পরিস্ফুট। যখন সাত ভাই যাচ্ছেন তাঁরা গাইছেন—

জয় ভারত, জয় ভারত, জয় জয় মম প্রাণপতে।
ভাল বিশাল চমৎকৃত সিত হিমগিরি রাজে।
পরশি বাল প্রভাকর হেম প্রভা বিরাজে। জয় ভারত…
ঋষি মুনি পুণ্য তপোনিধি তেজ পুঞ্জধারী।
সব বিধি অধম অবিদ্যা ভবভয় তমহারী। জয় ভারত…

এটা ঠিক যে গানের সংখ্যা অনেক বেশী। মাঝে মাঝে মনে হয় গান কাহিনীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করেছে। যেখানে সেখানে গজলের ব্যবহার নাটকের দৃষ্টিতে খেলো বলে মনে হয়। বহু দোষ থাকা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে এর ঘটনা বিন্যাসে লেখকের মুন্‌শিয়ানা আছে এবং এর দুই প্রধান বিরোধী পক্ষের চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি ছোট-ছোট যে ঘটনার সমাবেশ করেছেন তা অতীব প্রভাবশালী। হোসেনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী খালীফা য়জীদের যে চরিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে দর্শক মাত্রের মনেই বাঞ্ছিত ঘৃণার উদ্রেক করবে। তার নারকীয় কাণ্ড কারখানা এবং পৈশাচিক প্রবৃত্তির প্রকাশ অতি স্পষ্ট ভাবে রূপায়িত হয়েছে। অপর দিকে হোসেনের চরিত্রের মাহাত্ম্যগুলিও সংলাপের মধ্যে দিয়ে লেখক বেশ ভাল ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে

সক্ষম হয়েছেন। তাঁর গুণমুগ্ধ প্রায় সকলেই। তাঁর দৃষ্টিতে এমন স্বর্গীয় সুষমা বিদ্যমান যার প্রভাবে নিষ্ঠুর হত্যাকারীও অস্ত্রত্যাগ করে চরণে লুটিয়ে পড়ে। তিনি য়জীদকে খালিফা মানতে সম্মত নন কারণ সে এই পদের জন্যে অযোগ্য। সে অত্যাচারী, দুরাচারী, পাষণ্ড, নিষ্ঠুর, ধর্মবিরোধী ও লম্পট। তাই তিনি ইসলামের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর এই কার্যে আরববাসী হিন্দুরাও সহায়ক। দুই বিরোধী পক্ষের একটির শক্তির মূলে হলো মানুষের পশুবল এবং দ্বিতীয় শক্তির মূলে হলো আত্মিক শক্তি। য়জীদ অত্যাচারী ও হোসেন অত্যাচারিত, কাজেই সাধারণ গল্প হলে এর পরিণতি হতো য়জীদের পরাজয় এবং হোসেনের জয়। কিন্তু ইতিহাস তা বলে না; আর তাই নাটকটিকে ট্র্যাজিডি করতে লেখক বাধ্য হয়েছেন। কোথাও-কোথাও বড়-বড় সংলাপ থাকলেও ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে লেখক তার দীর্ঘ সূত্রতাকে অনুভূত হতে দেন নি। আবার কোথাও-কোথাও অতি ছোট-ছোট সংলাপের মাধ্যমে লেখক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মনে হয় এই নাটকটি যদি কিছু কাঁট-ছাঁট করে ব্যাপক ভাবে মঞ্চস্থ করা যেত তবে হয়তো ভারতের সাম্প্রদায়িক রক্তপাত অনেকটাই কমে আসতো। প্রেমচন্দ যে সাম্প্রদায়িকতার কতখানি বিরোধী ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য যে তাঁর কত কাম্য ছিল "কারবালা" তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(ঘ) প্রবন্ধ, অনুবাদ ও শিশুসাহিত্য

মুন্সী প্রেমচন্দ শুধুমাত্র ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখকই ছিলেন না। হিন্দী সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁর অজস্র অকৃপণ দানে, যার মধ্যে প্রবন্ধ, অনুবাদ ও শিশুসাহিত্যও উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধ—প্রেমচন্দ ছিলেন একজন উচ্চমানের প্রবন্ধ লেখক। এই প্রবন্ধ গুলি তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারার নিদর্শন। **"সাহিত্য কা উদ্দেশ্য"** প্রবন্ধে তিনি বলেছেন--"নীতি শাস্ত্র এবং সাহিত্য শাস্ত্রের লক্ষ্য এক। প্রভেদ শুধু উপদেশ দানের বিধিতে। নীতি-শাস্ত্র তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বুদ্ধি ও মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে কিন্তু সাহিত্য বেছে নেয় মানসিক অবস্থা এবং ভাবের জগৎকে। আমরা যা কিছু দেখি অথবা যা কিছুর মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হই তারই অভিজ্ঞতা এবং আঘাত কল্পনা জগতে প্রবেশ করে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। যে কবি অথবা সাহিত্যিকের মধ্যে অনুভূতির তীব্রতা

যত অধিক তাঁর সাহিত্য ততই আকর্ষণীয় এবং উচ্চমানের হয়। যে সাহিত্যের দ্বারা আমাদের মধ্যে সুরুচির উন্মেষ হয় না, যে সাহিত্য আমাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক তৃপ্তি প্রদান করে না, আমাদের মধ্যে শক্তি এবং গতি উৎপাদনে অসমর্থ, যে সাহিত্য আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য-প্রেম জাগায় না এবং মহৎ সঙ্কল্প এবং বাধাবিঘ্নকে জয় করবার দৃঢ়তায় উদ্‌বুদ্ধ করে না, তা আজ আমাদের নিকট অর্থহীন, এমনকি সাহিত্য নামেরও অযোগ্য।" (কুছ বিচার পৃষ্ঠা—৯

লক্ষ্যণীয় যে প্রেমচন্দ তাঁর সাহিত্যে কেবল সত্য এবং সুন্দরকেই সর্বাগ্রে স্থান দেন নি; তিনি শিবম্ কে সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর নিজের সমগ্র সাহিত্যে তাই আমরা এই তিনের সমন্বয় দেখতে পাই।

কথা শিল্প সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ অতি উচ্চ মানের। এই প্রবন্ধগুলি "কাহানী কলা" নাম দিয়ে তিন ভাগে প্রকাশিত হয়েছে "কুছ বিচার"-এ। তাঁর লেখা 'উপন্যাস,' 'উপন্যাস ও তার বিষয়,' 'জীবনে সাহিত্যের স্থান,' 'উর্দু, হিন্দী এবং হিন্দুস্তানী,' 'রাষ্ট্রভাষা হিন্দী ও তার সমস্যা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিও প্রণিধানযোগ্য।

প্রেমচন্দের প্রবন্ধগুলির সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য হলো সেগুলির অপরিসীম প্রসাদ-গুণ। অতি কঠিন ও জটিল বিষয়গুলিও সাবলীল গতিময়তায় ভাস্বর। ভাষার ওপর তাঁর আধিপত্য এমন যে বক্তব্য বিষয় কখনও ধোঁয়ার আবরণে আচ্ছন্ন হতে পারে না। তাঁর ভাবনা-চিন্তা সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ছিল অথচ ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন সত্যকে তিনি বিস্মৃত হন নি। "হিন্দু সভ্যতা ও লোকহিত" প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে লিখেছেন– "জীবনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক নিয়ম প্রয়োগ করা এবং লাভ-লোকসানের কথা ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত না হওয়া পশ্চিমী সভ্যতার লক্ষণ। স্বার্থ এবং লোভকে ক্ষণেকের জন্যেও এই সভ্যতা ভুলতে পারে না।" এই প্রবন্ধে যে সমস্ত অশ্রুত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা প্রেমচন্দের পাণ্ডিত্যের গভীরতা পরিমাপ করতে সাহায্য করে। অতি সাধারণ ভাষায় তিনি অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রমাণাদির দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ-ত্রুটি ও ভারতীয় সভ্যতার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রেমচন্দের প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার বিষয় বৈচিত্র্য জীবনীকার রূপে তিনি অলিভার ক্রমওয়েল, টমাস গেন্সবরো, মহারানী

ভিক্টোরিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখেছেন আবার স্বদেশী আন্দোলনের গতি প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেও বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি চিত্রশিল্প, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এমন কি গালিগালাজকেও নিজের প্রবন্ধের বিষয় করেছেন। রামায়ণ মহাভারতকেও বাদ দেন নি। সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি এই দুই মহাকাব্যের আলোচনা করেছেন। উর্দু কবি ও সাহিত্যিকদের রচনাগুলির উপর লিখিত সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি তাঁর দৃঢ় ধ্যান ধারণার প্রতীক স্বরূপ। তাঁর ইতিহাসভিত্তিক প্রবন্ধগুলি প্রমাণ করে যে তাঁর মনে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাঁর শেষ প্রবন্ধ "মহাজনী সভ্যতা"য় বর্তমান ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অধঃপতনের স্বরূপটি তিনি ছবির মত তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। তিনি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে মহাজনী সভ্যতা বলে চিহ্নিত করে স্পষ্ট প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে এই সমাজের এবং সভ্যতার সমস্ত কাজ কারবার পয়সাকে কেন্দ্র করেই চলে। শুধু ভারত নয় তিনি এ কালের সম্পূর্ণ বিশ্বের সমাজব্যবস্থাকেই মহাজনভিত্তিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ পৃথিবীতে এখন শোষক ও শোষিত এই দুই ভাগে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রবন্ধটি তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেই লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধের দ্বারা যেন তিনি তাঁর পূর্বেকার ভুল-ভ্রান্তির জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন। তিনি যেন মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। সাম্যবাদের প্রতি যেন তাঁর মন আরো আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর জীবনের আদর্শের প্রতি যেন তিনি বিশ্বাস রাখতে সক্ষম হচ্ছিলেন না।

প্রেমচন্দ বেশ কয়েকটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক রূপে নিযুক্ত থেকে বহু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বহু নতুন লেখক তৈরী করেছেন। নতুন লেখকদের পথ প্রদর্শন করে তিনি আজীবন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। জামানা, মর্যাদা, মাধুরী, জাগরণ এবং হংস প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যার কিছু কিছু "কুছ বিচার" এবং "প্রেমচন্দকে বিচার" এর কয়েকটি ভাগে সংকলিত হয়েছে।

জীবনী ও অনুবাদ সাহিত্য—জীবনীকার হিসেবে "মহাত্মা শেখ সাদী', 'দুর্গাদাস' এবং 'কলম, তলোয়ার আওর ত্যাগ" তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এছাড়া অনুবাদক হিসেবেও তিনি বহু মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তিনি জর্জ ইলিয়টের "সিলাস মেরীনার"-এর অনুবাদ করেন "সুখদাস" নাম দিয়ে যা

প্রকাশিত হয় বোম্বাই থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। এনাতোঁলের 'থায়স' এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় এই কলকাতা থেকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। অনূদিত গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'অহঙ্কার"। ১৯৮০ সালে তিনি গলস-ওয়ার্দীর বহু নাটকের অনুবাদ করেন। এর মধ্যে আছে হরতাল, চাঁদি কী ডিবিয়া, ন্যায় ইত্যাদি। তিনি বার্ণার্ড শ'র একটি নাটকেরও অনুবাদ করে প্রকাশিত করান "সৃষ্টি কা আরম্ভ" নাম দিয়ে।

শিশু সাহিত্য - কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এ সব ছাড়াও প্রেমচন্দ কিছু শিশু সাহিত্যও সৃষ্টি করে গেছেন। কুত্তে কী কহানী, জঙ্গল কী কহানিয়াঁ, রামচর্চা ইত্যাদি এই শ্রেণীর গ্রন্থ। আসলে 'দুর্গাদাস'ও বালোপযোগী পুস্তকই। এই সকল গ্রন্থে প্রেমচন্দের চিন্তাধারার আর এক অভিনব রূপ ফুটে উঠেছে যা অন্যত্র দুর্লভ। এই সকল গ্রন্থের ভাষা এক অপরূপ সারল্য এবং মাধুর্যমণ্ডিত।

প্রেমচন্দের চিঠি পত্রের অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে অন্যান্য লেখকদের পুস্তকে। পরকে আপন করে নেবার বা কাছে টেনে নেবার যে অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল তা এই চিঠিগুলিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে।



তৃতীয় অধ্যায়

প্রেমচন্দ সাহিত্যে নারী

হিন্দী কবি মৈথিলী শরণ গুপ্ত 'যশোধরা' নামক কাব্যে ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—

"অবলা জীবন হায় তুমহারী ইয়হী কহানী'
আঁচল মে ঁ হ্যায় দুধ ঔর আঁখো মে ঁ পানী।

পুরুষ শাসিত এই সমাজে নারীর দুর্দশার ছবিটি এই দুটি ছত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে নারীকে দেবী, মাতা, ভগিনী, ভগবতী, সতী ইত্যাদি কতই না গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে। অথচ আজও নারী যেন বাজারের পণ্য। যৌতুক ছাড়া তার বিবাহ দেওয়া যায় না। বধূরূপে শ্বশুরালয়ে এলেই তাকে আজীবন দাসী বাঁদির মুচলেকা দিয়ে দুবিসহ জীবন যাপন করতে হয়। পরিমাণ মত যৌতুকের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য না থাকলে স্বয়ং পিতামাতাই কোন দোজবরে বৃদ্ধের স্কন্ধে তাঁদের ফুলের মত মেয়েটিকে চাপিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না। নারীকে বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ, অকালে বৈধব্যবরণ এবং এ রকম আরো কত অত্যাচার অনাচারের বলি যে আজও হতে হয় তার সীমা নেই। প্রেমচন্দ নিজে এই সমস্যা-জর্জরিত সমাজের একজন সদস্য ছিলেন। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে নারী জীবনের সমস্যাগুলি নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রথম জীবনের লেখা প্রেমা, বরদান, সেবাসদন, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি উপন্যাসে গল্পের বিষয়বস্তু ছিল নারী জীবনের নানা সমস্যা। পণপ্রথা বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ, বালবিধবা, যুবতী বিধবা, পতিতা, নারীর আভূষণ প্রীতি, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, শোষণ ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি।

প্রেমচন্দ আমাদের সমাজের তথাকথিত বিবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়ে ছিলেন। জাতি, বংশ, গোত্র, গণ, কুলীন, অকুলীন—হিন্দু সমাজে কত না বাছাবাছি। এ সবের ওপর আছে টাকার খেলা। **'দো সখিয়াঁ'** গল্পের নায়ক বিনোদ বলে—" আমি বর্তমান বৈবাহিক প্রথা পছন্দ করি না। এই প্রথা তখন আবিষ্কৃত হয়েছিল যখন মানুষ সভ্যতার প্রারম্ভিক দশায় ছিল। তারপর পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু বিবাহ প্রথায় কোন

পরিবর্তন হল না। এই প্রথা বর্তমান যুগে অনুপযোগী।" বস্তুত, গল্পের নায়ক নয়—এ যেন লেখকের নিজের কথা। প্রেমচন্দের প্রতিভূ হয়ে 'গোদান' উপন্যাসে মেহ্‌তা বলছে, "বিবাহকে আমি সামাজিক চুক্তি বলে মনে করি। এই চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার পুরুষ বা নারী কারো নেই। সন্ধি করার পূর্বে আপনি স্বাধীন, সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর আপনার পাখনা কেটে যায়।" (গোদান—পৃঃ ৫৩)

বিবাহের মর্মান্তিক পরিণাম প্রেমচন্দ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অসংখ্য-বার। তাই তিনি চাইছিলেন একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। কিন্তু তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই মেহ্‌তাকে প্রশ্ন করা হলে সে স্পষ্টই বলে যে সে বিচ্ছেদের বিরোধী। (গোদান—পৃঃ ৫৩)। একটি প্রবন্ধে নিজের দোষ স্বীকার করে পরবর্তীকালে প্রেমচন্দ লিখেছেন- "প্রেমা উপন্যাসে বিধবার বিবাহ দিয়ে হিন্দু নারীকে আদর্শচ্যুত করা হয়েছিল।" (আজকল, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১৯৫২, পৃঃ ২০) কিন্তু প্রেমচন্দ নিজেই এক বাল বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন। তবে কি প্রকৃতপক্ষে প্রেমচন্দ বাল-বিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করেছেন অন্যদের নয়? তাহলে বিধবার অর্থকষ্ট কি করে দূর হবে? প্রেমচন্দ এজন্য স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বৈধব্য কত করুণ ও মর্মান্তিক তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে "প্রতিজ্ঞা" উপন্যাসে।

পণপ্রথার নিগূঢ় নিষ্পেষণে নির্যাতিত নারীর করুন আর্তনাদে যেন তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে উঠেছিল। পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে সমাজে কি নিদারুণ পরিস্থিতির উদ্‌ভব হয়, কিভাবে তা পারিবারিক সুখশান্তি ধ্বংস করে দেয় তার ছবি আছে তাঁর 'নির্মলা' ও 'সেবাসদন' উপন্যাসে। নির্মলা উপন্যাসে পণপ্রথার চাপে ষোড়শীর বিবাহ হয় এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। এই অমিল বিবাহের ফলে দেখা দেয় নানা সমস্যা। কিন্তু সমাজ সচেতন প্রেমচন্দ এই সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করার চেষ্টাও করেছেন।

প্রেমচন্দ তাঁর সাহিত্য-কর্মে বারবার একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর মূল্যায়ন সঠিক ভাবে করা হয় নি। নারীকে তিনি চার-দেওয়ালের মধ্যে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু নারী-পুরুষ হবে একে অপরের পরিপূরক। নারী গৃহস্বামিনী, সন্তান পালনের মূল দায়িত্ব তার। পারিবারিক সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাও তারই কর্তব্যের

অন্তর্ভুক্ত। পুরুষের কর্তব্য হল পরিবারের সদস্যদের ভরণ পোষণের সুবন্দোবস্ত করা। নারী পুরুষ একে অপরকে সাহায্য করবে। অসহযোগিতা নয় সহযোগিতা, মতানৈক্য নয় মতৈক্য, একে অপরের উন্নতির পথের বাধা নয়—সহায়ক হওয়াই পারিবারিক শান্তি ও উন্নতির পথ এবং তবেই নারী হবে প্রকৃত অর্থে জীবন-সঙ্গিনী। প্রেমচন্দ মেহেতাকে দিয়ে এ৽টি মহিলা সভায় ভাষণ দান করিয়ে বলেছেন "আপনাদের নিকট দান করার জন্য আছে দয়া, আছে শ্রদ্ধা আর ত্যাগ। পুরুষের নিকট দানের কি আছে? সে দেবতা নয় লেবতা। লেনেওয়ালা, গ্রহিতা .। সে অধিকারের জন্যে হিংসে করে সংগ্রাম করে, কলহ করে……আমি প্রাণীর বিকাশে নারীর স্থান পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করি; যেমন প্রেম এবং ত্যাগ ও শ্রদ্ধাকে হিংসা, সংগ্রাম এবং কলহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি। যদি আমাদের দেবীরা সৃষ্টি ও পালনের দেব মন্দির থেকে বেরিয়ে হিংসা ও কলহের দানবক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চান, তবে তাতে সমাজের কল্যাণ হবে না।" (গোদান—পৃঃ ১৩৩-৩৪

মেহতার এই বক্তব্য থেকেই আমরা প্রেমচন্দ নির্দেশিত নারীর কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। প্রেমচন্দ চেয়েছিলেন পরিবারের বাইরে মানুষের কর্মজগতে যেখানে হিংসা-দ্বেষ, মারামারি-কাটাকাটি, ক্ষমতা অধিকারের ঘৃণ্য স্পৃহা এবং সৎ-অসৎ উপায়ে ধন উপার্জনের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই নেই সেখান থেকে নারীকে সরিয়ে আনতে। কিন্তু সেজন্য তিনি নারী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না বরং তিনি চেয়েছিলেন নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটুক। তিনি চেয়েছিলেন আইন করে নয় সমাজ চেতনা জাগ্রত করেই নারী সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করা হোক। তাই সমাজসেবী মেহতা বলে—"আমি বলছি না যে দেবীদের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে এবং পুরুষ অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনই আছে। আমি বলছি না দেবীদের শক্তি অর্জনের প্রয়োজন নেই। আছে এবং তাদের প্রয়োজনই বেশী। কিন্তু সে বিদ্যা এবং শক্তি এই নয় যার দ্বারা পুরুষ এই পৃথিবীকে একটি হিংসাক্ষেত্রে পরিবর্তিত করেছে। যদি আপনারাও সেই বিদ্যা ও শক্তি অর্জন করেন তবে এই সংসার মরুভূমি হয়ে যাবে। আপনাদের বিদ্যা এবং আপনাদের অধিকার হিংসা ও ধ্বংসের নয়, সৃষ্টি এবং পালনের।" (গোদান পৃঃ ১৩৬)

এতে সন্দেহ নেই যে প্রেমচন্দ প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত নারীর কর্মক্ষেত্রকেই

শ্রেয় মনে করতেন। সেই ক্ষেত্রে নিজেকে সীমায়িত রেখে সেটাকে সংস্কার সাধন করে মানুষ তার গৃহকে অধিকতর সুন্দর ও শান্তির নীড় করে তুলুক যাতে জীবন যুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত পুরুষ ঘরে এসে মানসিক ও শারীরিক অবসাদ কাটিয়ে উঠে পরের দিনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। তিনি চান না যে ভারতীয় নারী পাশ্চাত্যের নারীর অন্ধ অনুকরণ করুক। তিনি বলছেন "পশ্চিমের নারী আজ গৃহস্বামিনী হয়ে থাকতে চায় না। ভোগের লালসাগ্নি তাকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছে। সে লজ্জা ও গরিমা যা তার সর্বাধিক মহোত্তম বিভূতি ছিল, চঞ্চলতা এবং আমোদ-প্রমোদের আগুনে আহুতি দিচ্ছে। এর ফলও ওরা ভোগ করছে। সমাজে গৃহ বলে আর কিছু থাকছে না, ঘরের রান্না আর বাবুদের মুখে রোচে না, তাই হোটেলি সভ্যতা গড়ে উঠছে। নারী সেখানে শুধু ভোগ্য পণ্য, বিলাসের সামগ্রী, নৃত্যের সঙ্গিনী।" (গোদান পৃ, ১৩৭)

প্রেমচন্দ "অভিলাষ" নামক গল্পে লিখছেন—"কিন্তু পুরুষই সব। নারী কিছু নয়। পুরুষ যথেচ্ছ ভাবে স্ত্রীকে বাইরে বের করে দিতে পারে। যখন একজন সম পরিশ্রমী নারীকে দুধে পড়া মাছির মত বার করে ফেলে দেওয়া যেতে পারে তখন বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় স্বামী-আশ্রিতা নারী নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে কি করে? বারবার সে অনুভব করে যে সে পত্নী নয় একজন বাঁদী।"

'বরদান' উপন্যাসে আমরা দেখেছি যে বাল্যকালের সাহচর্যে স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠা প্রতাপ এবং বিরজনের প্রেমকে তাঁদের অভিভাবকরা কোনো মূল্যই দেন নি। এই গভীর প্রেমকে উপেক্ষা করে বিরজনের বিবাহ দেওয়া হলো কমলাচরণের সঙ্গে; শুধু এই অজুহাতে যে সে এক উচ্চপদাধিকারীর পুত্র। কমলাচরণের চরিত্র সম্পর্কে একবারও খোঁজ খবর নেওয়া তাঁরা প্রয়োজন বোধ করলেন না। আর মজা এই যে বিরজন সতীসাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় কমলাচরণকে পতিত্বে বরণ করেই তাকে সংশোধন করার কাজে ব্রতী হয়। তার এই কাজে সাময়িক ভাবে কিছু সাফল্য লাভ করেও শেষ রক্ষা হয় নি। স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে গিয়ে সে তার পুরোনো স্বভাব ফিরে পায় এবং অকাল-মৃত্যু বরণ করে। নারীর সতীত্ব প্রেমচন্দের অতি প্রিয় বিষয়। কোনো অবস্থাতেই তিনি চান না নারী স্বেচ্ছায় সতীত্ব হারাক। বলপূর্বক সতীত্ব হরণের ঘটনা যে তাঁর গল্প উপন্যাসে নেই তা নয়। তবে স্বেচ্ছায় নৈব নৈবচ।

বহু গল্প উপন্যাসেই প্রেমচন্দ হিন্দু বিধবা নারীর সমস্যা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'প্রেমা' উপন্যাসে লেখক পূর্ণার মাধ্যমে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কমলাচরণ নিজ অভিনয় চাতুর্যে সরলা পূর্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এক দিন যখন কমলাচরণ একান্তে পূর্ণার উপর বলাৎকার করতে সচেষ্ট তখন পূর্ণা তার দুরভিসন্ধির আঁচ করতে সক্ষম হয় এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত চেয়ার তুলে তাকে প্রহার করে। কমলাচরণ আহত হয়। প্রেমচন্দ এখানেও নারীর সতীত্ব রক্ষা করেছেন যদিও উপন্যাসের পূর্ণা চরিত্রের পক্ষে চেয়ার ছুঁড়ে মারা অনেকটা অস্বাভাবিক তো বটেই অসম্ভবও মনে হতে পারে। পূর্ণাকে তিনি বিধবা আশ্রমে প্রেরণ করে মান বাঁচান। শেষ কালে আমরা তাকে কৃষ্ণ ভক্তির রসে আপ্লুত হয়ে জীবন কাটাতে দেখি। বস্তুতঃ এখানেই প্রেমচন্দ যেন বাস্তব থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে আদর্শের আড়ালে আত্মগোপন করতে চেয়েছেন। আসলে আদর্শচ্যুত হয়ে জীবন ধারণ করা প্রেমচন্দের কাম্য নয়। তিনি নিজে যেমন আদর্শবাদী ছিলেন তেমনি তাঁর প্রধান চরিত্রগুলিও আমরা আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে দেখি। এই আদর্শরক্ষার তাগিদে তাঁর উপন্যাসের ঘটনাগুলির স্বাভাবিক গতি বহু জায়গায় ব্যাহত হয় বা রুদ্ধ হয়। "সেবাসদন" উপন্যাসের সুমনের পক্ষে কি পতিতা পল্লীতে ঘর ভাড়া করেও সঙ্গীতকে সম্বল করে সতীত্ব রক্ষা করে দিন যাপন করা সম্ভব ছিল? আসলে বারবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয় যে প্রেমচন্দ ভারতীয় নারীকে আদর্শচ্যুত, দ্বিচারিনী বা ব্যভিচারিণী রূপে কল্পনা করতে সক্ষম নন। তিনি তাঁর এক পত্রে লিখেছিলেন—"আমাদের নারীর আদর্শ হল একই সঙ্গে ত্যাগ, সেবা এবং পবিত্রতা—ফলের আশা না করেই ত্যাগ, অসন্তুষ্ট না হয়েই সেবা এবং সীজারের পত্নীর মত পবিত্রতা যার জন্যে অনুশোচনা না করতে হয়।"

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সতীত্বের প্রতি হিন্দু নারীর এই যে অগাধ বিশ্বাস ও অটুট আস্থা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষ শাসিত সমাজের এক অমোঘ অস্ত্র। বিবাহ বন্ধনের দ্বারা নারীকে গোলাম করে রাখার যে মানসিকতা তৎকালীন সমাজে ছিল তিনি তার বিরোধী। তবু নারী লজ্জা, শীল ও সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে ব্যভিচারিণী হয়ে যাক এও তাঁর কাম্য নয়। তাঁর মতে তাহলে সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কর্পূরের মত উবে যাবে।

শরৎচন্দ্রের মতই প্রেমচন্দের নারী চরিত্রেও সেক্সের প্রাধান্য নেই। তাঁর নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারেও এ কথাটা প্রযোজ্য। ইন্দ্রিয় সুখের লালসার ওপর তিনি কখনও জোর দেন নি। মাতৃ হৃদয়ে সন্তানের প্রতি যে অপত্য স্নেহ অথবা ভগিনীর মনে ভ্রাতার প্রতি যে স্বর্গীয় ভালবাসা, মমত্ববোধ তার সুন্দর ছবিও আমরা প্রেমচন্দের বহু গল্পে উপন্যাসে পাই। তিনি স্পষ্টই বলেছেন মাতার কোনো বিকল্প নেই, আর তাই মাতৃস্নেহেরও কোন বিকল্প নেই। এ কথা তিনি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছিলেন। মাতার মনে সন্তানের প্রতি যে স্নেহ, মায়া, মমতা থাকে তা অন্য কোন মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে দুর্লভ। এ সত্য বহু স্থানে লেখক উল্লেখ করেছেন।

প্রেমচন্দের নারী পাত্রগুলি সাধারণত সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মানসিক প্রবণতাও যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি-প্রসূত তার উদাহরণও তিনি কতিপয় চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সফল হয়েছেন। গোদানের ধনিয়া যেন বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। কোন অন্যায় সে মুখবুজে সহ্য করার পাত্রী নয়! এ ব্যাপারে সে অসম সাহসী। নির্ভয়ে অবিচারের বিরুদ্ধে সে বারবার রুখে দাঁড়িয়েছে, আর তার সুফলও পেয়েছে। দারোগা পুলিশ ও গ্রামের সমস্ত মাতব্বরদের মুখে সে অপরিসীম তেজে কালি লেপন করে। সহজ, সরল, ধর্মভীরু স্বামীকে বিপদে-আপদে রক্ষা করে এবং তাকে ব্যবহারিক বুদ্ধি প্রদান করে ধনিয়া দেখিয়ে দিয়েছে যে নারীর মূল্য কি বা তার স্থান সমাজে কোথায়। বাইরে থেকে তাকে কঠোর মনে হলেও তার অন্তর কোমল, স্নেহসিক্ত, মায়া মমতায় ভরা।

শরৎ সাহিত্যের শেষ প্রশ্নের কমল এবং চরিত্রহীনের কিরণময়ীকে বাদ দিলে যেমন তাঁর অন্যান্য নারী চরিত্রে স্নেহ, ভালবাসা, মায়া মমতা, করুণা ইত্যাদির অনাবিল স্নিগ্ধ ধারা প্রবাহিত হতে দেখি প্রেমচন্দের গল্পেও অনেকটা তাই। উভয়ের নিকটই যেন পতিতা নারীও এ সকল সদ্‌গুণ থেকে বিবর্জিত নয়। নারীর অন্তরের সৌন্দর্যকে উভয় লেখকই পাঠকের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করতে সচেষ্ট।

গোদানের নায়িকা ধনিয়া ব্যতীত সোনা এবং গোবিন্দীও প্রেমচন্দের নারীর আদর্শ। সোনা যখন নিজের স্বামী মথুরার কুকীর্তির সংবাদ পায় তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সিলিয়াকে বলে—"তুই ঐ পাপিষ্ঠাকে লাথি কেন

মারলি না? দাঁতগুলো ভেঙে কেন দিলি না? ওর রক্ত পান করিস নি কেন, চীৎকার করলি না কেন?" সিলিয়াকে নির্বাক দেখে উন্মত্তের মত সোনা আবার বলতে থাকে—"তুই দাঁত দিয়ে ওর নাক কেটে নিলি না কেন? কেন দুহাতে ওর গলা টিপে দিলি না? পারলে আমি তোর চরণ ধূলি মাথায় ধরে নিতাম।" (গোদান, পৃঃ ২১২)। সতীসাধ্বী স্ত্রীর মুখ দিয়ে স্বামী সম্পর্কে এ রকম উক্তি প্রেমচন্দের নারী চরিত্রেই সম্ভব। প্রেমচন্দ যেমন নারীকে পাতিব্রত্য ধর্ম পালনরত দেখতে চেয়েছেন তেমনি চেয়েছেন যে বিবাহিত পুরুষও স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ ব্রত পালন করবে। এক নিষ্ঠতা উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতাও তিনি বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

গোবিন্দীর মধ্যে আমরা মাতৃত্বের চরম বিকাশ দেখতে পাই। ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা তার জীবনের আদর্শ। অপর নারীর প্রতি তার স্বামীর আকর্ষণ সে ভাল চোখে দেখে না। তার মনে আছে মালতীর প্রতি হিংসা কিন্তু তার কারণ এই যে তার স্বামী মালতীর নৈকট্য চায়, এ কথা সে বুঝেছে।

মেহতা তো স্পষ্ট বলেই ফেলে—"আমার মনে হয় নারী শুধু মা; এবং তার পরে অন্য যা কিছু তা শুধু তার মাতৃত্বের উপক্রম মাত্র। সংসারের বৃহত্তম সাধনা, সর্বোচ্চ তপস্যা, সর্বাধিক ত্যাগ এবং মহত্তম বিষয়।" আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মালতী স্বয়ং গ্রামের নারী সমাজের এই মহান ত্যাগ ও তপস্যা দ্বারা চমৎকৃত হয়ে ভাবতে বাধ্য হয় যে নারী-স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দাবীর সঙ্গে ভারতের নারী সমাজের সনাতন ও চিরন্তন ভাবধারাকে সম্পৃক্ত করে নতুন আদর্শে ভবিষ্যতের নারী সমাজকে গড়তে হবে। সে নতুন ভাবে উপলব্ধি করে যে ভোগবিলাস এবং সাজসজ্জার প্রতি নতুন যুগের নারীদের যে অকুণ্ঠ মোহ তা বাহ্যিক, তা স্বাভাবিক নারী সৌন্দর্যকে কৃত্রিমতার আবরণে ঢেকে ফেলে এবং এই আকর্ষণ অহঙ্কার থেকে উদ্‌ভূত ও সেবাধর্মের পরিপন্থী। সমাজের কল্যাণের স্বার্থেই যেমন নারীকে অধিকারের জন্যে সংগ্রাম করতে হবে তেমনি সমাজ কল্যাণের জন্যেই ভগবান প্রদত্ত নারীর বিশেষ গুণগুলিকে বর্জন না করে আয়ত্তে আনতে হবে। ত্যাগ, সেবা, সন্তান ধারণ ও পালন, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি নারীর এমন কতগুলি বিশেষ গুণ আছে যা পুরুষের একেবারেই নেই বা অপেক্ষাকৃত অতি কম। তাই এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্জন না করে গ্রহণ করাই বিধেয় এবং বাঞ্ছিত।

'রঙ্গভূমি' উপন্যাসের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনসেবকের কন্যা সোফিয়া রূপ ও

গুণের সমন্বয়ে যেন প্রেমচন্দের মানস কন্যা। প্রেমের এক অপরূপ সুষমা তার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। দয়া, ত্যাগ, বিনয়, এবং সহিষ্ণুতা এ সবের যেন এক প্রতিমূর্তি সোফিয়া। স্বয়ং রানী সাহেবা বলছেন—"ও দয়া এবং বিবেকের মূর্ত প্রতীক। আত্মত্যাগ তো তার অণু অণুতে ভরা।" মার ঔদ্ধত্যে ভরা ব্যবহারে এবং খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি তাঁর অন্ধ বিশ্বাসে সোফিয়া খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাতে থাকে। তাই তার আচার ব্যবহারে ভারতীয় নারী ধর্মের শাশ্বত ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বিনয়কে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, তার ব্যথা বেদনাকে নিজের ব্যথা-বেদনা বলে জ্ঞান করে। ভীলদের বস্তীতে থাকাকালীন সে বিনয়ের সেবা শুশ্রূষা করে স্ত্রীর মত। কিন্তু বিনয় যখন সোফিয়ার শারীরিক সাহচর্য চায় তখন সে স্পষ্টই জানিয়ে দেয়—"কিন্তু ক্ষমা কর; আমি কখনও এমন কাজ করবো না যাতে তোমার অপমান, তোমার অখ্যাতি অথবা নিন্দা হয়। আমার এ সংযম আমার জন্যে নয় তোমার জন্যে। আত্মিক মিলনে কোনো বাধা থাকে না, কিন্তু সামাজিক সংস্কারের জন্যে নিজের আত্মীয় স্বজন ও সমাজের নিয়মের আনুকূল্য আবশ্যক, তা না হলে সেটা লজ্জাজনক হয়ে দাঁড়ায়। আমার আত্মা আমাকে কখনও ক্ষমা করবে না, যদি তুমি আমার জন্যে মা, বাবা বিশেষ করে নিজের পূজনীয়া মা'র কোপ ভাজন হও এবং তিনি আমার সঙ্গে তোমাকেও কুলের কলঙ্ক ভাবেন। (রঙ্গভূমি—পৃঃ ৪৫৭)

সোফিয়া ও বিনয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়, তাই সোফিয়া নিজের প্রিয়তমকে সাবধান করে দেয়, তার ভুল ধরিয়ে দেয়। ওর এই সংযম বিনয়ের কল্যাণের নিমিত্ত, তাকে সম্ভাবিত কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা। সোফিয়ার এই স্বচ্ছ নিষ্কলঙ্ক প্রেমের একটা আদর্শ আছে যার ভিত ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রস্তরে নির্মিত। তাই বিনয়কে সে স্পষ্টই বলে—"বিনয়। বিপদের ক্ষুধা আছে আমার। যদি তুমি সুখ স্বাচ্ছন্দ সায়রে ভাসতে, যদি তোমার জীবন বিলাসিতাময় হত, যদি তুমি কামনা-বাসনার দাস হতে তবে হয়তো আমি তোমার কাছ থেকে আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিতাম। তোমার দুঃসাহস ও ত্যাগই আমাকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করেছে।" সোফিয়া পুনর্বার সেই একই কথা বলছে—"আমি তোমার নিকট নিজেকে বিলিয়ে দিই নি বরং তোমার সেবা, সহানুভূতি এবং দেশানুরাগের কাছেই নিজেকে সঁপেছি। তোমাকে আমার উপাস্যদেবতার আসনে বসিয়েছিলাম—তোমার

মধ্যে প্রভু যীশুর দয়া, ভগবান বুদ্ধের বৈরাগ্য এবং লুথারের সত্যনিষ্ঠা দেখেছিলাম।...প্রেম ও বাসনার মধ্যে প্রভেদ ততটাই যতটা প্রভেদ কাঞ্চন ও কাঁচের মধ্যে। প্রেমের সীমা ভক্তির সঙ্গে যুক্ত এবং তাতে মাত্রার প্রভেদ আছে। ভক্তিতে সম্মানের ও প্রেমে সেবা ভাবের আধিক্য থাকে।" (পৃঃ ১০৬-০৭)

ভারতীয় নারী প্রেমের প্রতিদান চায় না, সম্পদ শালী পুরুষই তার কাম্য নয়। সে স্বামীর ভালবাসার কাঙ্গাল, তার গুণের ভক্ত। খ্রীষ্টান মেয়ে সোফিয়ার মধ্যেও সেই চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। মেহতা সরোজকে বলে—"সত্যিকারের আনন্দ, বাস্তব শান্তি কেবল সেবাব্রতের মধ্যেই আছে। তার অধিকারের উৎসকেন্দ্র, শক্তির উদ্‌গমস্থল। সেবাই সেই সিমেণ্ট, যা দম্পতিকে জীবন ভোর স্নেহ ও সাহচর্যের বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে। বড় বড় আঘাতও তাতে ফাটল ধরাতে পারে না। যেখানে সেবার অভাব, সেখানেই বিবাহ-বিচ্ছেদআছে, আছে পরিত্যাগ ও অবিশ্বাস।" (গোদান, পৃঃ ১৩৮)

প্রেমচন্দ বলতেন যে পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণের মোহে ভারতীয় নারী সমাজ ভারতীয় ঐতিহ্য হারাচ্ছেন। "পশ্চিমে এদের (পুরুষের) ষড়যন্ত্র সাফল্য লাভ করেছে এবং দেবীরা প্রজাপতিতে পরিবর্তিত হয়েছেন। আমি এ কথা বলতে লজ্জা বোধ করি যে ত্যাগ এবং তপশ্যার ভূমি ভারতবর্ষেও এমনি একটি হাওয়া বইছে। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষিতা ভগিনীদের ওপর সেই জাদুদণ্ডের প্রভাব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।" (গোদান, পৃঃ ১৩৮)

প্রেমচন্দের যুগে পতিতা নারীর সমস্যা একটি বিরাট সামাজিক সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাই এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে তিনি বহু উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। জননী, জায়া, কন্যা এবং ভগ্নি-রূপিণী নারী কেন সুখের নীড় ত্যাগ করে অন্ধকারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেন ক্লেদাক্ত ও কণ্টকাকীর্ণ পথের পথিক হয় সে সম্পর্কে তিনি তাঁর সাহিত্যে বহু কারণ দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম হিন্দী উপন্যাস "**সেবাসদন**" এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই লেখা। সুমনের বিয়ে হয় নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহে কিন্তু দোজবরে। তার বাড়ির বিপরীত দিকে থাকে এক সুপ্রসিদ্ধ বাঈজী। সুমন দেখে সমাজের সমস্ত প্রকারের আচার অনুষ্ঠান পালাপার্বনে, এমন কি ধর্মানুষ্ঠানেও এই বাঈজীর কি কদর। সে অনুভব করে যে সে নিজ স্বামীর ঘরেও তিরস্কৃত, অবহেলিত, অবাঞ্ছিত। স্বামী গজাধর অন্যায় ভাবে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। একদিন মিথ্যে অভিযোগ করে

তাকে বহিষ্কার করে দেয় গজাধর। সে সৎপথে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু সমাজ তাকে যেন টেনে বাজারে নিয়ে যায়। অনন্যোপায় হয়ে সে ভোলী বাঈয়ের শরণাপন্ন হয়। সমাজ সংস্কারক বিট্‌ঠলদাসকে সে বলে --"আমি জানি যে আমি খুব নিকৃষ্ট কাজ করেছি। কিন্তু আমার তো অন্য কোনো উপায় ছিল না।····আমি এক উচ্চ কুলের কন্যা, পিতার অজ্ঞতায় আমার বিয়ে হয় এক দরিদ্র মূর্খ মানুষের সঙ্গে, কিন্তু দরিদ্র হলেও আমি অপমান সহ্য করতে পারতাম না। সমাজে যাদের অনাদর হওয়া উচিত তাদের আদর পেতে দেখে আমার মনে কুবাসনা জেগে উঠতো।" (সেবাসদন—পৃঃ ৮৪)

ভোলী বাঈয়ের সামাজিক সম্মান তাকে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল তা'ই সে সেদিকে আকৃষ্ট হয়। তার চঞ্চল প্রকৃতিও অবশ্য এ ব্যাপারে কিছুটা দায়ী।

"বেশ্যা" গল্পের নায়িকা মাধুরী স্পষ্টই বলে—"নারী সামর্থ্য থাকতেকখনো পয়সার জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয় না। যদি সে তা করে তবে জেনে নিও যে তার কোনো আশ্রয় ও অবলম্বন ছিল না" (বেশ্যা, মানসরোবর ২, পৃষ্ঠা ৫৩); নারীকে বেশ্যাবৃত্তিতে ঠেলে দেওয়ার উদ্যোক্তা পুরুষ ও তার নারীর প্রতি ব্যবহার। অবশ্য নারীকে পণ্য রূপে ক্রয়-বিক্রয় করবার জন্যে যে এক দল পাষণ্ড সক্রিয় তাও ঠিক। "**নির্বাসন**" ও "**নরক কা মার্গ**" গল্পে প্রেমচন্দ এই সব দালালদের মুখোস লে দিয়েছেন। নির্বাসন গল্পের 'মর্যাদা' কে এক দালাল জালে ফেলবার চেষ্টা করে আবার "নরক কা মার্গ" গল্পে বালবিধবাকে নারী-ব্যবসায়ের চক্রের সঙ্গে জড়িত এক বৃদ্ধা ভুলিয়ে ভালিয়ে বাজারে নামতে বাধ্য করে। এ ছাড়াও আছে ধনীর দুলালদের বাসনাচক্র। এরা টাকা পয়সা, ধন-দৌলত আর সম্পদের লোভ দেখিয়ে দালালের মাধ্যমে গৃহ বধূদের পর্যন্ত বাজারে টেনে নিয়ে আসে।

প্রেমচন্দ পতিতা নারীদের প্রতি কখনো ঘৃণাভাব পোষণ করেন নি। গণিকা হলেও সে তো নারী, ভারতীয় নারী যারা পতিব্রতা ধর্মকেই সর্বোচ্চ ধর্মের স্থান দেয়। তাই তিনি তাদের মধ্যেও নারীসুলভ সব গুণসম্পন্ন চরিত্রই অঙ্কন করেছেন। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা যা নারীর সহজাত আকাঙ্খা, করুণা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ যা নারীর সহজাত গুণ সবই এই পতিতাদের মধ্যে সুপ্ত থাকে। পরিস্থিতি তাদের এই গুণগুলিকে অবদমিত করে রাখে যা সমাজের সহানুভূতি ও স্নেহ পেলেই ফুটে উঠতে পারে। সমাজ সংস্কারকদের উচিত তাদের জন্যে স্বনির্ভর আশ্রম ইত্যাদি নির্মাণ করে সৎপথে ফিরিয়ে

আনা। প্রেমচন্দ এই পথই নির্দেশ করে দিয়েছেন। "বেশ্যা" গল্পের মাধুরী দয়াকৃষ্ণের সহানুভূতিশীল ও ছলনাহীন ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করে। সে পতিতা বৃত্তি ত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে দয়াকৃষ্ণ তাকে পত্নী রূপে স্বীকার করে নিতে সম্মতি দিতে পারে না। এখানেই আমাদের সমাজের সর্বাধিক বড় দুর্বলতা। পৌরুষের অভাবে মাধুরীর ভালবাসায় কোনো ছলচাতুরী নেই একথা জেনেও দয়াকৃষ্ণ তার উপর আস্থা রাখতে পারে না।

"গবন" উপন্যাসের নায়ক রমানাথ যখন পতিতা রমণী জোহরাকে গণিকাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে তখন জোহরা দৃপ্ত ভঙ্গিমায় জানিয়ে দেয় "মাফ করবেন, আপনি পুরুষদের পক্ষে বলছেন। বাস্তব এই—যে আপনারা এখানে আমাদের জন্যে আসেন, শুধু দুঃখ ভুলতে, কেবল আনন্দের জন্যে আসেন। আপনারা যখন বিশ্বাসের খোঁজই করেন না তখন তার হদিশ মিলবে কোথায়?"

"সেবাসদন" উপন্যাসে যেভাবে লেখক পতিতালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকেই অনুভব করা যায় পতিতা শ্রেণীর প্রতি লেখকের কতখানি দরদ বোধ ছিল। এই বর্ণনা পাঠ করলে পতিতাদের প্রতি পাঠকের ঘৃণার উদ্রেক হয় না—করুণা ও সহানুভূতিই জন্মায়। প্রেমচন্দের মুখপাত্র হয়ে পদ্ম সিং বলেছে —"ওদের ঘৃণা করার কোন অধিকার আমাদের নেই। ওদের প্রতি তাহলে ঘোরতর অবিচার করা হবে। আমাদেরই কুবাসনা, আমাদেরই সামাজিক অত্যাচার আমাদেরই কুপ্রথা ও রীতি-নীতিই তো পতিতার রূপ ধারণ করেছে। এই দালমণ্ডী আমাদেরই কলুষিত জীবনের প্রতিচ্ছবি, আমাদের পৈশাচিক অধর্মের সাক্ষাৎ রূপ। আমরা কোন মুখে এদের ঘৃণা করি? আমাদের কর্তব্য হলো ওদের সৎপথে নিয়ে আসা, ওদের জীবনকে সংশোধন করা।" বস্তুতঃ প্রেমচন্দ তাঁর সমগ্র রচনায় এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে এই সমস্যা পুরুষেরই সৃষ্টি। আমরা ভুলে যাই যে ওদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, আছে মান অপমানের প্রশ্ন। পতিতা সমস্যা সমাধানের জন্য চাই সহানুভূতি করুণা ও সমবেদনা-ভরা দৃষ্টি। লেখক পতিতালয়কে নগরের বাইরে গড়বার পরামর্শ দিয়েছেন। উদ্ধার আশ্রম গড়ে তোলার কথা বলেছেন এবং সমাজ সংস্কারের দ্বারা এই সমস্যাকে নির্মূল করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই সংস্কারের মধ্যে আছে পণ-প্রথা রদ করার কথা, অসম ও বালবিবাহ বন্ধ করার

জন্য সামাজিক চেতনা জাগ্রত করার কথা এবং বালবিধবা অথবা নিঃসন্তান বিধবার পুনরায় বিবাহ দানের কথা। শরৎচন্দ্রের মতোই প্রেমচন্দ পতিতা নারীকে দেখেছিলেন গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে। গণিকাবৃত্তি গ্রহণের পিছনে রয়েছে যে অশ্রুসজল কাহিনী তাকে অনুধাবন করেছিলেন গভীর আন্তরিকতায়। তাই শরৎচন্দ্রের পিয়ারী বাঈজী, কমললতা, সাবিত্রী, অচলার মতো প্রেমচন্দের সুমন, জোহরা, মাধুরী আমাদের মনে ঘৃণার বদলে সহানুভূতিই সৃষ্টি করে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রেমচন্দ তাঁর সাহিত্যে নারী জীবনের প্রায় সব সমস্যাগুলিকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই সমস্যাগুলির প্রধান কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে অধিকার বৈষম্যই অধিকাংশ সমস্যার কারণ। পারিবারিক জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতি অত্যাবশ্যক। একে অপরের পরিপূরক। স্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত পুরুষের পক্ষে একা জীবনকে অর্থবহ করে তোলা সম্ভব নয়। তাই নারীকে সম অধিকার প্রদান করে সমাজে তার মর্যাদা উন্নীত করতে হবে।

প্রেমচন্দ কতিপয় চরিত্রের মাধ্যমে এটাও স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন যে আজকের শিক্ষিত নারীরা সমানাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠছেন। তাঁরা গৃহের ভিতর ও বাহির দুই ক্ষেত্রেই সমান অধিকারের দাবী করছেন। এটা উচিৎ নয়। পাশ্চাত্যের এই অন্ধ অনুকরণের ঝোঁকটা বর্জন করাই ভাল। পারিবারিক ভার সাম্য বজায় রাখার জন্যই নারীর কর্তব্য গৃহের অন্দর মহলেই সীমাবদ্ধ থাকা ভাল। তবু এই রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও প্রেমচন্দই হিন্দী সাহিত্যে প্রথম নারী জাগরণের বার্তা বহন করে আনলেন, নারী মুক্তির পথ প্রদর্শন করলেন। তাই "সেবাসদনের" নায়িকা সুমন ইবসেনের Doll's House এর নায়িকা নোরার মতই স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অসহায় নারীকে নতুন পথ দেখায়।

———

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমচন্দ সাহিত্যে দেশপ্রেম

অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী,"

আদি কবি বাল্মীকির এই বাণীই বোধ করি দেশপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিভাষা। দেশ বিদেশের পণ্ডিতেরা বহু ভাবেই দেশ প্রেমের ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু রামের মুখ দিয়ে লক্ষ্মণকে যে উপদেশ মহাকবি এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দের দ্বারা দিয়েছেন তা আজও অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে।

সাধারণ ভাবে আমরা দেশপ্রেম বলতে বুঝি দেশের প্রতি ভালবাসাকে। কিন্তু দেশের মাটিকে ভালবাসাই কি প্রকৃত দেশপ্রেম? দেশ বলতে কি শুধুই দেশের নির্জীব মাটিকে বোঝায়? তা কিন্তু নয়। দেশ বলতে বোঝায় স্বদেশের মাটি, জল, বায়ু, পাহাড়, পর্বত, নদীনালা, বনজঙ্গল এবং সর্বোপরি দেশের মানুষ। দেশের এই মানুষগুলিকে ভালবাসতে না পারলে, তাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী না হতে পারলে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। দেশ ও দশের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করবার ক্ষমতা না থাকলে দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। প্রেমচন্দের মধ্যে ছিল এই অসীম ভালবাসা এবং ত্যাগ। তিনি শুধু তাঁর দেশটাকেই ভালবাসেন নি, দেশের মানুষগুলিকেও অন্তর দিয়ে ভালবেসেছেন।

প্রেমচন্দ তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন দেশের মুক্তিসাধনার জয়গান করে। তাঁর জীবনের প্রথম গল্পটিই তাঁর দেশপ্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে। এই গল্পটির শেষ বাক্যটি হলো—"মাতৃ ভূমির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণের শেষ রক্ত বিন্দু পৃথিবীর সর্বাধিক অমূল্য সম্পদ।" গল্পটির নাম **"দুনিয়াকা সবসে অনমোল রত্ন"** অর্থাৎ "দুনিয়ার সর্বাধিক অমূল্য রত্ন।" প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে কাঁচা হাতে লেখা এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে প্রেমচন্দের সেই উঠতি বয়সে তাঁর ধ্যান ধারণা কি ছিল। তাঁর প্রথম গল্প সংকলনের নামও তিনি রেখেছিলেন **"সোজেওঅতন"** (Sojevatan) অর্থাৎ "দেশপ্রেম।" এই গল্প সংকলনটির প্রথম গল্পটিও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক

আমেরিকা প্রবাসীর স্বদেশ প্রত্যাগমনকে কেন্দ্র করে। গল্পটি প্রথম পুরুষে লিখিত। বহু বৎসর পর স্বদেশ ভূমিতে স্থান পাওয়ার অভিলাষে এসেই যখন সে দেখে যে দেশ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে নিমজ্জমান তখন তার অন্তর এক অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে। তার মনে আঘাত হানে এখানকার মানুষের পরিবর্তিত সাজ-পোষাক, আচার আচরণ, ভাঙ্গা ইংরাজি বুলির ছড়াছড়ি, ধুমপানের রকমসকম। তার মনে হয়, "এ কোন দেশ। এ আমেরিকা, এ ইংলিস্তান, কিন্তু প্রিয় ভারতবর্ষ নয়।" তার পর যখন সে নিজ গ্রামে এসে পৌছোল তখন মনে হলো এ যেন তার অপরিচিত। তার শৈশব ও যৌবনের সাথীরা কেউ বেঁচে নেই। এক রাত্রের জন্যে বিদেশী মুসাফির হয়ে জনে-জনে আশ্রয় ভিক্ষে চেয়ে যখন সে হতাশ হলো তখন হঠাৎ তার বিস্মৃতির গভীরে যেন একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিল। একটা ধর্মশালা তৈরী হচ্ছিল দেখা যাক সেখানে আশ্রয় মেলে কি না। কিন্তু না, অর্দ্ধনির্মিত পোড়ো বাড়ির মত সে বুকে নিয়ে বসে আছে যত গুণ্ডা, জুয়াড়ী, মাতাল এবং অসামাজিক মানুষগুলোকে। হঠাৎ এক দল বৃদ্ধা নারী কণ্ঠের গানের কলি যেন তাকে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দেয় "প্রভু মেরে অবগুণ চিত্ ন ধরো।" সে তাদের পিছু নেয় এবং গঙ্গায় এসে উপস্থিত হয়। স্রোতস্বিনী গঙ্গা বয়ে চলেছে এবং ভক্তেরা পুণ্য সলিলে অবগাহন করছে। তার মনে হয়, না ভারতবর্ষ বেঁচে আছে, বেঁচে আছে ভারতের সেই সনাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তার মনে হয় সে যেন স্বদেশকে খুঁজে পেয়েছে। সেই গঙ্গার ধারে এই আশায় সে এক ছোট্ট কুটির নির্মাণ করে নিয়েছে যে তার দেহ যেন এই গঙ্গার জল ও মাটিতে মিশে যেতে পারে। আমেরিকা থেকে তার বৌ ছেলেরা বাবাকে ডেকে পাঠায় কিন্তু সে তা উপেক্ষা করে ভারতের মাটিতেই চিরমুক্তির আশায় দিন গোনে।

গল্পটি আজকে হয়তো অতি সাধারণ বলে মনে হতে পারে কিন্তু এর মাধ্যমে দেশের প্রতি যে অকুণ্ঠ অদম্য ভালবাসা ব্যক্ত হয়েছে তার মূল্য অনেক। দ্বিতীয় গল্পটির নাম হলো—"**সাংসারিক প্রেম ও দেশ প্রেম**।" এটা ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করার নায়ক দেশপ্রেমিক ম্যাৎসিনি বা ম্যাজিনিকে কেন্দ্র করে লেখা ও অনেকটা ঐতিহাসিক। ম্যাজিনির দেশপ্রেমের পাশাপাশি তার এক প্রেয়সী মেগডলীনের নিষ্পাপ মানব প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ১৮৭০ সালে যখন তিনি চিকিৎসার জন্যে ইংল্যাণ্ড অভিমুখে প্রস্থান করেন

তখন আল্পস্ পর্বতের পাদদেশে এক গ্রামে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। দেশপ্রেমের এক অকুণ্ঠ বাসনা বুকে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তিনি ইতালির নামোচ্চারণ করে গেছেন। আর মেগডলীন মেজিনির নামে উৎসর্গ করে নিজের বিরাট সম্পত্তিকে একটি আশ্রমে পরিণত করে প্রাণ বিসর্জন দেন। আজও সেই আশ্রমে বহু দরিদ্র ও সাধু সন্ন্যাসী নিরুদ্বেগে কাল কাটায়।

এই প্রথম গল্প সংকলনটির চতুর্থ গল্পটির নাম হলো **'শেখ মখমুর'**। এটিও যুদ্ধ বিগ্রহ ও দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গের কাহিনী। দেশপ্রেমের এমনি অজস্র টুকরো টুকরো ছবি প্রেমচন্দের সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। **জেল, পত্নী সে পতি, শরাব কী দুকান, জুলুম, সমরযাত্রা** এবং **অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক গল্পগুলি** তাঁর দেশের ও দেশবাসীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ভালবাসা ব্যক্ত করে। রাজপুত রাজাদের দেশাত্মবোধে তিনি যেন নিজেই চমৎকৃত, আত্মহারা। তাই তাঁদের জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে **রাণী সারন্ধা রাজা হরদৌল** এর মত ত্যাগ ও তিতিক্ষাপূর্ণ গল্প লিখেছেন। রাজপুতদের দুর্জয় সাহসের ছবিও তিনি বহুগল্পে এঁকেছেন। এক দিকে যেমন তিনি দেশপ্রেমিকদের গুণগান করেছেন তেমনি দেশদ্রোহিতার মনোভাবকে নানা ভাবে ব্যঙ্গও করেছেন। **"আদর্শ বিরোধ"** গল্পে দয়াকৃষ্ণ মেহতা ইংরেজ শাসককুলের গুণগ্রাহী। তাদের দয়া দাক্ষিণ্য ও ঔদার্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্ত্রী রাজেশ্বরীও তাদের গুণের পূজারী। তাঁর ধারণা ইংরেজরা বিনয়ের প্রতিমূর্তি।" মিঃ মেহতা বলেন—"ইংরাজরা কত সজ্জন এবং বিনয়শীল।" তাঁদের এই ধারণার মূলে হল মেহতা সাহেবের পদোন্নতি। মেহতার পুত্র বালকৃষ্ণ থাকে বিলাতে। সে পিতার নিকট পত্র লিখে জানায়—"তুমি জাতির শত্রু, ধূর্ত্ত, স্বার্থান্ধ, দুরাত্মা।" (মানসরোবর—পৃঃ ২০০) স্বামী-স্ত্রী যখন পুত্রের এই অধঃপতনের কথা চিন্তা করে বিব্রত বোধ করছেন তখন মেহতা সাহেব "লণ্ডন টাইমস" পত্রিকার প্যাকেটটা খুলে পড়তে গেলেন; কিন্তু পড়া আর হলে না। প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা সংবাদ—"লণ্ডনে ভারতীয় দেশভক্তদের সমাবেশ, মাননীয় শ্রী মেহতার ভাষণের প্রতি ক্ষোভ, শ্রী বালকৃষ্ণ মেহতার বিরোধিতা এবং আত্মহত্যা।" সংবাদে প্রকাশ সে আত্মহত্যার পূর্বে একটি চিরকুট লিখে গেছে "আজ সভায় আমার সম্মান পদদলিত হয়েছে। আমি এই অপমান সহ্য করতে পারছি না। আমার

পূজনীয় পিতার প্রতি এমন নিন্দাসূচক কতই না দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হবে। এই আদর্শের বিরোধ সমাপ্ত হওয়াই ভাল। সম্ভবত আমার জীবন তাঁর নির্দিষ্ট পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। ভগবান আমায় শক্তি দিন।" পিতা-পুত্রের বিপরীতমুখী এই আদর্শের সংঘাতে দেশপ্রেমিকের এই আত্মহত্যা মহান আত্মত্যাগেরই সমকক্ষ। একজন স্বদেশে থেকে বিদেশী শাসকের পদলেহন করে জীবন ধন্য মনে করছেন আর তাঁরই পুত্র সেই বিদেশী শাসকের দেশে থেকে পিতার ঘৃণ্য পদলোলুপতা দেখে ক্ষুন্ন, অপমানিত ও লজ্জিত। তার হৃদয়ে যে স্বদেশের প্রতি আছে অফুরন্ত ভালবাসা। গল্পটি দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯২১ সালের গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব আমরা প্রেমচন্দের বহু গল্পেই পাই। চাকমা, লাগ ডাট, লাল ফিতা, আদর্শ বিরোধ, সত্যাগ্রহ, দুঃসাহস ইত্যাদি কতিপয় গল্প তো স্পষ্টতই এই আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত।

পরবর্তী যুগে যখন গান্ধীর প্রভাব স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর আরো ঘনিষ্ট-ভাবে পড়ে তখন "জুলুস" এর মত গল্প লেখেন প্রেমচন্দ। এ গল্পে স্বাধীনতা-কামীদের শোভাযাত্রা বেরোয় যার গতিরোধ করে অশ্বারোহী বৃটিশ শাসকের পেটোয়া পুলিশ দল। অশ্বের পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে প্রাণ দেয় বৃদ্ধ নেতা। শহরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। জনতা রোষে ফেটে পড়তে চায় কিন্তু তাদের সংযত করে নেতারা শান্তি ফিরিয়ে আনে। হিংসাশ্রয়ী জনরোষকে গান্ধীর পথে চলতে আদেশ দেওয়া হয়। নেতারা এই বলে সন্তুষ্টি লাভ করেন যে তাঁরা জনতার সহানুভূতি পেয়েছেন। অনেকে এ ধরণের অহিংস আন্দোলনকে নিরর্থক ও হাস্যাস্পদ বলে অভিহিত করেন কিন্তু এই শোভাযাত্রা যে দেশবাসীর মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের অন্তিম পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা তারা বুঝতে চান না। "জেল" গল্পের মৃদুলা এই শোভাযাত্রার সমর্থনে বলে - "লোকেরা বলে, শোভাযাত্রা বার করলে কি হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে আমরা জীবিত, অটল এবং সংগ্রামভূমি থেকে পিছু হটি নি।" (জেল, মানসরোবর ভাগ-২, পৃষ্ঠা—১৪)

"হোলী কা উপহার" গল্পে জনতা বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ করে, "মৈকু" গল্পে স্বয়ংসেবকরা মদের দোকানের সম্মুখে ধরনা দেয়। "তাবান" গল্পে ছকৌড়ীলাল বিদেশী বস্ত্রের দোকানের কংগ্রেসের

সীল ভেঙে বিদেশী বস্ত্র বিক্রী করে দারিদ্রের তাড়নায়, কিন্তু নেতাদের বোঝানোর ফলে সেও তাদের সঙ্গী হয় এবং বাড়ি জামীন রেখে কর শোধ করে।

প্রেমচন্দ ছাত্রদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন যৌবনে উপনীত ছাত্র সমাজের অসীম শক্তিকে দেশের কাজে নিয়োজিত করতে। তাই "আহুতি" কাহিনীর বিশ্বম্ভর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে স্বেচ্ছাসেবকদের দলে নাম লিখিয়ে দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করে। আনন্দ তাকে বারবার বাধা দিয়েছে কিন্তু বন্ধুকে সে ফেরাতে পারে নি। বিশ্বম্ভর গ্রামে গিয়ে দেশ ও দশের কাজে মেতে ওঠে।

'সমর যাত্রা' গল্পের গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষ কোদই-চৌধুরী ও বৃদ্ধা নোহরী বহিরাগত শোভাযাত্রীদের গ্রামে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে যায়। আসলে প্রতিবাদে মুখর সত্যাগ্রহীদের অহিংস অন্দোলনকে যারা নিরর্থক বলে অবহেলা করেন তাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্যেই প্রেমচন্দ বহু গল্পে এরকম ঘটনার সমাবেশ করেছেন।

শুধু গল্পে ও উপন্যাসেই নয় প্রেমচন্দের প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাগুলিতেও তাঁর দেশপ্রেমের স্পর্শ লেগে রয়েছে। তাঁর লেখা প্রবন্ধ "স্বদেশী আন্দোলন", "হিন্দু সভ্যতা এবং লোকহিত", "রামায়ণ ও মহাভারত", "পুরানা জামানা নয়া জামানা" ইত্যাদিতেও আছে তাঁর স্বাদেশিকতার পরিচয়। তাঁর বহু ভাষণে তিনি তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণর বা উচ্চপদস্থ চাটুকারদের ভারতবিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকারও সমালোচনা করে বহু উদাহরণ দিয়ে এ কথা প্রমাণিত করেছেন যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারকদের দ্বারাই প্রথম জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী আরম্ভ হয় নি। বরং যীশুর জন্মের বহুপূর্ব থেকেই এ দেশে দরিদ্রের সেবা, রুগীদের চিকিৎসা, সাধারণের জন্যে জলাশয় নির্মাণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যে, গুপ্তসাম্রাজ্যে এমন প্রজাহিতকারী বহু সংস্থা ছিল যাদের আদর্শ ছিল মানবসেবা। "হিন্দু-সভ্যতা আওর লোকহিত" প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক নিয়ম প্রয়োগ করা এবং লাভ ও ক্ষতির কথা ক্ষণিকের জন্যেও বিস্মৃত না হওয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষণ। এই সভ্যতা স্বার্থ এবং লাভের কথা ক্ষণিকের জন্যেও ভুলতে পারে না। যদি তারা ঔদার্য

দেখায় তবে তা আলিফ লায়লার সেই দেবের উদারতার মতই হয় যে মানুষদের ধরে কয়েদ করে তাদেরকে বাদাম খাওয়াতো যাতে তাদের শরীরে মাংস বৃদ্ধি হয় এবং মাংসটা বেশ স্বাদিষ্ট এবং পরিমাণে বেশী হয়।" প্রেমচন্দ বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণাগুলির ওপর আলোকপাত করে তাঁর দেশপ্রেমই ব্যক্ত করে গেছেন।

কিন্তু এ সবই হলো দেশপ্রেমের সাধারণ বহিপ্রকাশ। প্রেমচন্দের উপন্যাসগুলিতে এই দেশপ্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ব্যাপ্তিত হয়েছে ব্যাপক ভাবে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে তা সীমিত নয়। এই দেশের সাধারণ মানুষগুলির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর বেশীরভাগ উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এ দেশের পদানত দরিদ্র অসংখ্য নিম্নজাতির মানুষগুলিকে এমনি অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন তিনি যে তাঁর কোনো উপন্যাসেই তিনি তাদেরকে ভুলতে পারেন নি। সেবাসদন, প্রতিজ্ঞা, প্রেমাশ্রম, কর্মভূমি, রঙ্গভূমি, গোদান সমস্ত উপন্যাসের উপজীব্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে এই নিপীড়িত, নিরন্ন জনগণই। তিনি চেয়েছেন এদের দুরবস্থার প্রতি সাধারণ শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এদের প্রতি অহরহ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে আমরা যে অন্যায় অবিচার করি তার প্রতিবাদ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। অশিক্ষিত সহজ সরল গ্রামের মানুষগুলিকে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সদস্যরা কি ভাবে শোষণ করে চলেছে তা তিনি ছবির মত করে তাঁর উপন্যাসে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিদেশী শাসকদের অত্যাচার অনাচার ও শোষণ তো স্বাভাবিক। কিন্তু যখন স্বজাতির লোকেরাই দীন দরিদ্র ও অশিক্ষিত গ্রামের মানুষগুলিকে নিষ্ঠুরতম উপায়ে শোষণ করে সগর্বে তা প্রচার করে তখন প্রেমচন্দ যেন মর্মাহত হয়ে যান। তাদের প্রতি করুণা ও সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় ভরে ওঠে।

বিংশ শতাব্দির এই শেষাংশে যখন মানুষ বিশ্বমানবতাবাদ ও বিশ্বরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে তখন অনেকে দেশপ্রেমকে সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে উপহাস করছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে না ভালবাসতে পারলে বিদেশ ও বিদেশীকে ভালবাসা যায়না। যে লোক নিজের জন্মভূমিকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতে সক্ষম নয় সে তো নরাধম, কৃতঘ্ন, মানুষ

নামের অযোগ্য ; কাজেই শিক্ষার প্রথম পাঠ হিসেবে স্বদেশকে ভালবাসতে শিখতে হবে। স্বদেশের মানুষগুলিকে ভালবাসতে হবে। তবেই না সে মনটাকে উচ্চস্তরে উন্নীত করতে পারবে যেখানে সে মানুষে মানুষে প্রভেদ দেখবে না, যেখানে সে বিশ্বমানবতাবাদকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। প্রেমচন্দ-সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা তাঁকে সেই উচ্চ মানবতাবাদের স্তরে উপনীত দেখতে পাই।

প্রেমচন্দ-সাহিত্য পাঠ করে আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা স্পষ্ট ছবি প্রত্যক্ষ করতে পারি। ব্রিটিশ অপশাসনে কি ভাবে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছিল এবং কি পরিস্থিতিতে ভারতবাসীরা ঐ অপশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল তার ক্রমবর্দ্ধমান ছবিও আমরা তাঁর সাহিত্যে দেখতে পাই। ভারতবর্ষের এক বৃহৎ ভূখণ্ডে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে প্রেমচন্দ স্বয়ং কারাবরণ করেছেন।

"প্রেমচন্দ স্মৃতি" গ্রন্থে শ্রীবনারসী দাস চতুর্বেদী তাঁকে লেখা প্রেমচন্দের কয়েকটি পত্রের উল্লেখ করেছেন যাতে তিনি মনের বাসনা উন্মুক্ত করে বলছেন—"আমার কোনো আকাঙ্খা নেই। এক্ষণে তো সর্বোচ্চ আকাঙ্খা এই যে আমরা যেন স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হই। ধন বা যশের লালসা আমার নেই। খেয়ে পরে বেঁচে আছি। মোটর আর বাংলোর স্বপ্ন আমি দেখি না। হাঁ, এটুকু বাসনা অবশ্যই আছে যে দু-চারটি উৎকৃষ্ট পুস্তক যেন রচনা করতে পারি এবং সেগুলির উদ্দেশ্যও যেন "**স্বাধীনতাই**" হয়। (পৃঃ—১৩৬) এই একটি পত্রের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক প্রেমচন্দকে চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

প্রথিতযশা উর্দু সাহিত্যিক আশফাক হুসেনও প্রেমচন্দের সংস্পর্শে এসে এবং উর্দু কথা সাহিত্যের অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন তা ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন—"কিন্তু সর্বোপরি প্রেমচন্দ ছিলেন দেশভক্ত। তিনি সামাজিক ও ধার্মিক বাদবিবাদের থেকে সর্বদাই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তিনি পা থেকে মাথা অবধি ছিলেন ভারতবাসী, আর ভারতবাসী। (প্রেমচন্দ স্মৃতি—পৃঃ ৪) দেশের প্রতি প্রেমচন্দের সেই নিখাদ ভালোবাসার পরিচয় আছে তাঁর সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে।

———

পঞ্চম অধ্যায়

প্রেমচন্দ সাহিত্যে শোষণ

ম্যাক্সিম গোর্কী লিখেছিলেন "আমি চলতে চলতে দেখি ম্লান মুখের সারি। সেই সব ম্লান মূক মুখগুলি আমাকে মুখর করে তোলে।" প্রেমচন্দও কলম ধরেছিলেন সেই ম্লান মুখগুলির জন্যই যারা যুগ-যুগ ধরে সমাজে নানাভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত। তাঁর কাহিনীগুলির সর্বত্র আছে সমাজের মালিন্য, ক্লেদ ও তথাকথিত নির্লজ্জ শোষণের কাহিনী। বিশেষ করে নীচুতলার মানুষের জীবনকে তাঁর মত এমন গভীর ভাবে আর কেউ রূপায়িত করেন নি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজকে তিনি যেন অবহেলার চোখে দেখেছিলেন। প্রেমচন্দ-সাহিত্যে পাতার পর পাতায় লেখা হয়েছে সমাজের সেই উপেক্ষিত মানুষগুলির কথা যারা থাকে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, পরণে যাদের জোটে না বস্ত্র, গ্রীষ্মে, বর্ষায় বা শীতে মাথার উপর থাকে না আচ্ছাদন, গ্রামের জমিদারের অনন্ত অসীম ইচ্ছাপূরণের যারা যন্ত্র এবং নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, মহাজন ও ধর্মের ভেকধারীদের নিদারুণ লোভ ও লালসার যারা শিকার। শোষণের জাঁতাকলে তারা নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে এবং শোষক সমাজ অক্টোপাশের মত তাদের সর্বস্ব গ্রাস করছে। দু-বেলা দু-মুঠো অন্নের জন্য লড়াই করে তারা রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত-শ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত। প্রেমচন্দ কলম ধরেছিলেন এদেরই জন্যে। বাঁচার জন্য যারা সংগ্রাম করছে তিনি তাদেরই দোসর। কিন্তু প্রেমচন্দ সাহিত্যে শোষণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে প্রথমে জানতে হবে প্রেমচন্দের মানসিকতাকে।

গান্ধিবাদ না মার্ক্সবাদ?—প্রেমচন্দ তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন দেশের মুক্তি সাধনার নান্দী গেয়ে, বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করবার স্বপ্নে তিনি ছিলেন বিভোর। ভারতবর্ষে গান্ধিজীর আগমনের বহু পূর্বেই প্রেমচন্দ যে আদর্শবাদকে ভিত্তি করে সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন তা ছিল একান্ত ভাবেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির

ঐতিহ্যবাহী। ত্যাগ ও তিতিক্ষাই ভারতীয় জীবন-বেদ, সেবা ও করুণা তার জীবন-পথে চলার পাথেয়। হিংসা করুণার পরিপন্থী। ভারতীয় দর্শন বিশ্বাস করে যে হৃদয় পরিবর্তনের দ্বারা 'কু' কে 'সু' তে পরিবর্তিত করা সম্ভব। ভারতের এই জীবনদর্শনকে পাথেয় করেই প্রেমচন্দ তাঁর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত করেন। তাই রাজনীতিতে গান্ধিজীর আবির্ভাবের পূর্বে রচিত "প্রেমাশ্রমে" যে সত্যাগ্রহের ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা তাঁরই কল্পিত ধার করা নয়। অথবা বলা যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় গড়ে ওঠা স্বদেশী ও বয়কটের আদর্শে রচিত। বহু সমালোচক বলে থাকেন যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সত্য, সেবা, করুণা, ভারতীয় সংস্কারের প্রতি আস্থা প্রভৃতি জীবনাদর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন গান্ধিবাদ থেকে। তাঁরা ভুলে যান যে প্রেমচন্দের গান্ধি-পূর্বোত্তর সাহিত্যের মূল উপজীব্যও ছিল মানুষের এই গুণ গুলিই। বিশ্বমিত্র দ্বারা প্রকাশিত "প্রেমচন্দ সংখ্যায়" তিনি পরবর্তীকালে লেখেন—"আমি গান্ধিবাদী নই, কেবল গান্ধিজীর change of heart এ বিশ্বাস করি।" গান্ধিজী সম্পর্কে তাঁর অপর মন্তব্য হল—"আমি গান্ধিজীকে না দেখেই তাঁর শিষ্য হয়ে গিয়েছিলাম।" তিনি আরো বলেন, "তার মানে তিনি যা করতে চান তা আমি অনেক আগেই করে ফেলি; এর অর্থ এই যে আমি তাঁর নৈসর্গিক শিষ্য।" অর্থাৎ তাঁর কল্পিত পথ এবং গান্ধিজীর পথ এক। মনে রাখতে হবে যে রুঠি-রাণী, বরদান, প্রেমা, প্রতিজ্ঞা, সেবাসদন ও প্রেমাশ্রম গান্ধিজীর ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশের পূর্বেই লিখিত হয়েছিল। তাই এই গ্রন্থগুলিতে গান্ধিবাদের প্রভাব অনুসন্ধান করার অর্থ হলো বাস্তবকে অস্বীকার করা।

তবে গান্ধিজীকে দর্শনের পর তিনি মনে-মনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি গান্ধিবাদের জোয়ারেই নিমজ্জিত ছিলেন। তাঁরই প্রভাবে প্রেমচন্দ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০—২২ ঝাঁপিয়ে পড়েন। টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত প্রেমচন্দ যে মানবতাবাদকে ইতিপূর্বে তাঁর সাহিত্যে গ্রহণ করেছিলেন, অতঃপর মহাত্মা গান্ধির প্রভাবে তা এক বিশেষ রূপ পেলো। প্রেমচন্দ স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে তাঁর রচনায় টলস্টয়ের প্রভাব ছিল। মনে রাখতে হবে গান্ধিজীও টলস্টয়ের ভাবশিষ্য ছিলেন। ১৯১৮-১৯ সালে রচিত 'প্রেমাশ্রম' উপন্যাসেই প্রেমচন্দ আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত জমিদার প্রেমশঙ্করকে

দিয়ে মন্তব্য করিয়েছেন "লাঙল যার জমি তার।" এই সিদ্ধান্তের প্রতি অটুট বিশ্বাস ছিল তাঁর এবং তৎকালীন ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রগতিশীল চিন্তাধারা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি যেন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনই চেয়েছিলেন। মহাজন এবং সামন্ততান্ত্রিক এই সমাজ ব্যবস্থার মূলে আঘাত হেনে এই নীতিহীন সমাজের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণার ভাব জাগাতে চেয়েছিলেন—এমন ঘৃণা যাতে মানুষের মনে বিদ্রোহ জাগে ও অত্যাচারী মহাজন ও জমিদার শ্রেণী তাদের রীতি-নীতি এবং মানবিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। বলাবাহুল্য তাঁর কল্পনার বিদ্রোহ হিংসাশ্রয়ী নয়। এই বিদ্রোহ সত্যাগ্রহের পথে। গান্ধিবাদ তাঁর মধ্যে এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে শোষিত মানুষের সমস্যাগুলিকে সার্থকভাবে তুলে ধরলেও শেষ পর্যন্ত আদর্শের আশ্রয় নিয়ে বাস্তববাদ থেকে তিনি দূরে সরে গেছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি সকলেই শেষ মুহূর্তে অহিংসার পথ বেছে নেয়। সকলেরই পথ আত্মহননের পথ, সত্যাগ্রহের পথ। 'কায়াকল্পের' নায়ক চক্রধর, 'রঙ্গভূমি'র সুরদাস, 'কর্মভূমি'র সমরকান্ত—সকলেই অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারাই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে চায়। ইতিপূর্বে রচিত 'প্রেমাশ্রমে'ও অত্যাচারিত মনোহর ও তার পুত্র বলরাজ যখন হিংসার পথে অগ্রসর হলো তখনি তিনি একজনকে জেলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করলেন এবং জমিদারের স্বভাব-চরিত্রে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখিয়ে বলরাজকে শান্ত করলেন। বলরাজ রুশদেশের রক্তাক্ত বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত। সে উগ্রপন্থী; সে অত্যাচারের প্রতিবাদ করে। তবু বিপ্লবের পথে না গিয়ে সেও আশ্রয় নেয় 'প্রেমাশ্রমে'। এই সময় তাঁর উপন্যাসগুলিতে শোষকের প্রতি এমনভাবে ঘৃণা জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে লোকে শোষণকে ঘৃণা করতে শেখে—তার উদ্যোক্তাদের নয়। তাঁর মতে আজকের সমাজ ব্যবস্থাই এই শোষকদলের সৃষ্টি করেছে। এর জন্য শোষকরাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী নয়।

এই পর্বে গান্ধিবাদের এত গভীর প্রভাব তাঁর ওপর ছিল যে হিংসাকে তিনি সর্বদাই বর্জন করতে চেয়েছেন এবং সেই যুগের উত্তাল হাওয়া, রক্ত মাতাল করা আন্দোলন ও স্বদেশ চেতনায় ভরপুর হয়েছে তাঁর সাহিত্য। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর চিন্তার দিক বদল হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন গান্ধিজীর হৃদয় পরিবর্তনের টেকনিক আত্মঘাতমূলক হতেও পারে। আদর্শের বেড়াজাল ছিন্ন করে প্রেমচন্দ ক্রমশঃ বাস্তবমুখী হলেন। ১৯১৭ সালের

রুশ বিপ্লব তাঁকে যে গভীর ভাবেই নাড়া দিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে তাঁর রচনায়। প্রেমাশ্রমের নায়ক বলরাজ গ্রামের কৃষকদের উদ্দেশ্য করে বলে, "তোমরা এমন হাসছো যেন কৃষকরা মানুষই নয়। জমিদারের বেগার খাটতে তাদের জন্ম। কিন্তু একটা চিঠি এসেছে আমার কাছে তাতে লেখা আছে যে রাশিয়ায় কৃষকের রাজত্ব। তারা যা চায় তাই করতে পারে... সেদিনের কথা। কৃষকরা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে এবং কৃষক শ্রমিক মিলিত হয়ে পঞ্চায়েত প্রথায় রাজ্যশাসন করছে।" "প্রেমচন্দ ঘর মে" গ্রন্থেও শিবরানীদেবী লিখেছেন প্রেমচন্দ তাঁকে বলেছিলেন "রুশ এমন একটি দেশ যেখানে গরীবরা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেখানে ধনী জমিদারদের রাজত্ব শেষ হয়েছে।" তবে রুশ বিপ্লব তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিলেও ঠিক তখনই তাঁর মনে সাম্যবাদী ছোঁয়া লাগে নি। কিন্তু গান্ধীবাদকে বাস্তবের আলোয় যাচাই করতে গিয়ে অবশ্যই তাঁর চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদ দিয়ে যাত্রা শুরু করে, জাতীয়তার বেড়া ডিঙিয়ে সাম্যবাদের দিকেই তাঁর চিন্তাধারা ধাবিত হয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে যুগ যুগ ধরে যারা লাঞ্ছিত, অবদমিত, অপাংক্তেয় হয়ে আছে সেই শোষিত মানুষকে মুক্ত করতে হবে অর্থনৈতিক দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে; ধনবৈষম্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে সমাজকে। কারণ "দারিদ্র্যই হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ।"

ফরাসী বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে অথবা রুশবিপ্লবের আগে রাশিয়ায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা যে রকম ছিল প্রেমচন্দের যুগে ভারতের অবস্থা ছিল সেই রকমই। জমির মালিক ছিলেন বড় বড় জমিদার। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত ঝরিয়ে সেই জমিতে যারা সোনার ফসল ফলাতো সেই কৃষক ছিল দয়ার পাত্র। ফসল চলে যেত জমিদারের গোলায় আর জমি থেকে প্রজাকে উৎখাত করা সে যেন জমিদারের ন্যায্য অধিকার। প্রেমচন্দ অনুভব করেছিলেন এই গরীব চাষীদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে জমিদারের দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে তাই জমিদারী অত্যাচার ও অনাচারের মুখোস খুলে দেওয়াকে প্রেমচন্দ অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য বলে মনে করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক মুক্তিই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলিকে প্রকৃত মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। সমাজ সংস্কারের বড় বড় বুলি আওড়ালে অভীষ্ট ফল পাওয়া যাবে না। তাই 'প্রেমা',

'বরদান' 'প্রতিজ্ঞা' ও 'সেবাসদনে' যে প্রেমচন্দকে আমরা পাই পরবর্তীকালের প্রেমচন্দ তা থেকে ভিন্নতর। প্রেমচন্দ নিজেকে 'বলশেভিক' আখ্যা দিয়েছিলেন। মানবদরদী প্রেমচন্দ অবশ্যই রাষ্ট্রগত রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার উর্ধ্বে ছিলেন। তবু তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'গোদানে' এবং বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে যেন শোষণের সর্বগ্রাসীরূপটি ভয়ঙ্করভাবে ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে তিনি তাদেরই জীবনের অশ্রুসজল কাহিনী সাহিত্যের পাতায় বাস্তবায়িত করলেন যারা ছোট জাত, নীচু তলার মানুষ এবং রবীন্দ্রনাথের কথায় যারা তথাকথিত 'সভ্যতার পিলসুজ।' 'সবার পিছে, সবার নীচে' আছে সমাজের যে মানুষগুলি—সেই মুচি-মেথর-চামার ডোমদেরই স্থান দিলেন তাঁর সাহিত্যে।

'দুনিয়াকা সবসে অনমোল রতন' দিয়ে যাত্রা শুরু করে 'মঙ্গলসূত্র' পর্যন্ত পৌঁছতে প্রেমচন্দ-মানসকে অনেকগুলি বাঁক পার হতে হয়েছিল এবং তিনি যেন ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। ভগবানে এই অবিশ্বাসের মূল কারণ হলো এই যে তিনি তাঁর চারিদিকে শুধু দারিদ্র্য, শোষণ, অন্যায়, অনাচার, অবিচার ও দুঃখ কষ্টই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর বারবার মনে হয়েছে ভগবান যদি দয়াময়, করুণাময়, তবে এ সংসারে শোষক ও অত্যাচারীরাই কেন সমস্ত সুখ, শান্তি ও আনন্দের অধিকারী? কেন একজন টাকার কুমীর আর একজন ক্ষুধার্ত ভিখারী? কেন এ সংসারে সহজ, সরল, সত্যনিষ্ঠ মানুষের স্থান নেই? "বাসী ভাতে খোদার ভাগ" গল্পে তিনি লিখেছেন "প্রেমই আমাদের জীবনের সত্য। কিন্তু তোমার ঈশ্বর শাস্তির ভয় দেখিয়ে সৃষ্টি সঞ্চালন করে। তবে ঈশ্বরে আর মানুষে প্রভেদ কোথায়? এমন ভগবানের উপাসনা আমি করতে চাই না, করতে পারি না। যারা স্থূলকায় তাদের জন্যে ভগবান করুণাময় যেহেতু তারা বিশ্বসংসারকে লুটে নেয়। আমাদের মত লোকেরা তো ঈশ্বরের করুণা কোথাও দেখতে পায় না। তবে হ্যাঁ, পদে পদে ভয়কে ক্রুদ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকতে দেখি।" উর্দু পত্রিকা জমানার সম্পাদককে লেখা এক পত্রে প্রেমচন্দ বলছেন, "কত চেষ্টা করি ভগবানে বিশ্বাস রাখি। কিন্তু অবাধ্যমন কিছুতেই বোঝে না।" তথাকথিত ধর্মের ধ্বজাধারীদের দ্বারা সাধারণ মানুষের শোষণের ছবিগুলি তাঁর হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত করে বুঝিয়ে দিয়েছে ধর্ম একপ্রকার বুজরুকির ও শোষণের হাতিয়ার। ক্রমশঃ প্রেমচন্দ

যেন এ কথাটা বুঝতে পারছিলেন যে সত্যাগ্রহ শোষিতের অস্ত্র নয় ও অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা শোষকের অন্যায় অত্যাচারী হৃদয় পরিবর্তনের আশা দুরাশা মাত্র।

শ্রীঅমৃতরায় সম্পাদিত 'প্রেমচন্দ স্মৃতি' গ্রন্থে প্রথম লেখক আসফাক্ হুসেন প্রেমচন্দকে 'সাম্যবাদী স্বীকার করে নিয়ে মন্তব্য করেছেন "প্রেমচন্দ সাম্যবাদী ছিলেন; কিন্তু সে রকম কট্টর এবং উগ্র সাম্যবাদী ছিলেন না যারা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থাকে আমূল ধ্বংস করে তার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ চরম সাম্যবাদী ব্যবস্থা স্থাপন করতে চায়। হ্যাঁ, তাঁর চিন্তাভাবনা সাম্যবাদী ছিল এবং সাম্যবাদের বহু জিনিষকে তিনি ভালো বলে মনে করতেন। দীন দুঃখীদের এবং দরিদ্রদের প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতি পোষণ করতেন। একই সঙ্গে তাঁকে আমরা বেশ বুদ্ধিমান সাম্যবাদী বলতে পারি কেন না তিনি এ কথাটা মানতেন না যে সাম্যবাদে যা আছে তা-ই ভালো এবং তাতে খারাপ কিছু নেই। তিনি এ কথাও ভাবতেন না যে সাম্যবাদের প্রচার মাত্রই সমাজের স্বর্গোদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু হ্যাঁ; তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন যে বর্তমান সমাজ যেভাবে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে তাতে যদি সাম্যবাদের কোন একটি নিকৃষ্ট রূপও ছড়িয়ে পড়ে তবে সাধারণ মানুষের অনেক লাভ হবে। ...প্রেমচন্দ বুঝতেন যে সাম্যবাদের প্রচার না হয়ে থাকতে পারে না—প্রচার অনিবার্য।" (পৃ-৩—৪) বস্তুত প্রেমচন্দ-সাহিত্যের অনুশীলনে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমাদের দেশে জমিদার ও পুঁজিপতিদের লোভের সীমা এত বিস্তৃত হয়ে গেছে যে সাম্যবাদের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাবেই। এমন হতে পারে যে আমাদের পুঁথিতে পড়া সাম্যবাদের চেয়ে তার রূপ হবে আলাদা। হয়তো সাম্যবাদ ও গান্ধিবাদের সংমিশ্রণে তা এমন এক সর্বগ্রাহ্য রূপে দেখা দেবে যেখানে শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না, থাকবে না জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং ধর্মের ভাঁড়ামি। প্রেমচন্দ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব তাই মানবতাবাদ। মানবতাবাদের আবেগে সর্বদাই তিনি আপ্লুত হয়েছেন। কোন বিশেষ ছকে বাঁধা "ism" এর গণ্ডীতে তাঁকে আবদ্ধ করা না গেলেও প্রথম থেকেই তিনি ধনতন্ত্র বিরোধী, ধনীর শত্রু, গরীবের বন্ধু ও শোষিতের আত্মীয়।

প্রেমচন্দের সমগ্র সাহিত্য যেন মানুষের শোষণ প্রবৃত্তির একটি অমূল্য সচল ছবি। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি

দেখিয়েছেন যে গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রতিমুহূর্তে শোষিত হচ্ছে। তাদের শোষণ করছে জমিদার, জোতদার, মহাজন, ধর্মের বাহক ব্রাহ্মণ পুরোহিত, উচ্চ কুলের সদস্য অর্থাৎ সমাজপতি, শান্তিরক্ষক পুলিশ, ন্যায়ের ব্যাখ্যাতা জজ ম্যাজিস্ট্রেট, স্বার্থান্বেষী সমাজসেবী, গ্রামের মোড়ল ও আরো অনেকে। এদের শোষণের ছবি বাস্তবায়িত হয়েছে বলেই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে করুণ আবার বীভৎসও। করুণ ও বীভৎস রসের এমন অপরূপ সমন্বয় খুব কমই দেখা যায়।

জমিদারের শোষণ—প্রথমে জমিদারের শোষণ ও নির্যাতনের কথাই ধরা যাক। তাঁর প্রসিদ্ধ ও শেষ উপন্যাস "**গোদানে**" যে সমাজ-ব্যবস্থার ছবি আঁকা হয়েছে তা অতি বাস্তব। মনে হয় যেন এর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঘুণ ধরে গেছে, এখানে সবাই স্বার্থান্বেষী, আচার ভ্রষ্ট, নীতিহীন, ব্যভিচারী, লোভী। নজরানা ছাড়া যার থেকে কোন ন্যায় আশা করা বাতুলতা মাত্র ; এরা ইচ্ছেমত বেগার খাটাতে পারে, নিরপরাধ প্রজাকে কষাঘাতে জর্জরিত করতে পারে। আবার দরকার হলে জমি বেদখল করে গরীব কৃষককে পথে বসাতে পারে। তার প্রতিশোধ স্পৃহা এমন যে গরীবের কুঁড়েঘরে অগ্নিসংযোগ করে মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে পারে। জমিদার-বাড়ির উৎসবের জন্যে এ সমাজে গরীব কৃষককে দিতে হয় চাঁদা আর শ্রম। আবার মজা এই যে গরীব প্রজারা মনে করে এটাই তো রীতি, এতে দোষের কি? অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে তাদের মনুষ্যত্ব-বোধটাই হয়তো বা মুছে গেছে। জমিদার ও সুদখোর মহাজনের কলুর বলদ ছাড়া তাদের কি মূল্য! তাই নীরবে, নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন ছাড়া তার গতি নেই। প্রতিবাদের ভাষাই যেন ভুলে গেছে। '**প্রেমাশ্রম**' উপন্যাসের জটাশঙ্করের মৃত্যু হয়েছে এক বছর পূর্বে। তার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হবে তাই লাগবে টাকা ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম। বড় খরচ হলো ঘৃত। তাই জমিদারের পেয়াদা গিরিধর এসেছে ঘৃত সংগ্রহের জন্যে গ্রামের কৃষক প্রজাদের আগাম টাকা বিলি করতে। যদিও বাজার দর এখন টাকায় দশ ছটাকের কিন্তু অগ্রিম টাকারও তো একটা মূল্য আছে। টাকায় সের হিসেবে অগ্রিম টাকা বিতরণ করা হচ্ছে। নরম সুরে নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্যের ও অসামর্থ্যের কথা বলেও দীন দুঃখী প্রজারা ভয়ে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করছে। আপত্তি জানালো দরিদ্র কৃষক বেয়াদব মনোহর। "আমার তো একটিমাত্র মোষ। বাচ্চারা দুধ খেয়েই শেষ করে দেয়। ঘি তো হয়ই না, তা কি করে দেবো?"

পেয়াদা গিরিধর বলে "তা জমিদারবাবুর জমিতে বাস করো, জমিদারের ন্যায্য পাওনা গণ্ডা দেবে না? যা পারো দাও না হলে কারিন্দা সাহেবের কাছে গিয়ে পায়ে ধরে আসতে হবে। নতুন জমিদারকে তো চেনো না, একবার জালে পড়লে আর বাছাধনকে বেরোতে হবে না।" এবার গিরিধর বলে ঠিক আছে দেখা যাবে।

খবর পৌঁছোয় জমিদারী সেরেস্তায়। কারিন্দা গৌস খাঁ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—এত বড় আস্পর্দ্ধা। মনোহরের স্ত্রী স্বামী পুত্রের আপত্তি সত্ত্বেও টাকা নিয়ে দৌড়ে যায় গৌস খাঁর কাছে। কিন্তু কারিন্দার মন কিছুতেই গললো না। নতুন জমিদার এই মামলার যথোপযুক্ত বিহিত করতে অনুমতি দিলেন গৌস খাঁকে।

আরম্ভ হলো অত্যাচার, ঘোর অত্যাচার। নিরপরাধ গ্রামবাসীদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠলো। রাজস্ব কানা কড়িও অনাদায়ী রইলো না, যারা পারলো না তাদের জমি নীলামে উঠলো, একের জায়গায় দেড় উসুল করলো। খাজনা বৃদ্ধি পেলো, মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হলো, অধিক রাজস্বের বিনিময়ে অপর প্রজাকে জমি দেওয়া হলো; ষড়যন্ত্র করে এর তার গরুমোষ বাজেয়াপ্ত হলো, যেখানে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদের স্বর ধ্বনিত হলো সেখানে অত্যাচার নিপীড়নের রোলার চললো। সমস্ত গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করেও যেন প্রতিশোধ স্পৃহা শান্ত হয় না। এই হলো জমিদারের ধর্মনীতি। এই জমিদারই সমাজ সেবীর মুখোশ পরে, দেশপ্রেমীর ছদ্মবেশে বিদেশী শাসকের রাজকার্যে বড় বড় অঙ্কের চাঁদা দিয়ে বড় বড় সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান করে নেয়। দীন দুঃখী, সহায়সম্বলহীনদের রক্ত শুষে সে ভুতের নৃত্য করতেও পশ্চাৎপদ নয়। তারই দোসর রাজা সূর্য প্রতাপসিংহ যার নাম শুনলেও সাধারণ লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠতো। আর জমিদারের জো হুজুরের দল তারাই বা কম কিসে?

মহাজনের শোষণ—গোদানের দশ টাকা মাইনের কারিন্দা নোখেরাম। বাৎসরিক আয় হাজার টাকার কম নয়। ইঙ্গিতে গ্রামের লোকেরা ওঠে বসে, যেন মোগল আমলের রাজা-বাদশা। বেগার খাটিয়ে বাড়ির কাজকর্ম, চাষবাস, বাড়ির মেরামতী সবই হয়ে যায়। কারো টুঁ শব্দটি করবার উপায় নেই। বেচারা দরিদ্র কৃষক হোরী! কড়ায় গণ্ডায় খাজনা শোধ করে দেওয়ার পরও নোখেরাম পেয়াদা পাঠায়, তার নাকি দু বছরের রাজস্ব বাকি

পড়ে আছে। সহজ সরল বিশ্বাসী কৃষক হোরী টাকার রসীদ নেয় নি তো তাই ধূর্ত নোখেরাম তাগাদা পাঠায়। প্রমাণ যখন নেই তখন আর কি?

কিন্তু এখানেই অত্যাচারের শেষ নয়। জমিদার ও তার সাকরেদদের অসংখ্য নিষ্ঠুর অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে এরা যায় সুদখোর মহাজনদের দ্বারে সাময়িক মুক্তির আশায়। আর এই পাষণ্ড শ্বাপদকুল এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে কৃষককুলের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নেয় অতি নির্লিপ্ত উদাসীন ভাবে। এদের অর্থলিপ্সার সীমা পরিসীমা নেই। নিরুপায় প্রজারা বিপদমুক্ত হওয়ার আশায় অবিশ্বাস্য চড়া সুদের হারে ঋণপত্রে টিপ সই দিতে বাধ্য হয়। বছর না ঘুরে আসতেই একশ'ত টাকার ঋণপত্র দুইশত তিনশত টাকায় পৌছোয়। এ যেন আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে। এতে নড়চড় হওয়ার সম্ভাবনা নই। অদেয় থাকলে আদালতের মাধ্যমে ঘাতকের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দখলে এনে এরা নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করে। আর তারই সঙ্গে বৃদ্ধি করে তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ যাতে ওদের টাকা হজম করার কথা কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করতে সক্ষম না হয়।

গ্রামের এই লাভজনক ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয় ধনিক শ্রেণী। "গোদানে'র হোরীর গ্রামেও এদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। মঙ্গরুশাহ, পণ্ডিত দাতাদীন, নোখেরাম, দুলারী সুআইন, বিশেশর শাহ, পটেশ্বরী-পটোয়ার আরো এমনি কত মহাজনী কারবারে লিপ্ত। এরা সবাই কৃষক সম্প্রদায়কে চড়া সুদে ঋণ দেয়। পঞ্চাশ টাকা ঋণ নিতে ইচ্ছুক কৃষককে পাঁচ টাকা দিতে হয় ঋণপত্র লিখতে, দস্তুরি দিতে হয় দুচার টাকা, নজরানা স্বরূপ গুণে দিতে হয় কিছু, তা ছাড়া কাগজ কালি কলমের দাম তো আছেই। এসব কেটে কুটে কৃষকের ভাগ্যে হয়তো জোটে নগদ ৩০/৩৫ টাকা। বৎসরান্তে সুদে-আসলে ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০০ বা ৩০০ টাকায়। ফলে কৃষক সুদের টাকা জোগাড় করতে ক্ষেতের ফসল মহাজনের গোলায় তুলে দিতে বাধ্য হয়, কিংবা আজন্ম বেগার খেটে শোধ দিতে দিতে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রেখে যায় সেই ঋণের বোঝা সন্তান সন্ততির কাঁধে। হয়তো একদিন নীলামে ওঠে ভিটে মাটি, হাত বদল হয়ে মালিকানা বর্তায় মহাজনের নামে। "গোদান" উপন্যাসের নায়ক হোরী ঋণ মুক্তির কোনো আশা না দেখতে পেয়ে আরেক ঋণগ্রস্ত শোভাকে বলতে বাধ্য হয়—"এ জন্মে তো কোনো আশা নেই ভাই। আমরা রাজ্য চাই না, ভোগবিলাস

চাই না, শুধু মোটা কাপড় আর মোটা ভাত চাই; আর আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই। তাও জোটে না" গোদান, পৃঃ ১৫৩)

সুদখোর মহাজন মঙ্গরু হোরীকে সাবধান করে দিয়ে বলে—"আমার টাকা হজম করার কথা ভেবো না; আমি তোমার লাশ থেকেও আদায় করে নেবো।" (পৃঃ ১৫৪, গোদান)

এই হলো মহাজনদের স্বরূপ: শাইলাক এখানে সবাই। হোরীর ক্ষেতের আখ কাটা হচ্ছে দেখতে পেয়ে সবাই ধেয়ে আসে। আসে মঙ্গরু, আসে দাতাদীন, দুলারী, ঝিঙ্গুরির পেয়াদা এবং পটেশ্বরী। সকলের দাবি - আমারটা আগে শোধ করো।

"আখের ওজন আরম্ভ হতেই ঝিঙ্গুরী সিং দরজায় আসন জমালেন। প্রত্যেকের আখ ওজন করাতেন, দামের চিরকুট নিতেন, খাজাঞ্চীর কাছ থেকে টাকা নিতেন এবং নিজের পাওনা গণ্ডা কেটে আসামীকে দিয়ে দিতেন। আসামী যতই কাঁদুক, কাতর আর্তনাদ করুক, কারো কথায় কান দিতেন না। এই ছিল মালিকের হুকুম। তাঁর আর করার কি আছে?

হোরী একশ কুড়ি টাকা পেলো। তার থেকে ঝিঙ্গুরী সিং সুদে আসলে নিজের পাওনা-গণ্ডা কেটে ২৫ টাকা হোরীর হাতে দিলেন।

হোরী উদাসীন ভাবে টাকার দিকে দেখে বললো - এ আর আমি নিয়ে কি করবো ঠাকুর, এও তুমি নিয়ে নাও। আমার মজুরির অভাব হবে না।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। "হোরী টাকা কটি নিয়ে বাইরে আসতেই ডাকলো নোখেরাম। হোরী ২৫ টা টাকাই ওর হাতে দিয়ে কিছু না বলে পালিয়ে গেলো। তার মাথা ঘুরছিল।"

শরীরের রক্ত জল করা শ্রমের পাওনা শূন্য। এই শূন্য দিয়েই বছর শুরু কাজেই জমার ঘরে বাড়ে ঋণাত্মক অঙ্ক। আর অঙ্ক শাস্ত্রের এ, পি, জি পি. র হিসেব ছাড়িয়ে তা মৃত্যুকালে এমন একটি সংখ্যায় দাঁড়ায় যার ভারে সন্তান সন্ততি যৌবনেও সোজাভাবে দাঁড়াবার সুযোগ পর্যন্ত পায় না।

হোরীর সঙ্গী শোভারও একই অবস্থা। শোভার হাতে যে কটা টাকা অবশিষ্ট ছিল তার দাবীদার পটেশ্বরী ধমক দেয়—"এক রিপোর্টে ঘুরে আসবে দু'মাস, না একদিন কম না একদিন বেশী।"

হোরী পরামর্শ দেয়—"শোভা এর টাকা দিয়ে দাও। মনে করে নাও আখে আগুন লেগে গিয়েছিল।" (গোদান—পৃষ্ঠা ১৫৫)

মাঠে-মাঠে যখন সোনালী ফসল ফলে তার পরিণতির পালা এই। কৃষকের জীবনে অভাব অনটন তো লেগেই থাকে কিন্তু যখন এভাবে চোখের সামনে তাকে দেখতে হয় যে তার ফসল পরের গোলায় উঠছে তখন তার মনের অবস্থার বর্ণনা করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? চোখের ওপর ভেসে ওঠে স্ত্রী পুত্র কন্যার উপবাসক্লিষ্ট মুখ ও অশ্রুসজল বেদনাহত চোখ। তবু প্রতিবাদে মুখর হতে সে ভয় পায়। সে বোঝে না যে তার হারাবার তো কিছু নেই, একবার এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে পারলে হয়তো এর একটা সুরাহা হতো। প্রেমচন্দ প্রেমাশ্রম উপন্যাসের মনোহর ও তার পুত্রের মাধ্যমে প্রতিবাদের সুর প্রতিধ্বনিত করে দেখিয়েছেন তার পরিণামে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয় এই অসংগঠিত মূক কৃষকদের।

হোরী ও শোভা যখন সর্বস্ব দেনার দায়ে বিলিয়ে দিয়ে ঘরমুখী তখন পথে দেখা তাড়ি খেয়ে মত্তাবস্থায় গিরিধরের সঙ্গে বললো—"ঝিঙ্গুরী সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছে হরি কাকা। ভাজা ছোলা কেনার পয়সাও ছাড়ে নি। নী কোথাকার। কত কাঁদলাম, কাকুতি-মিনতি করলাম, কিন্তু পাপীটার মনে একটু দয়া হলো না।" (গোদান -পৃ: ১৫৬)

শোভাকে পেট দেখিয়ে বললো—"সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এক ফোঁটা জলও যদি গলার নীচে গিয়ে থাকে তো সে গোমাংস সমান। একটা আনি মুখে পুরে দিয়েছিলাম। তাই দিয়ে তাড়ি খেয়ে এলাম। ভাবলাম, বছর ভরা ঘাম ঝরালাম, তা আজ এতদিন তাড়ি খেয়ে নি; কিন্তু সত্যি বলছি, নেশা হয় নি। এক আনায় কি নেশা হয়? হ্যাঁ, মাতলামি করছি যাতে লোকেরা মনে করে খুব খেয়েছি। ভাল হয়েছে কাকা, কপর্দকশূন্য হয়ে গেছি। ২০ টাকা নিয়েছিলাম, ১৬০ টাকা ভরলাম, এর কোনো সীমা আছে?" (গোদান—পৃ: ১৫৬)

নিদারুণ দারিদ্র্যের কি করুণ ও মর্মান্তিক ছবি! এমনি অসংখ্য শোষণের নিদারুণ ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রেমচন্দের সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাকেই বাস্তবায়িত করেছেন তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যে।

গ্রামের মহাজনের শোষণ শুধু টাকার মধ্যে সীমিত থাকে না। এরা

কপালে তিলক দেয়, চন্দনের ফোঁটা পরে ধর্মের ভেক ধরে ; আবার অন্ধকার নেমে এলেই লোকচক্ষুর অন্তরালে নারী শিকারে বেরোয়। টাকার গদিতে বসে সমাজে চালায় অবৈধ প্রেমের রোলার যার চাপে পিষ্ট হয় গরীব দুঃখী নিম্ন শ্রেণীর যুবতী মেয়ে বৌ বা বিধবারা। দাতাদীন যৌবনে অনেক অধর্ম কুকর্ম করেছে, তারই যোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্র মাতাদীন একটি চামার কন্যা সিলিয়ার সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত। স্বয়ং পটেশ্বরী পটোয়ারের ঘরে আবদ্ধ আছে বাসন মাজার কাজ করে এক বিধবা যুবতী। অর্দ্ধশতাব্দি পেরিয়ে মরণের দ্বারে এসেও ঝিঙ্গুরীর ঘরে দুই যুবতী বধূ। এক ব্রাহ্মণীর সঙ্গেও নাকি তার অবৈধ সম্পর্ক আছে। এরাই গ্রামের গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি। গ্রামের ছোটখাটো সামাজিক সমস্যার সমাধান করে দেন এঁরাই পঞ্চায়েত বসিয়ে। তাই যখন হোরী ও ধনিয়ার পুত্র গোবর ঘরে নিয়ে আসে গোয়ালার কন্যা ঝুনিয়াকে, এবং তার মা বাবা তাকে সাদরে গ্রহণ করে তখন গ্রামের এই মহাজন মোড়লের দলের সদস্যদের মধ্যে ঢি-ঢি পড়ে যায়। "ছি! ছি!! ছি!!! সমাজের এ কি হাল হোল" বলে সমস্বরে সকলে চীৎকার করে ওঠে। বৈঠক বসে সমাজের এই ধ্বজাধারীদের। হোরীর ওপর ২০০ টাকা নগদ আর ৩০ মন অন্নের জরিমানা করা হয়। তাদের প্রশ্ন তার পুত্র গোবর বিধবাকে কেন ঘরে তুলেছে? বেচারা হোরী নীরবে মাথা পেতে মোড়লদের ঘোষিত শাস্তি স্বীকার করে নেয়। কিন্তু তার স্ত্রী বেঁকে বসে। চীৎকার, চেঁচামেচি, গালি-গালাজ আর অভিশাপের বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থাকে সমাজের এই সব নেতাদের—"মনে রেখো গরীবকে জ্বালিয়ে তোমরা সুখের ভাগী হবে না।"

এই মহাজন বা জমিদারী সেরেস্তার দল ধারালো শাঁখের করাতের মত যেতেও কাটে আবার আসতেও কাটে। কৃষক ১০/২০ সের ধান বা গম নিতে এলে এরা ওজনে কারচুপি করে দেয় ৭/৮ সের। আবার ফেরতের সময় ২০/২৫ সেরটা হয়ে যায় ১০/১৫ সের। আর অশিক্ষিত সহায়-সম্বলহীন এই দরিদ্র কৃষকেরা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়। যেমন হোরীর পুত্র গোবর দাতাদীন মহাজনকে বলছে—"বেড়ে মজা। কারুকে একশ' টাকা ধার দিয়ে তারই সুদ স্বরূপ তাকে দিয়ে জীবন ভোর কাজ করিয়ে নেবে। আসল যেমনটা তেমন রইলো। এটা মহাজনী নয়, এটা তো রক্ত চোষা।"

পুঁজিবাদী শোষণ : এ সবের পরেও আছে পুঁজিবাদী শোষণ। শহুরে মানুষ খান্না। অগাধ তার টাকা। লোভ তার অসীম, তাই শহরবাসী হয়েও তার চোখ পড়ে গ্রামের গরীব চাষীকুলের ওপর। নিজের কাজ কারবার আছে শহরে তাই এক এজেণ্ট নিযুক্ত করেছে গ্রামে। সেই এজেণ্টই আমাদের ঝিঙ্গুরী সিং খান্না চিনি মিলের মালিক। তার চাই কম দামে আখ। ঝিঙ্গুরী সিং তারই ব্যবস্থা করে। কৃষককে সারা বছর লোভ দেখিয়ে ঋণ দেয়। সুদ সমেত টাকা আদায় করে নেয় ফসলের মাঠে ময়দানে, না হয় মিলের দোর গোড়ায় যেখানে উৎপাদকরা যায় ভাল দামে বিক্রীর আশায়। কেনার সময় ঝিঙ্গুরী সিং কেনে এক বাটখারায়, এক পাল্লায়, যাতে তিন মন আখ দু'মনে দাঁড়ায়। আবার ধান চাল বা গম ধার দেওয়ার সময় তার অন্য এক দাঁড়িপাল্লা, অন্য বাটখারা যাতে দু'মন তিন মনে রূপান্তরিত হয়। কৃষকের বিপদের সময় সে চড়া সুদের হারে ধার দেয়। সাদা কাগজে আঙুলের ছাপ নিয়ে ঋণের পরিমাণ যা খুশি লিখে নেয় আর এভাবে শোষণের অস্ত্র শানায়। মিল মালিক খান্না নিজেই গর্বের সঙ্গে মেহতাকে জানায়—"আপনি জানেন মিষ্টার মেহতা, আমি আমার নীতি কিভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছি? কত ঘুষ দিয়েছি, কত ঘুষ নিয়েছি। কৃষকদের আখ ওজন করার জন্যে কেমন কেমন লোক রেখেছি, কেমন জাল বাটখারা রেখেছি।" (পৃঃ ২৭৩

শোষণের যে কত হাতিয়ারই না এই পুঁজিপতিদের হাতে আছে। নানা অজুহাত দেখিয়ে খান্না মিলের শ্রমিকদের বেতন কাটে বা কমিয়ে দেয়। নিজে সে হাজার টাকা বেতন নেয়, কমিশন নেয়, আবার শেয়ারের লভ্যাংশ নেয়। মন্দার বাজারে যখন মানুষ চাকরি পাচ্ছে না; সস্তায় কম পারিশ্রমিকে কাজ করার জন্যে কত লোক উন্মুখ হয়ে রয়েছে তখন কেন আমি শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে দেব না। খান্নার আশ্চর্য লাগে এ সহজ সরল সত্যটা শ্রমিকেরা কেন বোঝে না; কেন বোঝে না যে এই মন্দার বাজারে শ্রম ও শ্রমিকের মূল্য গেছে কমে

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রেমচন্দ কৃষক সমাজকে নিয়ে যতটা চিন্তা ভাবনা করেছেন ততটা সম্ভবতঃ কারখানা ও মিলের শ্রমিকদের নিয়ে করেন নি এই নবপুন শ্রমশক্তির বিশাল সম্ভাবনা বোধ হয় তিনি তাঁর প্রথম জীবনে উপলব্ধিই করতে পারেন নি। তাই

তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু কৃষিজীবীদের কেন্দ্র করেই পল্লবিত। জমিদার, মহাজন, পুরোহিত ও পল্লীসংলগ্ন অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও তাঁর সাহিত্যে যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে কিন্তু কলকারখানায় শ্রমিকরা অবহেলিতই রয়ে গেছে। এর একটি কারণ অবশ্যই এই যে গ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে প্রেমচন্দ সভ্যতার নাগপাশে জড়িয়ে ফেলতে চান নি। কলকারখানা আর মিলের চিমনির ধোঁয়া গ্রামের বাতাসকে দূষিত করুক, খোলামেলা মাঠ ময়দান কল-কারখানায় ও শ্রমিক বস্তিতে ভরে উঠুক তা তাঁর কাম্য ছিল না। 'রঙ্গভূমি'তে বলা হয়েছে শহুরে সভ্যতার প্রচার ও প্রসার পল্লীজীবনের পক্ষে মারাত্মক। শ্রমিকদের বস্তি গড়ে উঠলে তারই সঙ্গে গজিয়ে উঠবে মদ ও জুয়ার আড্ডা। বাসা বাঁধবে নিষিদ্ধ পল্লীর বাসিন্দারা। গ্রামের বৌ-ঝিদের পক্ষে মান-সম্মান বাঁচিয়ে চলা মুস্কিল হবে। তবে কোথাও কোথাও শহরের ঐশ্বর্য ও মেকী সভ্যতার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে শহরবাসী গরীব দুঃখীদের বর্ণনাও আছে। "কর্মভূমি"তে তিনি লিখেছেন "শহরের সেই সব অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ গলিগুলিতে যেখানে হাওয়া ও আলো কখনো প্রবেশ করতে পারতো না যেখানকার মাটিই শুধু নয় দেওয়ালও ভিজে থাকতো, যেখানে দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতো, সেখানে ভারতের মেহনতী জনতার সন্তান-সন্ততি রোগ ও দারিদ্র্যের পদতলে নিষ্পেষিত হয়ে নিজের ক্ষীণ জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে নিতে প্রাণ বিসর্জন করছিল।"

শান্তিরক্ষীদের শোষণ :—পল্লীজীবনে আর এক অভিশাপ হলো তৎকালীন ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী। তারা গরীব চাষীভূষোদের রক্ষক নয় ভক্ষক। থানার দারোগারা সুদখোর মহাজন ও জমিদারদের প্রতিভূ হয়েই থাকতে ভালবাসে, কারণ সময়ে অসময়ে এঁরাই তাঁদের পকেট গরম করে দেয়। মহাজন ও জমিদার এবং তার নায়েব গোমস্তাদের সাথে দারোগাদের থাকে খুব দহরম মহরম। জমিদার অকথ্য অত্যাচার অনাচার করেও পার পেয়ে যায়, শত অন্যায় করেও ন্যায়ের পাল্লা তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। জমিদারের ইঙ্গিতে করা খুন-জখম সহজেই পুলিশ হজম করে যায়। হোরীর গরুকে বিষ দিয়ে তার ভাই হীরা পলায়ন করে। দারোগা এসে হোরীর ওপরই চোটপাট করে কিছু আদায় করার চেষ্টা করে। এমনকি গ্রামের প্রধানরাও হোরীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে বলে—"যা আছে বার

করে দাও, এমনিতে তো মুক্তি পাবে না।" আসলে এ সবই তাদেরই কারসাজি। বেচারা হোরী বংশমর্যাদা রক্ষার জন্যে ঋণ নিয়ে দারোগা সাহেব কে বিদায় করতে চায়। গ্রাম প্রধানেরা পরামর্শ করে তার হাতে ৩০ টাকা তুলে দেয়। কিন্তু হোরীর বৌ ধনিযা গর্জে ওঠে। এক ঝটকায় হোরীর হাত থেকে টাকার পুঁটলি ছিনিয়ে নেয়। টাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দারোগা শেষ চেষ্টা করে আর এক চাল চালে। বলে "মনে হচ্ছে নিজেই বিষ দিয়ে ভাইয়ের ওপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করছে।" একথা শোনা মাত্র ধনিয়া আবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চীৎকার করে দারোগার সামনে হাত ঘুরিয়ে বলে—"হ্যাঁ দিয়েছি। নিজের গরু ছিল, মেরে ফেলেছি; অপরের পশুতো হত্যা করি নি? তোমার এমন মনে হয় তো লিখে নাও রিপোর্ট। পরিয়ে দিও আমার হাতে হাতকড়া। তোমার ন্যায় আর বুদ্ধির দৌড় বুঝেছি। গরীবের গলা কাটা এক কথা আর দুধ এবং জলকে পৃথক করা অন্য কথা।" (গোদান—পৃঃ ৯৬)

ধনিয়ার এই মূর্তি দেখে সকলেই হতভম্ব হয়ে যায়। তার বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে সকলে রঙ্গভূমি থেকে পলায়ন করে বাঁচে। ঘুষখোর দারোগা হোরীর থেকে কিছু আদায় না করতে পেরে গ্রাম প্রধানদের কাছ থেকে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে পঞ্চাশ টাকা আদায় করে বিদায় নেয়। "প্রতিজ্ঞা" উপন্যাসের দারোগা কৃষ্ণচন্দ্র সৎপথে থাকতে চেয়েছিলেন, ঘুষ নিতেন না, অসৎ পথে চলতেন না, অন্যায় অত্যাচার করতেন না, কিন্তু সমাজ তাকে সৎপথে থাকতে দিলো না এবং তার ফলে জীবনের কয়েকটি অমূল্য বছর কাটাতে হলো জেলখানায় সংসার গেল রসাতলে।

ন্যায়বিচারকের শোষণ :— এর পর আছে ন্যায় অন্যায়ের চুলচেরা বিচারকারি হাকিম জজের দল এরাও পরোক্ষে কৃষক সমাজকে করছে শোষণ। জমিদার আর মহাজনরা অন্যায় অজুহাতে গরীব কৃষকদের জমি দখল করে, কৃষকের নামে মামলা দায়ের করে, আর ন্যায়ের ধ্বজাধারী হাকিমেরা ঘুষ নিয়ে কৃষকের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দেয়। এমন কি বেচারা অশিক্ষিত কৃষক জানতেও পারে না কবে মামলা হলো আর কবে হাকিমের রায় বেরোলো। গোদানের কথাই ধরা যাক। "হোরী জানতেও পারলো না কি কাণ্ড হচ্ছে। কবে মামলা দায়ের হলো, কবে রায় বেরোলো, কিছুই সে জানতে পারলো না। কোর্টের পেয়াদা যখন তার ক্ষেতের আখ নীলেম

করতে এসেছে, তখন সে জানতে পারলো। ওদিকে একশ পঞ্চাশ টাকায় নিলামে আখ বিক্রীও হয়ে গেল মঙ্গরু সাহের নামে।" (গোদান পৃঃ ২২৫)

জমিদার বেদখলীর বা খাজনা বৃদ্ধির নালিশ করে আদালতে যার হাকিমের দল ঘুষ নিয়ে কৃষকদের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দেয়। রামসেবক স্পষ্ট ভাষায় বলে—"থানার দারোগা ও কনষ্টেবলরা তো যেন তাদের জামাই। যখন গ্রামে এঁদের আগমন হয় তখন কৃষকদের ধর্মই হবে তাঁদের আদর সৎকার করা, নজরানা ভেট করা, আর যদি তা না করা হয় তবে সমগ্র গ্রামবাসীর হাতে পড়ে হাতকড়া। কখনও কানুনগো আসেন, কখনও তহসীলদার, কখনও ডেপুটি সাহেব আসেন আবার কখনও কলেক্টর বা কমিশনার; বেচারা কৃষককে তাঁদের সামনে হাত জোড় করে উপস্থিত থাকতেই হবে। তাদের জন্যে রসদ, চারা, ডিম, মুর্গী, দুধ-ঘির ব্যবস্থা করা চাই।

নেতৃবৃন্দের শোষণ:—সমাজের তথাকথিত উচ্চাসনে বসে আছেন যে সকল ব্যক্তি যাদের মধ্যে আছেন রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবীর ভেকধারী বসে খাওয়ার দল, রক্তচোষা ডাক্তার, উকিল, ব্যারিষ্টারের দল, তাদের শোষণের নানা ফন্দি-ফিকির, অস্ত্রশস্ত্র, ঘাঁত-ঘোঁতও প্রেমচন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। গোদানে রায় বাহাদুর অমরপাল সিং গত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জেলে গিয়ে নাম করেছেন। কাউন্সিলের সদস্যপদ ও ত্যাগ করেছিলেন তাঁর নিজের মুখেই নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলছেন-"সম্পত্তি এবং সহৃদয়তার মধ্যে শত্রুতা আছে। আমরাও দান করি, ধর্মকর্ম করি। কিন্তু কেন জানো? শুধু নিজের সমকক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে। আমাদের দান ও ধর্ম শুধু অহঙ্কারের বস্তু, বিশুদ্ধ অহঙ্কারের। আমাদের মধ্যে কারো অদেয় রাজস্বের জন্যে জেল হয়ে গেলে, কারুর যুবক পুত্র মরে গেলে, কারুর বিধবা বৌ পালিয়ে গেলে, কারো ঘরে আগুন লাগলে, বেশ্যার হাতে বোকা বনে গেলে, কিংবা নিজের আসামীদের হাতে মার খেলে, তবে তার সব ভাই হাসবে, আনন্দ করবে, যেন বিশ্বসংসারের সম্পদ হাতে এসে গেছে। আর যখন দেখা হবে তখন এমন ঘনিষ্ট ভাবে মিশবে যেন পরের ঘামের বদলে সে রক্ত দিতে প্রস্তুত।" (গোদান—পৃঃ ১১৪)

এই সমাজসেবী দরিদ্রসেবী নেতা, যেই চাপরাসী এসে খবর দিল যে

মজুরেরা বেগার দিতে অস্বীকার করছে, ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"চলো আমি এই পাজিদের ঠিক করছি। কখনও তো খেতে দিই নি, তবে আজ এ নতুন কথা কেন? এক আনা রোজ হিসেবে মজুরী পাবে যা হামেশা পেয়ে এসেছে; আর এই মজুরীতেই কাজ করতে হবে, সোজা ভাবে করুক আর বাঁকা ভাবেই করুক।" (গোদান—পৃঃ ১৪)

ধর্মের শোষণ – এর উপরেও আছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের শোষণ মধ্যযুগে যেমন কবীর, নানক, দাদূ ইত্যাদি সমাজ সংস্কারের জন্য কাব্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন তেমনি প্রেমচন্দও তাঁর উপন্যাস ও গল্পের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের বাহ্যিক আড়ম্বরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের মানুষগুলিকে পুরোহিত ও পাণ্ডার দল যেভাবে নানা বিধি-নিষেধের জালে জড়িয়ে ফেলেছিল তা থেকে তাদের মুক্ত করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তাঁর ভূমিকা সমাজ-সংস্কারকের। তাই ধর্মের ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অনিয়ম অবিচার ও অন্যায়ের অগনন কাহিনী তাঁর সাহিত্যে অঙ্কিত হয়েছে। প্রেমচন্দের সময়ে মন্দিরগুলিতে ঠাকুর পূজোর নাম করে পাণ্ডা ও পুরোহিতের দলের শোষণযন্ত্র মুক্ত বিহঙ্গের মত যথেচ্ছাচারের পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত ছিল মন্দিরে মন্দিরে মোহান্ত ও তিলকধারী পূজারীর দল নানা লীলাখেলায় মত্ত ছিল। মন্দিরে আগতা সহজ সরল গৃহবধূ ও ধর্মভীরু বৃদ্ধাদের কপটজালে আবদ্ধ করে বাসনাপূর্তি করতেও এরা পশ্চাৎপদ ছিল না। ধর্মস্থানগুলি ছিল অধার্মিক কাজকর্মের আখড়া। এই শ্রেণীর চারিত্রিক অধঃপতনের পরিণামে সমাজের সাধারণ মানুষেরও নৈতিক পতন ত্বরান্বিত হচ্ছিল। প্রেমচন্দ যেন এই ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং তাঁর তূণের সব অস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করলেন এই ক্লেদাক্ত প্রথার বিরুদ্ধে। "অসরারে মআবিদ" নামক উর্দু উপন্যাসে মোহান্ত ত্রিলোকীনাথ রামকলিকে মিথ্যা প্রেমজালে আবদ্ধ করে তাকে ভোগবিলাসের পঙ্কে টেনে আনে। মন্দিরে মন্দিরে বারো মাসে তেরো পার্বণের মত চলে উৎসব ও বাঈজীর নৃত্য। 'সেবাসদনে'র সুমন মন্দিরে এক বারনারীকে সম্মানিত হতে দেখে বিস্মিত ও বিচলিত হয়েছিল। ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ কুলের যে সকল অপগণ্ড সন্তান বিপথগামী হয়ে মন্দিরে মন্দিরে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল তারাই প্রেমচন্দের যুগে পাণ্ডা ও পুরোহিতের মুখোস পরে ধর্মের নামে ভীরু জনমানসে আঘাত করে করে তাদেরই শোষণ

করে সানন্দে জীবন যাপন করত। যে ধর্মের রক্ষকরাই সবরকমের অকর্ম ও কুকর্মের বাহক, অধর্মাচরণের নেতা, সে ধর্মের পতন যে অসম্ভাবী তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাই তিনি চেয়েছিলেন এই শ্রেণীর পুরোহিতদের মুখোস খুলে দিতে।

মোটেরাম শাস্ত্রীকে নায়ক করে প্রেমচন্দ যে কাহিনী গুলি লিখেগেছেন তার মূল উদ্দেশ্যই হলো তথাকথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করা। উদরপূর্তি ও ভোগবিলাস এদের একমাত্র কাম্য। উদর সর্বস্ব মোটেরাম **"মনুষ্য কা পরম ধর্ম"** কাহিনীতে হোলীর মত উৎসবমুখর পরবের দিনে যজমানদের নিকট থেকে কোন নিমন্ত্রণ না পেয়ে শেষকালে অধীর হয়ে গঙ্গায় গিয়ে ভাষণের দ্বারা ধর্মের ব্যাখ্যা করে ধর্মভীরু স্নানার্থীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে যে লোক ব্রাহ্মণকে ভোজনের দ্বারা তুষ্ট করতে পারবে সেই স্বর্গে যাবে। **"নিমন্ত্রণ"** কাহিনীটিতেও মোটেরাম শাস্ত্রী ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাপারে এক কৌশল অবলম্বন করে নিজের পাঁচ পুত্র ও স্ত্রীকেও পুরুষ বেশে মুরাদপুরের রানীর নিকট উপস্থিত করে যে হাস্যকর কাণ্ড করেছিল তা এই শ্রেণীর মানুষের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য **নির্মলা** উপন্যাসেও সেই মোটেরাম শাস্ত্রী ভালচন্দ সিন্‌হার এখানে গিয়ে মিষ্টির দোকানে বসে কি ভাবে ভুরিভোজন করেন তাও চমৎপ্রদ। **"সত্যাগ্রহ"** গল্পেও লোকের কথায় পেটপুরে খেয়ে দেয়ে অনশন আরম্ভ করে মোটেরাম শাস্ত্রী বিপদে পড়েন এবং রাত্রির অন্ধকারে ফেরীওয়ালার এখানে চুরি করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন মোটেরাম শাস্ত্রী কেবল একটি প্রতীক চরিত্র। আজও বারাণসী, হরিদ্বার, গয়া, বৃন্দাবন ইত্যাদি হিন্দু তীর্থস্থানগুলিতে এই শ্রেণীর একদল মানুষ এ ভাবেই জীবন যাপন করেন। ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে শুধু পেটপুরে খাওয়াই নয় তার সঙ্গে কিছু আর্থিক দানও গ্রহণ করে এঁরা যজমানদের জীবন ধন্য করেন বা তাদের স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দেন। সমাজের এই অধঃপতন তিনি নিজে বেনারসে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই তিনি চেয়েছিলেন সমাজ হিতৈষীদের মনে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণীর চোখে আঙুল দিয়ে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন চোখ খুলেও যারা সমাজের এই দৈন্যদশা দেখতে পারে না, আর যারা দেখেও না দেখার ভান করে থাকে প্রেমচন্দ তাদের ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েন নি।

হিন্দু ধর্মের যে কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল সেই কর্মকাণ্ডের বাড়াবাড়ির ফলেই হিন্দুর সংখ্যা কমতে আরম্ভ করেছিল উনবিংশ ও বিংশশতাব্দির প্রথম দিকে। ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মে দলে দলে দীক্ষিত হওয়ার কারণও এই।

প্রেমচন্দ সাহিত্যের প্রায় সব উপন্যাসগুলিতেই এমন দু-একটি চরিত্র আছে যাদের পেশা যজমানী করা। এরা মন্দির বা গ্রামের দেবস্থানের মহান্ত অথবা পুজারী। ধর্ম এদের যেন পৈত্রিক সম্পত্তি যার ওপর সাধারণ মানুষের কোন অধিকার নেই। এদের নির্দেশই ধর্মের বিধান। এরা শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত্ত, সাপের চেয়েও অধিক বিষধর। নিষ্ঠুরতায় এরা সম্পূর্ণ জীবজগৎকেই হার মানায়। এরা মনে করে কতগুলো ব্রত উপবাস করা, আর তিলক কেটে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যজমানী করাই ধর্মাচরণ, এরা মনে করে গলায় পৈতে থাকলেই সে বর্ণশ্রেষ্ঠ, আর সকলের প্রণাম পাওয়ার অধিকারী। **'গোদান'** উপন্যাসের দাতাদীন পুরোহিতের কাজ করে আবার গরীব কৃষক মজুরদের ঋণ দেয়। এই ঋণের টাকা বাড়ে চক্রবৃদ্ধি হারে অতি দ্রুত। টাকা আদায়ের সময় কিন্তু মানব ধর্মের মূল কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। অতি নিষ্ঠুর আর কঠোরভাবে সে তা আদায় করে নেয়।

প্রেমচন্দ এদের চরিত্রের মাধ্যমে পুরোহিত ও মোহান্তদের ক্রিয়া-কলাপের সেই ছবি এঁকেছেন যে ছবি সাধারণতঃ থাকে লোকচক্ষুর আড়ালে। দাতাদীনের দৃঢ় ধারণা—"জমিদারী নষ্ট হতে পারে, ব্যাঙ্ক ফেল মারতে পারে কিন্তু এই যজমানী শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। যতদিন হিন্দু জাতি বেঁচে থাকবে ততদিন ব্রাহ্মণরাও থাকবে আর যজমানীও থাকবে। ফোকটে ঘরে বসে শ'-দু'শ টাকা আয় করে নি। কখনো সখনো ভাগ্য সঙ্গ দিলে চার পাঁচ শত টাকাও হাতে এসে যায়। কাপড়-চোপড়, বাসনপত্র, খাদ্য সামগ্রী তো আলাদা ....এমন নিশ্চিন্দি না জমিদারীতে আছে না মহাজনীতে।" (গোদান পৃঃ ২৫০)

'সেবাসদনে'র মোহান্ত রামদাস রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের প্রধান হয়ে বসে আছেন। পূজোপাঠ করেন, কপালে চন্দন-তিলক লাগান। গরীব চাষী-মজুরদের ওপর তাঁর প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর আর একটি জীবন আছে যেখানে তিনি এক লম্পট, দুশ্চরিত্র, ঠকবাজ। কৃষ্ণসেবার নামে তিনি গরীবদের কাছ থেকে আদায় করেন চাঁদা। দরকার

পড়লে এদের বেগার খাটতে বাধ্য করেন। বিরোধিতা করলে সায়েস্তা করার লোকও আছে প্রচুর। মন্দিরের নামে চাঁদা আদায় করে তিনি একদল ভেকধারী সাধুকে প্রতিপালন করেন, সাদা কথায় যারা সাধুবেশে চোর-গুণ্ডা। সব অপকর্মেই এরা 'সিদ্ধহস্ত। পূজাপার্বণে গ্রামবাসীর পয়সায় মন্দিরে চলে বারনারীর নৃত্য। চলে নেশাভাঙের ধুম। মন্দিরের দেবতাকে খুশী করার জন্যে এটাও নাকি আবশ্যক। সেবাসদনেরই এক দরিদ্র পাত্র গজাধর প্রসাদ। চাকুরির পয়সায় তার পেট চলে না। ভেক পরিবর্তন করে হয়ে গেলেন স্বামী গজানন। সব সমস্যার সমাধান হলো। ধর্মের বাহ্যিক ছোঁয়া লাগতেই শোষণের ন্যায্য অধিকার পেলেন তিনি।

এই শ্রেণীর মানুষরাই নিজেদের হিন্দু ধর্মের বাহক ও রক্ষক বলে নিজেদের জাহির করে আর অশিক্ষিত ধর্মভীরু গ্রামের নিরন্ন মানুষগুলি তাদের মাথায় করে রাখে এবং শোষিত হয়েও মনে করে এ টাকা ধর্মের কাজে লেগেছে। 'সদ্‌গতি' গল্পেও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দাপট আমরা দেখেছি। ঘাসীরাম শুধু ঘাসীরাম নন পণ্ডিত ঘাসীরাম কেননা তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি প্রত্যহ স্নান করে চন্দন চর্চিত হয়ে ঠাকুরের সেবা করেন। তিনি প্রত্যহ ভাঙের শরবত পান করেন যা নাকি শিবের অতি প্রিয়। যজমানী তাঁর পেশা। বেচারা যজমানরা দায়ে পড়ে পণ্ডিতজীর এখানে বেগার খেটে প্রতিদান দিতেও পিছপা হয় না। তাদের নিজস্ব ধর্মবোধ বলে কিছু নেই। পণ্ডিত, পুরোহিত ছাড়া তাদেরকে ধর্মের পথের নিশানা কে বলে দেবে। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের এই ধর্মভীরুতা সম্পর্কে প্রেমচন্দ বলছেন—"ধর্মভীরুতার যেমন অনেক গুণ আছে তেমনি একটি অবগুণ আছে তা হ'ল সারল্য।...ধর্মভীরু প্রাণী তার্কিক হয় না। তার বিবেচনার শক্তি শিথিল হয়ে যায়। "(রঙ্গভূমি—পৃঃ ৩১)

পুঁজিবাদের প্রতিভূ জ্ঞান সেবক বলছেন—"ধর্ম এবং ব্যবসাকে একই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা বোকামী। ধর্ম ধর্মই, ব্যবসা ব্যবসাই; পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। সংসারে বেঁচে থাকতে হলে ব্যবসার দরকার হয় ধর্মের নয়। ধর্ম তো ব্যবসার অলঙ্কার। সেটা ধনীদেরই শোভা পায়।...ঘরে যদি ফালতু টাকা থাকে তবে নমাজ পড়ুন, হজ করুন, মসজিদ বানান, কূপ খনন করুন; তবেই না ধর্ম, খালি পেটে খোদার নাম নেওয়াও পাপ।" (রঙ্গভূমি, পৃঃ ৮৩)

ধনাধীশদের শোষণ এবং ধর্মের তথাকথিত রক্ষকদের শোষণে পদ্ধতিগত প্রভেদ হতে পারে কিন্তু শোষণ শোষণই; তার পরিণাম এক। কর্মভূমির আশারাম, সেবাসদনের মহান্ত রামদাস, গোদানের দাতাদীন, সদ্গতির ঘাসীরাম, মোটেরাম শাস্ত্রী, ত্রিলোকীনাথ ইত্যাদি সবাই গরীব গ্রামবাসীদের ধর্মের অ'ড়ালে শোষণ করে। আরো আশ্চর্য হতে হয় তখন যখন দেখি সামাজিক কাজ কর্মেও এই অর্দ্ধশিক্ষিত পণ্ডিতের দলের প্রাধান্য কম নয়। প্রেমচন্দ বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে গ্রামের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপরও এদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। কোন দরিদ্র কৃষকের দ্বারা যদি কোন ছোটখাটো অপরাধ হয়ে যায় তবে এই ধর্মের নিয়ামকরা অবিলম্বে লাফিয়ে পড়েন রণাঙ্গনে। বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে তার কিছু করার থাকে না। হয় তাকে এক ঘরে করে, না হয় পংক্তিবদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজনের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে বাধ্য করে অথবা আর্থিক দণ্ডের দ্বারা তাকে সর্বস্বান্ত করে। সব ক্ষেত্রেই তার আর্থিক সঙ্গতির বাইরেই জরিমানা করা হয় যাতে সে তাদেরই নিকট ধার নিতে বাধ্য হয়। প্রেমচন্দ চেয়েছিলেন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার এই পঙ্কিল ব্যবস্থা থেকে মুক্তি। তাই তিনি তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসে বারবার এ সকল ঘটনার উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে আমাদের এই ধর্মভীরুতা ও কর্মবিমুখতাই আমাদের ভাগ্যবাদী করে তুলেছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই, জাতিশ্রেষ্ঠ, ধর্মের ব্যাখ্যাতা তারাই; ভগবানই তাদেরকে সেই উচ্চাসনে বসিয়েছেন যেখানে তাদের গায়ে শত অপকর্ম করেও পাপের স্পর্শ লাগে না। পাপ পুণ্যের ব্যাখ্যা সকলের জন্যে এক নয়। ব্রাহ্মণ যদি কোন নিম্নজাতির কন্যাকে বিবাহ করে তখন সেটা তার জন্যে হয় মহান ঔদার্য, একটি কন্যাকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা; কিন্তু কোন কায়স্থ যদি শূদ্র বা বৈশ্য কন্যার পাণিপ্রার্থী হয় তখন তারা অতি মাত্রায় সমাজ সচেতন হয়ে পড়েন। গেল গেল রব পড়ে যায়। তাকে দণ্ডের ভাগীদার হতে হয়। জাতিচ্যুত করা হয়। প্রায়শ্চিত্তের উপায় অনুসন্ধান করে মিথ্যে শাস্ত্রের বুলি আওড়ান হয়।

অপর প্রকারের ধর্মাচারিদেরও প্রেমচন্দ ছেড়ে কথা বলেন নি। গ্রামে গ্রামে যে সব গেরুয়া বেশধারী গৃহত্যাগী সাধুর বেশে ঘুরে বেড়ায় আর আজ এর বাড়ি কাল তার বাড়ি দশব্যঞ্জন দিয়ে উদরপূর্তি করে তাদের

ভ্রষ্ট আচরণ সম্পর্কে প্রেমচন্দ সাধারণ মানুষকে সজাগ থাকতে বলেছেন। তাঁর কয়েকটি গল্পে তিনি এই শ্রেণীর সাধুদের ভণ্ডামির নানা ছবি এঁকেছেন। **"বাবা জী কা ভোগ", নেউর, গুরুমন্ত্র** সেই শ্রেণীর গল্প যাতে তিনি ভণ্ড সাধু সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই সাধুরা গ্রামের আশেপাশে কোন বৃক্ষতলে বসে কাঠকুটো জ্বালিয়ে চোখ বুজে বজ্রাসনে বসে গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আর যখন অন্ধ ভক্তরা মৌমাছির মতন তাকে ঘিরে থাকে তখন নানান লোভের বসে আগত ভক্তদের চোখে ধূলো দিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যান। যাওয়ার সময় অবশ্য সঙ্গে করে নিয়ে যান বহু ভোগের সামগ্রী, যার মধ্যে থাকে গ্রামের বৌদের গায়ের গহনা, টাকা পয়সা ইত্যাদি। কখনও বা তাঁরা কোন রূপসী কন্যাকে অপহরণ করে অথবা ভুলিয়ে ভালিয়ে উধাও হয়ে যান। **"নেউর"** কাহিনীতে এই সাধুই নেউর কে ঠকিয়ে অদৃশ্য হন। "বাবা জী কা ভোগ" গল্পে দরিদ্র রামধনের বাড়িতে বসে এমনি এক সাধু পেটপুরে ভোজন করেন আর পরিবারের সদস্যদের উপবাসে দিন কাটাতে হয়। ধর্মভীরু সরল নিষ্কর্মা এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকেই তৈরী হয় এরকম সাধু যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে মূলধন করে পরিব্রাজকের মত ঘুরে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পারিবারিক দায়দায়িত্বের ভার বহন করতে অসমর্থ হয়ে অনেকে গেরুয়া ধারণ করে গৃহত্যাগ করেন প্রেমচন্দ গ্রামের সেই সব নিষ্কর্মার ঢোঁক মানুষগুলোকে নিয়েও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি যারা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে আলস্যে কাল যাপন করে।

প্রেমচন্দ তাঁর কয়েকটি উপন্যাসেও এই ভণ্ড সাধুদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন ও তাদের শোষণ ও ভণ্ডামির সর্বগ্রাসী রূপটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'নির্মলা' উপন্যাসে পরমানন্দ ও হরিহরানন্দ যাদুবিদ্যা ও ভেল্কী দেখিয়ে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে মাতৃহীন ভক্তযুবক সিয়ারামকে দলে টেনে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই দুই সাধুর চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য এদের কথোপকথনের কিছু অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হল।

পরমানন্দের পথে দেখা হয় হরিহরানন্দের সঙ্গে, পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় কোথায় ঘুরে এলে? কোন শিকার পেলে?

হরিহরানন্দ—এদিকে সব ঘুরে এলাম, কোন শিকার পেলাম না।

পরমানন্দ—মনে হচ্ছে আমি একটা পেয়েছি। জালে জড়িয়ে পড়লে বুঝবো।

হরিহরানন্দ তুমি এরকমই বল। যে আসে সেই দু-এক দিনেই পালিয়ে যায়।

পরমানন্দ—এবার পালাবে না, দেখে নিও। এর মা মারা গেছে। বাপ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে, মাও অত্যাচার করে। ঘরে এর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

হরিহরানন্দ—হ্যাঁ, এমন হলে নিশ্চয়ই ফাঁসবে। ফাঁস লাগিয়ে দিয়ে এসেছো তো?

পরমানন্দ—খুব ভাল ভাবে। এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়। আগে এটা জানতে হবে যে পাড়ায় কোন কোন বাড়িতে সৎমা আছে। সেই সেই ঘরেই জাল ফেলা উচিত। (নির্মলা—পৃঃ ১৫৫)

প্রেমচন্দ দেখিয়েছেন কিভাবে এই ভণ্ড সাধুরা নারী শিকার করে, কিভাবে তারা গাঁজা, ভাঙ, চরস, তাড়ি ইত্যাদি নেশার শিক্ষা দেয়। সাধনার জন্য নাকি গাঁজায় দম দেওয়া আবশ্যক। অশিক্ষিত অন্ধ বিশ্বাসে জর্জরিত ভাগ্যবিশ্বাসী পঙ্কিল সমাজকে পঙ্কিলতর করে তুলে এরা ভোগের সামগ্রী সঞ্চয় করে।

সমাজ সচেতন লেখক অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সম্বন্ধেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি। কর্মভূমিতে নীচু জাতের দুর্দশা দেখে অমরকান্ত ভাবে-ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও উচ্চবর্গের মানুষেরা আরতির সময় সামনের পংক্তিতে স্থান পায় কিন্তু নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য মানুষের স্থান পিছনের সারিতে তাও সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে। এই অস্পৃশ্য লোকগুলোর দৃষ্টিও যদি দেবতার ওপর পড়ে তবে ধনীর দুলালদের দেবতাও যে ভ্রষ্ট হবেন। দেবতার পূজার প্রসাদ তাদের ভাগ্যে জোটে না কিন্তু পূজা-পার্বনে, উৎসবে, চাঁদা আদায়ের সময় এদের নাম বাদ পড়ে না। 'কায়াকল্পে' প্রেমচন্দ দেখিয়েছেন এই সব ধর্মের শীর্ষে উপবিষ্ট মোল্লা মৌলবী এবং ব্রাহ্মণ-পুরোহিত কিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে গরীব মানুষগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে। লেখক যশোদানন্দের মাধ্যমে বলছেন—এ সংসারে পরস্পরের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণার উদ্রেক করে ধর্ম। (কায়াকল্প পৃঃ ২৯) যারা গোহত্যার নামে খুনোখুনিতে নামে

তাদের প্রতি তাঁর উপদেশ—"অহিংসার নিয়ম শুধু গোরুর ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয় মানুষের ওপরও তা প্রযোজ্য।" (কায়াকল্প—পৃঃ ২১) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার জন্য বদ্ধ পরিকর মৌলবীকে খোয়াজা সাহেব বলছেন—আপনি তো নিজের লুচি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে মত্ত। দোষ তো আমাদের উপর বর্তাবে, আমাদেরই দোকান পাট লুঠ হবে।' (ঐ—পৃঃ ৩১) হিন্দু প্রতিনিধিকে খোয়াজা সাহেব বলছেন—"কিন্তু আমাদের তো এখানে ম্লেচ্ছ বলা হয়। আমাদেরকে কুকুর অপেক্ষা ঘৃণ্য মনে করা হয়। ওদের থালায় কুকুররা খায় কিন্তু মুসলমানরা তাদের গ্লাসে জলপান করতে পারে না" (ঐ—পৃঃ ৩৫) সমাজে ধর্মের নামে এই সব কাণ্ড কারখানার মূলে যে রয়েছে ধর্মের এইসব ব্যাখ্যাতারা তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই গোদান পর্য্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে প্রেমচন্দ যেন ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন অথবা বলা যায় তিনি নাস্তিক হয়েছিলেন। সমাজসেবী মেহতা বলে "এই যে ভগবান আর মুক্তির কথাবার্তা, এ সব শুনলে আমার হাসি পায়। ঐ মুক্তি এবং উপাসনা অহঙ্কারের চরমাবস্থা যা আমাদের মানবত্ববোধকেই নষ্ট করে ফেলেছে। যেখানে জীবন আছে, ভালবাসা আছে সেখানেই ঈশ্বর আছেন এবং জীবনকে সুখী করে তোলাই হল উপাসনা ও মুক্তি।" (গোদান পৃঃ ১৬৬) গরীবের শোষণের জন্য প্রেমচন্দ যেন ভগবানকেও দায়ী করতে চেয়েছেন। ভগবানের রুদ্র রোষে জর্জরিত হয় কুঁড়ে ঘরেরই বাসিন্দা। কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি ও বন্য, কখনো শিলাবৃষ্টি আবার কখনো ঝড়তুফানে পিষ্ট হয় এই সব নিষ্পাপ গরীব মানুষগুলিই।

সমাজ সচেতন লেখক প্রেমচন্দ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝেছিলেন যে শুধু নিরস উপদেশের দ্বারা এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যাবে না। তাই তিনি লেখনীর মাধ্যমে এমন সব গ্রাম্য পরিস্থিতির অবতারণা করেছিলেন যাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের পঙ্কিল আবর্ত থেকে মুক্তির জন্য ছটফট করে। যুক্তির দ্বারা দুঃখদৈন্যকে মুক্তির আবেগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এমনভাবে তিনি পরিস্থিতির উদ্‌ভাবনা করলেন যে সহজ সরল গ্রামবাসীদের মনেও তা চিন্তার উদ্রেক করতে সক্ষম হলো। হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশের ধারায় ১৯১৮ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যবর্তী যুগটিকে বলা হয়ে থাকে

'প্রেমচন্দ যুগ'। কুড়ি বৎসর এই সময়কালের মধ্যে উত্তর ভারতের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রত্যক্ষ করা যায় কিভাবে ধর্মের ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের একটি গোষ্ঠী ধর্মের নামে হিন্দু সমাজব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়ে ভোগ বিলাসের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে শোষণের এক নয়া অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছিল। ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের উদারনৈতিক চেতনায় আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু সমাজে যে ভাঙ্গন ধরেছিল তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবও তাঁর সাহিত্যে অঙ্কিত হচ্ছিল। এই ভাঙন রোধ করার জন্যই বাংলায় ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রে গঠিত হয় প্রার্থনা সমাজ এবং উত্তর ভারতে আর্য সমাজ। আর্য সমাজের কর্মপদ্ধতির দ্বারা প্রেমচন্দ গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ, অসম বিবাহ, বাল্যবিবাহ জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি দূর করার জন্য সমাজ সংস্কারের যে আন্দোলন স্বামী দয়ানন্দ আরম্ভ করেন প্রেমচন্দ তাকে সমর্থন করেন ও তাঁর উপন্যাসে তাকে স্বীকার করেন। কিন্তু আর্য সমাজের আন্দোলন ছিল শহরের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রেমচন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে সেই আন্দোলনকে গ্রাম গ্রামান্তরে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর্য সমাজের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে তিনি লেখনীর মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন অন্ধ বিশ্বাস, কুপ্রথা ও কুশিক্ষায় জর্জরিত সেই মানুষগুলির মধ্যে, আন্দোলন কারী আর্য সমাজীরা যাদের চোখে ছিল শত্রু।

প্রেমচন্দ সাহিত্যে করুণার ফল্গুধারা বর্ষিত হয়েছে নিপীড়িত দরিদ্র কৃষক মজুরের ওপর। কিন্তু তিনি কেবল শোষনের চিত্রই তুলে ধরেন নি। রোমান্স কল্পনা ও রহস্য রোমাঞ্চের ঘূর্ণিবাত্যা থেকে হিন্দী সাহিত্যকে মুক্ত করে তিনি তাকে নিয়ে এসেছেন কঠোর বাস্তববাদের আঙিনায়। দলিত, লাঞ্ছিত সমাজের নীচু তলার মানুষগুলির মর্মবেদনাকে সার্থক রূপ দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের পাতায়। আর সেই সঙ্গে তাঁর ভাষার যাদুমন্ত্রে তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে তীব্র আঘাত হেনেছেন, যা তাদের মনে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। ধনিক শ্রেণীর প্রতি সঞ্চারিত হয়েছে নিঃস্ব শ্রেণীর ক্ষমাহীন ক্রোধ। অত্যাচারী জমিদার মহাজন ও শোষক শ্রেণীর প্রতি জাগ্রত হয়েছে ঘৃণা। সওয়াসের গেঁহু, দুধকা দাম, পিসনহারী কুয়াঁ, সদ্‌গতি, কফন প্রভৃতি গল্প সর্বহারা শ্রেণীর

মানুষগুলির অপরিসীম রিক্ততাকে তুলে ধরে একই সঙ্গে আমাদের চোখকে অশ্রুসজল করে এবং অন্তরে জ্বালা ধরায়। অত্যাচার, অনাচার বা শোষণের প্রতি তীব্র ঘৃণায় অসহায় মানুষগুলির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সাধারণ মানুষের ছোট ছোট দুঃখ কথার কথাকার প্রেমচন্দ হয়ে ওঠেন নিঃস্ব মানুষের ব্যথার রূপকার। তাঁর সাহিত্যে মূক ম্লান মুখগুলি মুখর হয়, নিষ্করুণ ক্রোধে ফেটে পড়ে, প্রতিবাদ জানায় সমাজের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে। এ যেন সমাজের বিরুদ্ধে স্বয়ং প্রেমচন্দেরই সোচ্চার প্রতিবাদ। 'কর্মভূমি'র সুখদার জবানীতে প্রেমচন্দই যেন বলেন - "আমাকে গ্রেপ্তার করুন কিন্তু সেই লক্ষ লক্ষ গরীবদের কোথায় নিয়ে যাবেন যাদের আর্তনাদ আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হচ্ছে। এই আর্তনাদই একদিন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ে সমাজ এবং সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তার সরকারকেও ধ্বংস করে দেবে। যদি কারো চোখ না খোলে তবে আর কি করবো। এমন দিন আসবে যখন আজকের দেবতারা কাঁকর পাথরের মত আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন এবং পদদলিত হবেন।" (পৃঃ ২২৪)

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রেমচন্দের ভাষা ও শৈলী

ভাষা মানুষের ভাব ও বিচারের বাহক। প্রেমচন্দ প্রথম জীবনে ছিলেন উর্দুর লেখক তাই আরবী ও ফারসী ভাষার প্রভাব তাঁর ভাষা এবং শৈলীর উপর পড়া স্বাভাবিক। তিনি নিজেও বিশেষ করে রতননাথ সরশারের প্রভাব স্বীকার করেছেন। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে প্রথম দিকে তাঁর ভাষা ছিল কঠিন এবং শৈলী ভারাক্রান্ত। পাণ্ডিত্য জাহির করার মিথ্যে আবেশে তিনি ভাষাকে করে তুলতেন জটিল ও কঠিন। তারপর যখন ক্রমশঃ তাঁর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় পাণ্ডিত্য জাহির করার আকাঙ্খাও প্রশমিত হতে থাকে। যখন তিনি উর্দু কথা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হন তখন তিনি হিন্দীর প্রতি আকৃষ্ট হ'ন এবং হিন্দীতে রচনা আরম্ভ করেন। বহু দিন পর্যন্ত তিনি ভাষা এবং শিল্পের পথ অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। তাঁর প্রবন্ধ ও চিঠি থেকে জানা যায় যে কখনো তিনি বঙ্কিমের ভাষা ও শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন আবার কখনো রবীন্দ্রনাথের প্রতি। আবার কখনো উর্দু লেখক আজাদের ভাষা ও শিল্প তাঁকে আকৃষ্ট করে। 'বিশাল ভারতে'র সম্পাদক বনারসীদাস চতুর্বেদীকে এক পত্রে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে ছিলেন যে তাঁর লিখনশৈলীর ওপর বিশেষ কারো প্রভাব পড়ে নি। এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রভাব অবশ্য তিনি স্বীকার করেন। এটা ১৯৩০ সালের কথা। ১৯৪৮ সালের "হংস" পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় প্রেমচন্দ এবং হিন্দীর অপর এক কথাশিল্পী জৈনেন্দ্রের এক আলোচনাচক্রের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। জৈনেন্দ্র কুমারের প্রশ্ন ছিল—বাংলা সাহিত্য হৃদয়কে অধিক স্পর্শ করে—তার কারণ কি? প্রেমচন্দ বলেন, "আমি বাঙালী নই; ওরা ভাবুক। ওরা ভাবের দ্বারা যেখানে পৌছতে পারে সেখান অবধি আমি পৌছতে সক্ষম নই। আমার মধ্যে এমন সামর্থ্য কোথায়? জ্ঞানের দ্বারা যেখানে পৌছানো যায় না ভাব দ্বারা সেখানেও পৌছানো যায়। কিন্তু, জৈনেন্দ্র, কাঠিন্যেরও প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র উভয়েই মহান। কিন্তু হিন্দীর জন্যেও কি সেই একই পথ? সম্ভবত

নয়। হিন্দী রাষ্ট্র ভাষা। আমার জন্যে তো সেই রাস্তা নয়ই।" বস্তুতঃ প্রেমচন্দ ছিলেন বাস্তববাদী ঘরানার শিল্পী। তাই—তিনি ভাবালুতা ও কোমলতার পরিবর্তে কাঠিন্যকে তাঁর সাহিত্যে অধিক স্থান দিতে চেয়েছিলেন।

প্রত্যেক সাহিত্যিকের নিজস্ব ভাষা ও শৈলী গড়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগেই। সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করেই যেমন কেউ মহান লেখক হয়ে উঠতে পারেন না তেমনি তাঁর নিজস্ব style তৈরী করতেও প্রচুর সময় ও সাধনার দরকার হয় চিন্তা-ভাবনার গভীরতাও সময় সাপেক্ষ। যাঁরা গতানুগতিক প্রচলিত পথের পথিক তাদের মধ্যে প্রতিভার অভাব সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। আবার যাঁরা গতানুগতিকতার বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজস্ব ভাষা ও ষ্টাইল গড়ে তুলতে সক্ষম হন তাঁরা যুগ প্রবর্তকের সম্মানে সম্মানিত হন। হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচন্দ ছিলেন এমনি যুগান্তকারী সাহিত্যিক যিনি তৎকালীন প্রচলিত হিন্দী কথা-সাহিত্যের ভাব ভাষা ও শিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। বাংলার পাঠকদের পক্ষে এটা অনুধাবন করা কঠিন যে হিন্দীর কোন ক্লেদাক্ত কথা-সাহিত্যকে প্রেমচন্দ একক চেষ্টায় কোথা থেকে টেনে তুলে কোথায় স্থাপন করেছেন।

জীবনমুখী কথা সাহিত্যের ভাষাও তিনি জীবনমুখী করে তুললেন। তাঁর ভাষা যেন এক অপূর্ব নৈসর্গিক প্রবাহ যেখানে নেই অবাঞ্ছিত ঢেউ। সে যেন বহে চলে আপন গতিতে। সহজ সরল অথচ এক অপূর্ব সাবলীল ভঙ্গিমায় তাঁর ভাষা ভাবকে সম্পৃক্ত করে নিজের মহিমায় এগিয়ে চললো। উর্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত থাকায় তাঁর হিন্দী কথাসাহিত্য হিন্দী-উর্দুর এমন একটি মিশ্রিত রূপ পেয়েছে যা পাঠকের মনকে স্বাভাবিক ভাবে দোলা দেয়। সে যুগে হিন্দীতে এক শ্রেণীর সাহিত্যিকরা সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষা প্রয়োগ করতেন আবার আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিকরা আরবী ফারসী ঘেঁষা অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। সেই সময় প্রেমচন্দ উভয়ের সমন্বয় স্থাপন করে এমন একটি ভাষার সৃষ্টি করলেন যা জনমানসে আজও শিহরণ জাগায়। বাংলা কথাসাহিত্যে ভাষার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের যে স্থান হিন্দী কথাসাহিত্যে প্রেমচন্দের অনেকটা সেই স্থান। প্রেমচন্দ যেমন এক দিকে অপ্রচলিত তৎসম শব্দাবলী বর্জন করলেন তেমনি অপর দিকে অপ্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ সমূহকেও ত্যাগ করেন। তিনিই সর্ব প্রথম এক প্রকারের গণ ভাষার প্রয়োগ আরম্ভ করলেন যা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠলো। এ ভাবে তিনি হিন্দী, উর্দু ও

হিন্দুস্তানীর বিবাদটা দূর করতে সক্ষম হলেন। উত্তরপ্রদেশের কথ্য ভাষাগুলির প্রচলিত হরেক রকমের শব্দ প্রয়োগ করে তিনি হিন্দী সাহিত্যের শব্দ ভাণ্ডার বিস্তৃত করে তুললেন।

প্রেমচন্দের ভাষা বলতে গেলেই বোঝা উচিৎ যে এটা একটা এমন ভাষা যাতে তৎসম, অর্দ্ধতৎসম, দেশজ, তদ্ভব, এবং আরবী ও ফারসীর সহজ প্রচলিত শব্দ গুণানুসারে প্রযুক্ত। এতে প্রচলিত গ্রাম্য শব্দেরও বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। তাঁর ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ বাক্য এমন চমৎকার ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যা তাকে এক অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছে। শব্দশক্তির সঙ্গে তাঁর এতই গভীর পরিচয় যে কোথায় কোন শব্দের প্রয়োগ করলে ভাষায় গাম্ভীর্য আসবে আবার তা সারল্য বর্জিত হবে না, তা রসজ্ঞ পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন, তা তাঁর জানা।

প্রেমচন্দের পূর্ববর্তী যুগে হিন্দী ভাষা নিজের স্বাভাবিকত্ব এবং বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে বসেছিল। তিনি তা ফিরিয়ে আনলেন তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। তাঁর ভাষার প্রবাহমানতা নিজেই একটি প্রবাদ বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথাসাহিত্যের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে নিজের ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছিলেন। ভাষাকে পরিষ্কৃত, পরিমার্জিত করে তাতে তিনি এমন শক্তি সংযোজন করে গেছেন যা অপূর্ব, অচিন্ত্যনীয় এবং যা পাঠকের মনে ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া জাগাতে সক্ষম। ভাষার ভার বৃদ্ধি না করে তিনি চেয়েছেন ধার বৃদ্ধি করতে। তাঁর ভাষার সাবলীলতা, স্বচ্ছন্দগতি এতই সুস্পষ্ট যে তা কোনো বিশেষ উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে হয়না। তাঁর পরিণত বয়সের সমস্ত রচনায়, পংক্তিতে পংক্তিতে তা প্রতীয়মান।

প্রেমচন্দ সাহিত্য পাঠ করলে মনে হয় যেন লেখক নিজের মনের কথাগুলি অবলীলাক্রমে কলমের খোঁচায় আমাদেরও মনের কথায় পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর ভাষায় কোথাও যেন কোনো জড়তা নেই। গতি তার স্বাচ্ছন্দপূর্ণ। তাঁর কথাসাহিত্যর অধিকাংশ চরিত্র গ্রাম্য কৃষক মজুর; যারা অশিক্ষিত, মোহান্ধ, কুসংস্কারাছন্ন, ধর্মভীরু; আবার যারা সমাজে অবহেলিত, তিরস্কৃত, অত্যাচারিত, পীড়িত। তাই তাঁকে নিজের ভাষাকে করতে হয়েছে তাদের যোগ্য। এই খানেই প্রেমচন্দের বৈশিষ্ট্য। কথায় কথায় গ্রাম্য প্রবাদ বাক্য প্রয়োগ করে তিনি নিজের পথ খুঁজে নিয়েছেন। গ্রাম্য শব্দ চয়নে তাঁর

অনবদ্য নৈপুণ্য তাঁর ভাষাকে অপূর্ব শক্তি যুগিয়েছে। গ্রাম্য পরিবেশকে তিনি শহরের আবর্তে কখনো ঢেকে ফেলেন নি। পরিবেশকে পাত্রের অনুকূল করে নিয়ে অতি ঘরোয়া ভাষায় তিনি বহু জটিল সমস্যার সমাধান প্রস্তুত করেছেন। বাংলার যে প্রভাবে হিন্দী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে বসেছিল প্রেমচন্দ তা পুনরুদ্ধার করেন। পুনরুদ্ধার না বলে বরং বলা যায় যে "খড়ীবোলী" হিন্দী প্রথম নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করতে সক্ষম হলো। প্রথম বলছি এই জন্য যে তাঁর পূর্বে হিন্দী কথাসাহিত্য বাংলা, গুজরাটী, ইংরাজী আদি অন্য ভাষার অনুকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দীর এক সাহিত্যিক স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে হিন্দী ভাষীরা বাংলার এঠোকাঁটাতেই তৃপ্ত ছিল। (প্রেমচন্দ স্মৃতি, পৃঃ ১৯২) হিন্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলি পর্যন্ত অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রেমচন্দই প্রথম ব্যক্তি যিনি একক প্রচেষ্টায় হিন্দীকে সেই লজ্জাজনক অবস্থাথেকে মুক্তি প্রদান করেন। প্রেমচন্দই প্রথম হিন্দী লেখক যাঁর গ্রন্থ বাংলা, গুজরাটী, মারাঠী, ইংরাজি, জাপানী, রাশিয়ান ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়ে সম্মান লাভ করে।

হিন্দীতে একটা কথা প্রচলিত আছে যে ভাষা প্রেমচন্দের দাসী ছিল। তিনি যখন যে ভাবে চেয়েছেন সে তখন সে ভাবেই তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছে। ভাষা তাঁর অনুগামী ছিল। যেখানে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন সেখানে তাঁর ভাষার জাদু সত্যি দেখবার মত। তিনি এমন অবস্থায় একটি অপ্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার না করেও বক্তার মনের ভাবকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। পাঠকের মর্মে আঘাত করার জন্যে প্রয়োজন হলেই তিনি ব্যঙ্গাত্মক শৈলীর সাহায্য নেন অথবা চটুল শব্দের ব্যবহার করেন। প্রেমচন্দ কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছেন যে কথ্য ভাষার সাহিত্যে প্রয়োগ কতটা প্রভাবোৎপাদক হতে পারে এবং যাঁরা বলেন যে কথ্য ভাষায় এবং সাহিত্যের ভাষায় প্রভেদ থাকা উচিত তাঁরা কতদূর ভ্রান্ত। বাংলায় যেমন শরৎচন্দ্র কথোপকথনের মাধ্যমে পাঠকের মর্মে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি প্রেমচন্দও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কথার মাধ্যমে। প্রেমচন্দ বলতেন ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে পাঠকের মনে ও মস্তিষ্কে সহজেই প্রবেশ করতে পারে। ভাষার ক্লিষ্টতা অনেক সময় ভাবকে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে করে দেয়, অপ্রচলিত শব্দ রসসৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে। তাই প্রেমচন্দ সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা সাধারণের ভাষায়ই ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর, সুগঠিত, সরস, ঋজু অথচ কোমল এবং ভাবময় ভাষার বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। যদিও অনুবাদের দৌলতে তা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাবে। তবু দু-একটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া গেল।

"সেই অভিসারের মিষ্টি মধুর স্মৃতি মনে এলো। যখন সে নিজের উন্মত্ত শ্বাসপ্রশ্বাসে, নেশাধরা দৃষ্টিতে তার চরণে প্রাণ উৎসর্গ করে দিত। ঝুনিয়া কোনো বিয়োগ ব্যথায় জর্জরিত পক্ষীর ন্যায় নিজের ছোট্ট নীড়ে একান্তে দিন কাটাচ্ছিল। সেখানে পুরুষের মত্ততা বা আকাঙ্খা ছিল না; ছিল না সেই উদ্দীপ্ত লালসা বা শাবকের মিষ্টি মধুর ধ্বনি; কিন্তু কোনো পক্ষী শিকারীর জাল এবং ছলও তো সেখানে ছিল না।"

চলচিত্র জগতে প্রেমচন্দের যে গল্পটি একটি সর্বকালের classicএ পরিণত হয়েছে সেই "শতরঞ্জ কে খিলাড়ী"র একটি দৃশ্যের বর্ণনা এই রকম—

"অন্ধকার নেমে আসছিল। দাবার ছক সাজান ছিল। দুই বাদশাহ নিজের নিজের সিংহাসনে বসে যেন উভয় বীরের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে ক্রন্দন করছিল।

"চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। ধ্বংসাবশেষের ভগ্ন স্তম্ভগুলি, ভূপতিত কপাটগুলি এবং ধূলি ধূসরিত মীনারগুলি এই লাশগুলির দিকে দেখতো আর মাথা কুটতো।" (শতরঞ্জ কে খিলাড়ী, মানসরোবর, ভাগ—৩)

দুই বাদশাহী বন্ধুর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে যে নিরর্থক বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হয় তার বিষম পরিণতি এর চেয়ে আর বেশী কি হতে পারে। নিজের বাদশাহের প্রতি যারা নিম্নতম কর্তব্য সম্পাদন করতে পরাঙ্মুখ তারাই দাবার মন্ত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্যে বীরের মত আত্মবলিদান দিয়ে দেখিয়ে গেল যে বাদশাহী আমলের উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারিদের মধ্যে ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্যের অভাব ছিল না। কিন্তু তা তারা দেশ ও দশের কাজে লাগাতে আলস্য বোধ করতেন যদিও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিয়োগ করতে পিছুপা হতেন না। প্রেমচন্দের এই যে প্রকৃতি বর্ণনা তা নিরর্থক নয়, এই বর্ণনার মাধ্যমে তিনি বেদনাদায়ক পরিণতিটিকে আরো অধিক বেদনাময় করে তুলেছেন। এইখানেই প্রেমচন্দের বিশেষত্ব। অতি অল্প শব্দে কত গভীর বেদনা পূঞ্জীভূত হয়ে পাঠকের মনকে নাড়া দেয়।

প্রেমচন্দ সাহিত্যের ভাষা ও শিল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে তাঁর সাহিত্যের পাতায় পাতায় এমন সব উক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেগুলি সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হলে একটি অতি উচ্চ মানের "Dictionary of Thoughts" প্রস্তুত হতে পারে। আমরা বাংলায় যেমন রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি ব্যবহার করি তেমনি অসংখ্য উদ্ধৃতির যোগ্যতা-সম্পন্ন বাক্য প্রেমচন্দ সাহিত্যে বিদ্যমান। এই ধরণের বাক্যকে হিন্দীতে বলা হয় সূক্তি অর্থাৎ সু উক্তি। বাদ বিসংবাদের সময় এই উক্তিগুলি বিশেষ ভাবে রূপ গ্রহণ করে। দু-চারটি এ রকম উক্তি এখানে উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না, পাঠকরা আশা করি ক্ষমা করবেন।

ইটের জবাব পাথর হতে পারে কিন্তু প্রণামের জবাব তো গালি হতে পারে না।

অনুচিত ক্রোধের মধ্যে সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করার বিশেষ অনুরাগ থাকে।

ভাষা সুন্দরীকে কুঠুরীতে বন্ধ করে আপনি তার সতীত্ব রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু জীবনের মূল্য দিয়ে।

সাহিত্য সেই জাদুদণ্ড যা পশুতে, ইটপাথরে, গাছপালায় বিশ্ব আত্মার দর্শন করায়।

সাহিত্যের আত্মা আদর্শ এবং তার দেহ বাস্তববাদী বর্ণনা।

বার্দ্ধক্যে স্ত্রীর মৃত্যু বর্ষায় গৃহপতনের সমান।

মন একটি ভীরু শত্রু, যা সদাই পশ্চাৎ দিক থেকে আঘাত হানে।

অনুভূতির নামই জীবন।

ধর্ম সেই আলোকের নাম যা বিন্দুকে সমুদ্রে মিশে যাওয়ার পথ দেখায়।

প্রেম বসন্তের হাওয়া, দ্বেষ গ্রীষ্মের লু।

যে পুষ্পকে বসন্ত সমীর কয়েক মাসে ফোটায় তাকে লু এক ঝটিকায় জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

বাস্তব সমবেদনা মূক হয়।

নিরাশায় প্রতীক্ষা অন্ধের লাঠি।

এ ধরণের "সূক্তি" অসংখ্য এবং প্রেমচন্দ সাহিত্যের পাতায় পাতায় তা ছড়িয়ে আছে। এই উক্তিগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে এতে কোনো অলঙ্করণের চেষ্টা নেই। সহজ সরল ভাষা অথচ তার অর্থের গভীরতা অতলস্পর্শী, মর্মস্পর্শী।

সাধারণ সাহিত্যিকদের পক্ষে এ ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। সাধারণত ভাবের গাম্ভীর্য যত অধিক ভাষা ও শিল্প ততই জটিল ও গম্ভীর হয়ে ওঠে কিন্তু প্রেমচন্দের বেলা এই সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নয়। তিনি গম্ভীর বিষয়কেও অতি সরল ভাষায় ব্যক্ত করে তার গাম্ভীর্য দূর করে দেওয়ার অসাধারণ শক্তি ধরেন। বিষয় এবং ভাষা-শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করলেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, একথা ঠিক কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভাষাকে অযথা ক্লিষ্ট ও অলঙ্কারের বোঝায় এমন করে তুলতে হবে যাতে সাহিত্য প্রসাদগুণ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করে তোলা একেবারেই অশুচিত। প্রেমচন্দ হিন্দী কথা সাহিত্যে যে নতুন শিল্প চেতনার সূচনা করেন পরবর্তী যুগের কাহিনী লেখকেরা যথাসাধ্য সেই চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রেমচন্দ সাহিত্যকে মানব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এটাই হিন্দী সাহিত্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় অবদান, একথা আমি পূর্বেই বলেছি। কিন্তু তাঁর অবদান শুধু এই নয়। তিনি মানব জীবনকে মানবতাবাদের ভিত্তিপ্রস্তরের উপর স্থাপন করতে সচেষ্ট হন। তাই তিনি জীবনের বাস্তবতাকে আদর্শহীন বা নীতি জ্ঞানহীন রূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই তাঁর সাহিত্যকে আদর্শমুখী বাস্তববাদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রেমচন্দ একটি প্রবন্ধে বলেছেন—আদর্শ যদি মহান হয় তবে ভাষা আপনা আপনি সরল হয়ে যায়। ভাব-সৌন্দর্য বাহ্যিক সৌকর্যের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাতে পারে। যে সাহিত্যিক ধনী সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী সে জাঁকজমক পূর্ণ রচনাশিল্প অঙ্গীকার করে নেয়, যে জনসাধারণের সে জনসাধারণের ভাষায় লেখে। (কুছ বিচার, পৃষ্ঠা-২০)

প্রেমচন্দের কথা সাহিত্যের অনুশীলন করলে বোঝা যায় যে তাঁর বিষয়বস্তু অতি বৈচিত্রময়। ভারতীয় সমাজের এমন কোনো সমস্যা নেই যা তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পেরেছে। নারী সমস্যার মধ্যে বাল-বিবাহ, যৌতুক প্রথা, বিধবা সমস্যা, অসম বিবাহ, পতিতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া, জমিদার, মহাজন, ভণ্ডসাধু-সন্ন্যাসী, দরিদ্র কৃষক, মজদুর, লেখক, সম্পাদক, উকিল ব্যারিষ্টার কেউ বাদ পড়েনি। সকলের সমস্যাই তিনি নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে যথাযথ চিত্রিত করেছেন। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, চিকিৎসা, আইন আদালত, পুলিশ-কাছারি ইত্যাদির সমস্যাগুলি তাঁর কথা সাহিত্যে বিবৃত হয়েছে। তাই ভাব-সৌন্দর্যের

জন্যে তাঁকে কোথাও হাস্য রসের সাহায্য নিতে হয়েছে, আবার কোথাও করুণ রসের উদ্রেক করতে হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সাহায্যে তিনি সমাজের ও ধর্মের ধ্বজাধারীদের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন। আবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র সমাজে চেতনা জাগ্রত করতে প্রয়োগ করেছেন অতি সাধারণ ভাষা কিন্তু সেই সাধারণ অনাড়ম্বর ভাষার মধ্যেও যে কি ধার থাকতে পারে তা প্রেমচন্দের পূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। এখানেই তাঁর শিল্প মাধুর্য্য, তাঁর বৈশিষ্ট্য।

———

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

জন্ম—৩০শে জুলাই ১৮৮০ সালে। মতান্তরে ৩১শে জুলাই।

পিতা— শ্রী অজায়ব রায়।

মাতা—শ্রীমতী আনন্দী দেবী।

পেশা—মূলতঃ কৃষি তবে দারিদ্রের নিষ্পেষণে ডাকঘরে করণিকের কাজ।

জন্মস্থান—বারাণসী থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে অবস্থিত 'লমহী' নামক গ্রামে।

মূলনাম—ধনপত রায় শ্রীবাস্তব। তুজন্মের সময় পিতার বেতন ছিল ২০ টাকা মাত্র। তিন বোনের মধ্যে জসের অকাল মৃত্যু হয়।

শিক্ষারম্ভ ১৮৮৫ সালে। উর্দুর মাধ্যমে।

৮ বছর বয়সে ১৮৮৮ তে মাতৃ বিয়োগ। পিতার দ্বিতীয় বিবাহ।

প্রথম রচনা—১৩ বছর বয়সে ১৮৯৩ সালে মামাকে কেন্দ্র করে লেখা। অপ্রাপ্য।

বিবাহ—১৮৯৫ সালে ১৫ বছর বয়সে একটি কুরূপ কর্কশ স্বভাবের মেয়ের সঙ্গে।

পিতার মৃত্যু— ১৮৯৬ সালে।

বিমাতা সহ পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব স্কন্ধে চাপে। ৬ কি, মী, দূরে পড়তে যেতেন নগ্ন পায়ে। ৫ টাকার টিউশানি আরম্ভ করেন। ৩ টাকা বাড়ি পাঠান, ২ টাকায় নিজের খরচ চালান।

১৮৯৭ সালে এন্ট্রান্স পাস করেন। গভর্ণমেন্ট সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজে (এলাহাবাদ) ভর্তি হন।

১৯০২ এ প্রথম বিভাগে জুনিয়র ইংলিশ টীচার্স সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাশ করেন।

১৯০৪ সালেই উর্দু ও হিন্দিতে ভার্ণাকুলার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন।

১৯০৫ ০৮ পর্যন্ত কানপুরে সহায়ক শিক্ষক রূপে কাজ করেন।

পরে সাব ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস রূপে মহোবায় ৬ বছর কাজ করেন।

১৯১৪ সালে 'বস্তী' তে বদলী হন। অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯১৬ সালে অগাষ্টে গোরক্ষপুরের নর্মাল স্কুলের অ্যাসিস্টেণ্ট মাষ্টার নিযুক্ত হন। এখানেই পুত্র লাভ হয়।

১৯১৬ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। (অঙ্কের জন্যে বার কয়েক ফেল করার পর) ১৯১৯ সালে এলাহাবাদ য়ুনিভর্সিটি থেকে বি, এ, পাশ করেন।

১৯২১ সালে মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে পদত্যাগ পত্র দেন।

" " দ্বিতীয় পুত্র লাভ হয়।

এক বৎসর পর কানপুরে মারোয়াড়ী স্কুলের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯২২ সালে পদত্যাগ করে গ্রামে চলে যান। পাকা বাড়ী নির্মাণ করেন।

সাহিত্য কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

মর্যাদা পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। বেতন—১৫০ টাকা।

কাশী বিদ্যাপীঠে শিক্ষক নিযুক্ত হন। বেতন ১২৫ টাকা।

এক বছর পর ১৯২৩ এ অপর তিন জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'সরস্বতী প্রেস' খোলেন।

প্রেমচন্দের অবদান ৮৫০০ টাকা।

অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তবু ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ক্ষতি পূরণের জন্যে ১০০ টাকা মাসিকে Literary Assistant রূপে ১৯২৫ সালে যোগ দেন 'গঙ্গা পুস্তক মালা' নামক প্রকাশন সংস্থায়।

১৯২৬ এ এপ্রিল আবার বেনারসে আগমন।

১৯২৮ জুন পর্যন্ত বেনারসে থাকার পর পুনর্বার লখনউ যান।

'মাধুরী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। বেতন ২০০ টাকা মাসিক। জুলাই ১৯২৮ থেকে নভেম্বর ১৯৩১ পর্যন্ত সম্পাদন করেন। বহু পুস্তক সংশোধনের ও কাজ করেন ছেলেদের লেখাপড়ার জন্যে এপ্রিল ১৯৩৩ পর্যন্ত লখনউতেই থেকে অতঃপর বেনারসে ফিরে আসেন। মে ১৯৩৪ পর্যন্ত প্রেসের কাজে ব্যস্ত থাকেন। জানুয়ারী ১৯৩০ এ 'হংস' নামক নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করেন।

দেশদ্রোহাত্মক লেখা প্রকাশের জন্যে ১০০০ টাকার জামিন দাবী করায় পত্রিকা বন্ধ করে দেন।

১৯৩১ এ পুনর্বার প্রকাশ আরম্ভ করেন। পুনরায় একটি গল্পের জন্যে জামিন দাবী করা হয়।

১৯৩৫ সালের অক্টোবরে হিন্দী সাহিত্য পরিষদ 'হংস' প্রকাশনার ভার নেয় কিন্তু আবার নিষিদ্ধ লেখার দায়ে টাকা চাওয়া হয়। পরিষদ পুনরায় প্রকাশন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু প্রেমচন্দ আবার এর দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন।

ক্ষতিপূরণের জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জুন ১৯৩৪ সালে বোম্বাই যান।

৭৫০ টাকা বেতনে সিনেমার গল্প লেখার কাজ নেন।

বনিবনা না হওয়ায় মার্চ ১৯৩৫ সালে বেনারসে ফিরে আসেন।

পুরাতন পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮ই অক্টোবর সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রচনাপঞ্জী

উপন্যাস

১। বরদান আনুমাণিক ১৯০২ সালে উর্দুতে লিখিত "জলবা-ই-ইসার" নামক বৃহৎ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যা হিন্দীতে বহু পরে প্রকাশিত হয়।

২। প্রতিজ্ঞা রচনাকাল ১৯০৪-১৯০৬ খ্রীঃ

৩। সেবাসদন রচনাকাল ১৯১৪-১৫ খ্রীঃ। প্রকাশ কাল ১৯১৬ (মূল উর্দু উপন্যাস "বাজারে হুস্‌ন" এর অনুবাদ)

৪। প্রেমাশ্রম রচনাকাল ১৯১৮। প্রকাশকাল ১৯২২ খ্রীঃ।

৫। নির্মলা রচনাকাল ১৯২৩। প্রকাশকাল ১৯২৭ খ্রীঃ।

৬। রঙ্গভূমি রচনা ও প্রকাশকাল ১৯২৪-২৫ খ্রীঃ।

৭। কায়াকল্প ১৯২৮ সাল।

৮। গবন ১৯৩০ সাল।

৯। কর্মভূমি ১৯৩২ সাল।

১০। গোদান ১৯৩৬ সাল।

১১। মঙ্গলসূত্র অসম্পূর্ণ উপন্যাস।

হিন্দী গল্প সঙ্কলন

		প্রকাশ কাল	স্থান
১।	সপ্তসরোজ	১৯১৭ সাল	গোরক্ষপুর
২।	নবনিধি	১৯১৭ "	বোম্বাই
৩।	প্রেমপূর্ণিমা	১৯১৮ "	কলিকাতা
৪।	বড়ে ঘর কি বেটী	১৯২১ "	"
৫।	লাল ফিতা	১৯২১ "	"

		প্রকাশ কাল	স্থান
৬।	নমক কা দারোগা	১৯২১ সাল	কলিকাতা
৭।	প্রেম পচীসী	১৯২৩ „	„
৮।	ব্যাঙ্ক কা দীবালা	১৯২৪ „	„
৯।	প্রেম প্রস্থন	১৯২৪ „	লখনউ
১০।	প্রেম দ্বাদশী	১৯২৬ „	„
১১।	প্রেম প্রতিমা	১৯২৬ „	বেনারস
১২।	প্রেম প্রমোদ	১৯২৬ „	এলাহাবাদ
১৩।	শান্তি	১৯২৭ „	কলিকাতা
১৪।	প্রেম তীর্থ	১৯২৯ „	বেনারস
১৫।	পাঁচ ফুল	১৯২৯ „	„
১৬।	অগ্নি সমাধি	১৯২৯ „	লখনউ
১৭।	প্রেম চতুর্থী	১৯২৯ „	কলিকাতা
১৮।	প্রেম প্রতিজ্ঞা	„ „	বেনারস
১৯।	সপ্ত স্থমন	১৯৩০ „	„
২০।	প্রেম পঞ্চমী	„ „	লখনউ
২১।	প্রেরণা	১৯৩২ „	বেনারস
২২।	সমর যাত্রা	১৯৩২ „	বেনারস ও কলিকাতা
২৩।	পঞ্চ প্রস্থন	১৯৩৪ „	কলিকাতা
২৪।	নবজীবন	১৯৩৫ „	„

হিন্দী নাটক

		প্রকাশ কাল	স্থান
১।	সংগ্রাম	১৯২৩ সাল	কলিকাতা
২।	কার্বলা	১৯২৪ „	লখনউ
৩।	প্রেম কী বেদী	১৯৩৩ „	বেনারস

জীবনী

		প্রকাশ কাল	স্থান
১।	মহাত্মা শেখ সাদী	১৯১৮ সাল	গোরক্ষপুর
২।	দুর্গাদাস	১৯৩৮ "	বেনারস
৩।	জীবনসার (আত্ম কাহিনী)	১৯৩৩ "	হংসের আত্মকথা নামক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত
৪।	কলম, তলোয়ার ও ত্যাগ,		

অনুবাদ

		প্রকাশ কাল	স্থান
১।	সুখদাস (সাইলাস মেরিনর)	১৯২০ সাল	বোম্বাই।
২।	টল্‌সটয় কি কাহানিয়াঁ	১৯২৩ "	কলিকাতা।
৩।	অহঙ্কার (যায়স)	" "	"
৪।	আজাদ কথা (ফসান-এ-আজাদ)	১৯২৭ "	বেনারস।
৫।	হরতাল (গল্‌সওয়র্দীর নাটক)	১৯৩০ "	এলাহাবাদ।
৬॥	চাঁদ কি ডিবিয়া (নাটক)	১৯৩১ "	"
৭।	ন্যায় (নাটক)	" "	"
৮।	সৃষ্টি কা আরম্ভ (বার্ণার্ড শর নাটক)	১৯৩৯ "	"

শিশু সাহিত্য

		প্রকাশ কাল	স্থান
১।	মনমোদক	১৯২৬ সাল	(এলাহাবাদ)
২।	কুত্তে কি কহানী	১৯৩৬ "	(বেনারস)
৩।	জঙ্গল কি কহানিয়াঁ	১৯৩৮ "	(")
৪।	রামচর্চা	১৯৪১ "	(")

৫। দুর্গাদাস (বাস্তবে শিশুদের জন্যেই লেখা। জীবনীতে উল্লিখিত।)

* তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ হংস, জাগরণ, চাঁদ, মাধুরী ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে ছড়িয়ে আছে। "কুছ বিচার" ও "প্রেমচন্দ কে বিচার" এর কয়েকটি ভাগে এগুলির কিছু সংকলিত আছে।